আল ফাতিহা
১

নামকরণ

এ সূরার মূল বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এর এই নামকরণ করা হয়েছে। যার সাহায্যে কোন বিষয়, গ্রন্থ বা জিনিসের উদ্বোধন করা হয় তাকে 'ফাতিহা' বলা হয়। অন্য কথায় বলা যায়, এ শব্দটি ভূমিকা এবং বক্তব্য শুরু করার অর্থ প্রকাশ করে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের একেবারেই প্রথম যুগের সূরা। বরং হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, এটিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিলকৃত প্রথম পূর্ণাংগ সূরা। এর আগে মাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিল। সেগুলো সূরা 'আলাক', সূরা 'মুয্যাম্মিল' ও সূরা 'মুদ্দাস্সির' ইত্যাদিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

আসলে এ সূরাটি হচ্ছে একটি দোয়া। যে কোন ব্যক্তি এ গ্রন্থটি পড়তে শুরু করলে আল্লাহ প্রথমে তাকে এ দোয়াটি শিখিয়ে দেন। গ্রন্থের শুরুতে এর স্থান দেয়ার অর্থই হচ্ছে এই যে, যদি যথার্থই এ গ্রন্থ থেকে তুমি লাভবান হতে চাও, তাহলে নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর কাছে দোয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা করো।

মানুষের মনে যে বস্তুটির আকাংখা ও চাহিদা থাকে স্বভাবত মানুষ সেটিই চায় এবং সে জন্য দোয়া করে। আবার এমন অবস্থায় সে এই দোয়া করে যখন অনুভব করে যে, যে সত্তার কাছে সে দোয়া করছে তার আকাংখিত বস্তুটি তারই কাছে আছে। কাজেই কুরআনের শুরুতে এই দোয়ার শিক্ষা দিয়ে যেন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, সত্য পথের সন্ধান লাভের জন্য এ গ্রন্থটি পড়, সত্য অনুসন্ধানের মানসিকতা নিয়ে এর পাতা ওলটাও এবং নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভু আল্লাহ হচ্ছেন জ্ঞানের একমাত্র উৎস—একথা জেনে নিয়ে একমাত্র তাঁর কাছেই পথনির্দেশনার আর্জি পেশ করেই এ গ্রন্থটি পাঠের সূচনা কর।

এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন ও সূরা ফাতিহার মধ্যকার আসল সম্পর্ক কোন বই ও তার ভূমিকার সম্পর্কের পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং এ সম্পর্কটি দোয়া ও দোয়ার জবাবের পর্যায়ভুক্ত। সূরা ফাতিহা বান্দার পক্ষ থেকে একটি দোয়া। আর কুরআন তার জবাব আল্লাহর পক্ষ থেকে। বান্দা দোয়া করে, হে মহান প্রভু! আমাকে পথ দেখাও। জবাবে মহান প্রভু এই বলে সমগ্র কুরআন তার সামনে রেখে দেন—এই নাও সেই হিদায়াত ও পথের দিশা যে জন্য তুমি আমার কাছে আবেদন জানিয়েছ।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে[১]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য[২] *যিনি নিখিল বিশ্ব-জাহানের রব,*[৩] *পরম দয়ালু ও করুণাময়,*[৪] *প্রতিদান দিবসের মালিক।*[৫]

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি[৬] *এবং একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই।*[৭]

১. ইসলাম মানুষকে একটি বিশেষ সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়েছে। প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি রীতি। সচেতনতা ও আন্তরিকতার সাথে এ রীতির অনুসারী হলে অনিবার্যভাবে তিনটি সুফল লাভ করা যাবে। এক ঃ মানুষ অনেক খারাপ কাজ করা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। কারণ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা অভ্যাস তাকে প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে একথা চিন্তা করতে বাধ্য করবে যে, যথার্থই এ কাজে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার কোন ন্যায়সংগত অধিকার তার আছে কি না? দুই ঃ বৈধ সঠিক ও সৎকাজ শুরু করতে গিয়ে আল্লাহর নাম নেয়ার কারণে মানুষের মনোভাব ও মানসিকতা সঠিক দিকে মোড় নেবে। সে সবসময় সবচেয়ে নির্ভুল বিন্দু থেকে তার কাজ শুরু করবে। তিন ঃ এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুফল হচ্ছে এই যে, আল্লাহর নামে যখন সে কাজ শুরু করবে তখন আল্লাহর সাহায্য, সমর্থন ও সহায়তা তার সহযোগী হবে। তার প্রচেষ্টায় বরকত হবে। শয়তানের বিপর্যয় ও ধ্বংসকারিতা থেকে তাকে সংরক্ষিত রাখা হবে। বান্দা যখন আল্লাহর দিকে ফেরে তখন আল্লাহও বান্দার দিকে ফেরেন, এটাই আল্লাহর রীতি।

২. ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলেছি, সূরা ফাতিহা আসলে একটি দোয়া। তবে যে সত্তার কাছে আমরা প্রার্থনা করতে চাচ্ছি তাঁর প্রশংসা বাণী দিয়ে দোয়া শুরু করা হচ্ছে। এভাবে যেন দোয়া চাওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ দোয়া চাইতে হলে ভদ্র ও শালীন পদ্ধতিতে দোয়া চাইতে হবে। কারো সামনে গিয়ে মুখ খুলেই প্রথমে নিজের প্রয়োজনটা পেশ করে দেয়া কোন সৌজন্য ও ভব্যতার পরিচায়ক নয়। যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে প্রথমে তার গুণাবলী বর্ণনা করা এবং তার দান, অনুগ্রহ ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়াই ভদ্রতার রীতি।

আমরা দু'টি কারণে কারো প্রশংসা করে থাকি। প্রথমত তিনি প্রকৃতিগতভাবে কোন বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্টের অধিকারী। তাঁর ঐ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্ট আমাদের ওপর কি প্রভাব ফেলে সেটা বড় কথা নয়। দ্বিতীয়ত তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং আমরা তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতির আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়েই তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করি। মহান আল্লাহর প্রশংসা এই উভয় কারণে ও উভয় দিক দিয়েই করতে হয়। আমরা হামেসা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হব, এটি তাঁর অপরিসীম মর্যাদা ও আমাদের প্রতি তাঁর অশেষ অনুগ্রহের দাবী।

আর প্রশংসা আল্লাহর জন্য, কেবল এখানেই কথা শেষ নয় বরং সঠিকভাবে বলা যায়, "প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই" জন্য। একথাটি বলে একটি বিরাট সত্যের ওপর থেকে আবরণ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আর এটি এমন একটি সত্য যার প্রথম আঘাতেই 'সৃষ্টি পূজা'র মূলে কুঠারাঘাত হয়। দুনিয়ায় যেখানে যে বস্তুর মধ্যে যে আকৃতিতেই কোন সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজিত আছে আল্লাহর সত্তাই মূলত তার উৎস। কোন মানুষ, ফেরেশতা, দেবতা, গ্রহ-নক্ষত্র তথা কোন সৃষ্টির নিজস্ব কোন গুণ-বৈশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বরং এসবই আল্লাহ প্রদত্ত। কাজেই যদি কেউ এ অধিকার দাবী করেন যে, আমরা তাঁর প্রশংসা কীর্তন করব, তাঁকে পূজা করব, তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করব ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং তাঁর খেদমতগার ও সেবক হব, তাহলে তিনি হবেন সেই শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্টের স্রষ্টা ঐ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্টের অধিকারী মানব-সত্তা নয়।

৩. 'রব' শব্দটিকে আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। এক, মালিক ও প্রভু। দুই, অভিভাবক, প্রতিপালনকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সংরক্ষণকারী। তিন, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, শাসনকর্তা পরিচালক ও সংগঠক।

৪. মানুষের দৃষ্টিতে কোন জিনিস খুব বেশী বলে প্রতীয়মান হলে সেজন্য সে এমন শব্দ ব্যবহার করে যার মাধ্যমে আধিক্যের প্রকাশ ঘটে। আর একটি আধিক্যবোধক শব্দ বলার পর যখন সে অনুভব করে যে ঐ শব্দটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জিনিসটির আধিক্যের প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তখন সে সেই একই অর্থে আর একটি শব্দ ব্যবহার করে। এভাবে শব্দটির অন্তরনিহিত গুণের আধিক্য প্রকাশের ব্যাপারে যে কমতি রয়েছে বলে সে মনে করছে তা পূরণ করে। আল্লাহর প্রশংসায় 'রহমান' শব্দের পরে আবার 'রহীম' বলার মধ্যেও এই একই নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। আরবী ভাষায় 'রহমান' একটি বিপুল আধিক্যবোধক শব্দ। কিন্তু সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর রহমত ও মেহেরবানী এত বেশী ও ব্যাপক এবং এত সীমাসংখ্যাহীন যে, তা বয়ান করার জন্য সবচেয়ে বেশী ও বড় আধিক্যবোধক শব্দ ব্যবহার করার পরও মন ভরে না। তাই তার আধিক্য প্রকাশের হক আদায় করার জন্য আবার 'রহীম' শব্দটিও বলা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যেতে পারে, যেমন আমরা কোন ব্যক্তির দানশীলতার গুণ বর্ণনা করার জন্য 'দাতা' বলার পরও যখন অতৃপ্তি অনুভব করি তখন এর সাথে 'দানবীর' শব্দটিও লাগিয়ে দেই। রঙের প্রশংসায় 'সাদা' শব্দটি বলার পর আবার 'দুধের মতো সাদা' বলে থাকি।

৫. অর্থাৎ যেদিন মানবজাতির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বংশধরদেরকে একত্র করে তাদের জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের হিসেব নেয়া হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পূর্ণ কর্মফল দেয়া হবে। তিনি সেই দিনের একচ্ছত্র অধিপতি, আল্লাহর প্রশংসায় রহমান ও রহীম শব্দ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তুমি আমাদের সোজা পথ দেখাও,[৮] তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ,[৯] যাদের ওপর গযব পড়েনি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি।[১০]

ব্যবহার করার পর তিনি প্রতিদান দিবসের মালিক একথা বলায় এখান থেকে এ অর্থও প্রকাশিত হয় যে, তিনি নিছক দয়ালু ও করুণাময় নন বরং এই সংগে তিনি ন্যায় বিচারকও। আবার তিনি এমন ন্যায় বিচারক যিনি হবেন শেষ বিচার ও রায় শুনানীর দিনে পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক সেদিন তিনি শাস্তি প্রদান করলে কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না। এবং পুরস্কার দিলেও কেউ ঠেকাতে পারবে না। কাজেই তিনি আমাদের প্রতিপালন করেন ও আমাদের প্রতি করুণা করেন এ জন্য যে আমরা তাঁকে ভালোবাসি শুধু এতটুকুই নয় বরং তিনি ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করেন এ জন্য আমরা তাঁকে ভয়ও করি এবং এই অনুভূতিও রাখি যে, আমাদের পরিণামের ভালো মন্দ পুরোপুরি তাঁরই হাতে ন্যস্ত।

৬. ইবাদাত শব্দটিও আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (১) পূজা ও উপাসনা করা, (২) আনুগত্য ও হুকুম মেনে চলা এবং (৩) বন্দেগী ও দাসত্ব করা। এখানে একই সাথে এই তিনটি অর্থই প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তোমার পূজা–উপাসনা করি, তোমার আনুগত্য করি এবং তোমার বন্দেগী ও দাসত্বও করি। আর আমরা তোমার সাথে এ সম্পর্কগুলো রাখি কেবল এখানেই কথা শেষ নয় বরং এ সম্পর্কগুলো আমরা একমাত্র তোমারই সাথে রাখি। এই তিনটি অর্থের মধ্যে কোন একটি অর্থেও অন্য কেউ আমাদের মাবুদ নয়।

৭. অর্থাৎ তোমার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল ইবাদাতের নয় বরং আমাদের সাহায্য প্রার্থনার সম্পর্কও একমাত্র তোমারই সাথে রয়েছে। আমরা জানি তুমিই সমগ্র বিশ্ব–জাহানের রব। সমস্ত শক্তি তোমারই হাতে কেন্দ্রীভূত। তুমি একাই যাবতীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহের অধিকারী। তাই আমাদের অভাব ও প্রয়োজন পূরণের জন্য আমরা একমাত্র তোমারই দুয়ারে ধর্ণা দেই। তোমারই সামনে নিজেদের সুপর্দ করে দেই এবং তোমারই সাহায্যের ওপর নির্ভর করি। এ জন্য আমাদের এই আবেদন নিয়ে আমরা তোমার দুয়ারে হাজির হয়েছি।

৮. অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেকটি শাখা প্রশাখায় এবং প্রত্যেকটি বিভাগে, চিন্তা, কর্ম ও আচরণের এমন বিধি–ব্যবস্থা আমাদের শেখাও, যা হবে একেবারেই নির্ভুল, যেখানে ভুল দেখা, ভুল কাজ করা ও অশুভ পরিণামের আশংকা নেই, যে পথে চলে আমরা যথার্থ সাফল্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারি। কুরআন অধ্যয়নের প্রাক্কালে বান্দা তার প্রভু, মালিক, আল্লাহর কাছে এই আবেদনটি পেশ করে। বান্দা আর্জি পেশ করে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পথ দেখাও। কল্পিত দর্শনের গোলকধাঁধার মধ্য থেকে যথার্থ সত্যকে

উন্মুক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধর। বিভিন্ন নৈতিক চিন্তা–দর্শনের মধ্য থেকে যথার্থ ও নির্ভুল নৈতিক চিন্তা–দর্শন আমাদের সামনে উপস্থাপিত কর। জীবনের অসংখ্য পথের মধ্য থেকে চিন্তা ও কর্মের সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট রাজপথটি আমাদের দেখাও।

৯. মহান আল্লাহর কাছ থেকে আমরা যে সোজা পথটির জ্ঞান লাভ করতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে তার পরিচয়। অর্থাৎ এমন পথ যার ওপর সবসময় তোমার প্রিয়জনেরা চলেছেন। সেই নির্ভুল রাজপথটি অতি প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যে ব্যক্তি ও যে দলটিই তার ওপর চলেছে সে তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে এবং তোমার দানে তার জীবনপাত্র পরিপূর্ণ হয়েছে।

১০. অর্থাৎ 'অনুগ্রহ' লাভকারী হিসেবে আমরা এমন সব লোককে চিহ্নিত করিনি যারা আপাতদৃষ্টিতে সাময়িকভাবে তোমার পার্থিব অনুগ্রহ লাভ করে থাকে ঠিকই কিন্তু আসলে তারা হয় তোমার গযব ও শাস্তির অধিকারী এবং এভাবে তারা নিজেদের সাফল্য ও সৌভাগ্যের পথ হারিয়ে ফেলে। এ নেতিবাচক ব্যাখ্যায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 'অনুগ্রহ' বলতে আমরা যথার্থ ও স্থায়ী অনুগ্রহ বুঝাচ্ছি, যা আসলে সঠিক পথে চলা ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের ফলে অর্জিত হয়। এমন কোন সাময়িক ও লোক দেখানো অনুগ্রহ নয়, যা ইতিপূর্বে ফেরাউন, নমরূদ ও কারূনরা লাভ করেছিল এবং আজো আমাদের চোখের সামনে বড় বড় যালেম, দুষ্কৃতিকারী ও পথভ্রষ্টরা যেগুলো লাভ করে চলেছে।

আল বাকারাহ

২

নামকরণ

বাকারাহ মানে গাভী। এ সূরার এক জায়গায় গাভীর উল্লেখ থাকার কারণে এর এই নামকরণ করা হয়েছে। কুরআন মজীদের প্রত্যেকটি সূরায় এত ব্যাপক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে যার ফলে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তাদের জন্য কোন পরিপূর্ণ ও সার্বিক অর্থবোধক শিরোনাম উদ্ভাবন করা সম্ভব নয়। শব্দ সম্ভারের দিক দিয়ে আরবী ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও মূলত এটি তো মানুষেরই ভাষা আর মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলো খুব বেশী সংকীর্ণ ও সীমিত পরিসর সম্পন্ন। সেখানে এই ধরনের ব্যাপক বিষয়বস্তুর জন্য পরিপূর্ণ অর্থব্যাঞ্জক শিরোনাম তৈরি করার মতো শব্দ বা বাক্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ সূরার জন্য শিরোনামের পরিবর্তে নিছক আলামত ভিত্তিক নাম রেখেছেন। এই সূরার নামকরণ আল বাকারাহ করার অর্থ এ নয় যে, এখানে গাভী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বরং এর অর্থ কেবল এতটুকু যে, এখানে গাভীর কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরার বেশীর ভাগ মদীনায় হিজরাতের পর মাদানী জীবনের একেবারে প্রথম যুগে নাযিল হয়। আর এর কম অংশ পরে নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে প্রথমোক্ত অংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এমনকি সুদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত যে আয়াতগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয় সেগুলোও এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। যে আয়াতগুলো দিয়ে সূরাটি শেষ করা হয়েছে সেগুলো হিজরাতের আগে মক্কায় নাযিল হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে সেগুলোকেও এ সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

নাযিলের উপলক্ষ

এ সূরাটি বুঝতে হলে প্রথমে এর ঐতিহাসিক পটভূমি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

(১) হিজরাতের আগে ইসলামের দাওয়াতের কাজ চলছিল কেবল মক্কায়। এ সময় পর্যন্ত সম্বোধন করা হচ্ছিল কেবলমাত্র আরবের মুশরিকদেরকে। তাদের কাছে ইসলামের বাণী ছিল সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত। এখন হিজরাতের পরে ইহুদিরা সামনে এসে গেল। তাদের জনবসতিগুলো ছিল মদীনার সাথে একেবারে লাগানো। তারা তাওহীদ, রিসালাত,

অহী, আখেরাত ও ফেরেশতার স্বীকৃতি দিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নবী মূসা আলাইহিস সালামের ওপর যে শরিয়াতী বিধান নাযিল হয়েছিল তারও স্বীকৃতি দিত। নীতিগতভাবে তারাও সেই দীন ইসলামের অনুসারী ছিল যার শিক্ষা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়ে চলছিলেন। কিন্তু বহু শতাব্দী কালের ক্রমাগত পতন ও অবনতির ফলে তারা আসল দীন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।[১] তাদের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে বহু অনৈসলামী বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাওরাতে এর কোন ভিত্তি ছিল না। তাদের কর্মজীবনে এমন অসংখ্য রীতি-পদ্ধতির প্রচলন ঘটেছিল যথার্থ দীনের সাথে যেগুলোর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাওরাতের মূল বিষয়বস্তুর সাথেও এগুলোর কোন সামঞ্জস্য ছিল না। আল্লাহর কালাম তাওরাতের মধ্যে তারা মানুষের কথা মিশিয়ে দিয়েছিল। শাব্দিক বা অর্থগত দিক দিয়ে আল্লাহর কালাম যতটুকু পরিমাণ সংরক্ষিত ছিল তাকেও তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিকৃত করে দিয়েছিল। দীনের যথার্থ প্রাণবস্তু তাদের মধ্য থেকে অন্তরহিত হয়ে গিয়েছিল। লোক দেখানো ধার্মিকতার নিছক একটা নিষ্প্রাণ খোলসকে তারা বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। তাদের উলামা, মাশায়েখ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণ—সবার আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক ও বাস্তব কর্ম জীবন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের এই বিকৃতির প্রতি তাদের আসক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যার ফলে কোন প্রকার সংস্কার সংশোধন গ্রহণের তারা বিরোধী হয়ে উঠেছিল। যখনই কোন আল্লাহর বান্দা তাদেরকে আল্লাহর দীনের সরল-সোজা পথের সন্ধান দিতে আসতেন তখনই তারা তাঁকে নিজেদের সবচেয়ে বড় দুশমন মনে করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তার সংশোধন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতো। শত শত বছর ধরে ক্রমাগতভাবে এই একই ধারার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলছিল। এরা ছিল আসলে বিকৃত মুসলিম। দীনের মধ্যে বিকৃতি, দীন বহির্ভূত বিষয়গুলোর দীনের মধ্যে অনুপ্রবেশ, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি, দলাদলি, বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে মাতামাতি, আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ও পার্থিব লোভ-লালসায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার কারণে তারা পতনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কি তারা নিজেদের আসল 'মুসলিম' নামও ভুলে গিয়েছিল। নিছক 'ইহুদি' নামের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আল্লাহর দীনকে তারা কেবল ইসরাঈল বংশজাতদের পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারে পরিণত করেছিল। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌঁছার পর ইহুদিদেরকে আসল দীনের দিকে আহবান করার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন। সূরা বাকারার ১৫ ও ১৬ রুকূ' এ দাওয়াত সম্বলিত। এ দু'রুকূ'তে যেভাবে ইহুদিদের ইতিহাস এবং তাদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে এবং যেভাবে তাদের বিকৃত ধর্ম ও নৈতিকতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মোকাবিলায় যথার্থ দীনের মূলনীতিগুলো পাশাপাশি উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার মোকাবিলায় যথার্থ ধার্মিকতা কাকে বলে, সত্য ধর্মের মূলনীতিগুলো কি এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন্ কোন্ জিনিস যথার্থ গুরুত্বের অধিকারী তা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১. এ সময়ের প্রায় ১৯শ' বছর আগে হযরত মূসার (আ) যুগ অতীত হয়েছিল। ইসরাঈলী ইতিহাসের হিসেব মতে হযরত মূসা (আ) খৃ. পূ. ১২৭২ অব্দে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬১০ খৃষ্টাব্দে নবুওয়াত লাভ করেন।

(২) মদীনায় পৌঁছার পর ইসলামী দাওয়াত একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। মক্কায় তো কেবল দীনের মূলনীতিগুলোর প্রচার এবং দীনের দাওয়াত গ্রহণকারীদের নৈতিক প্রশিক্ষণ দানের মধ্যেই ইসলামী দাওয়াতের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু হিজরাতের পর যখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে চতুর্দিক থেকে মদীনায় এসে জমায়েত হতে থাকলো এবং আনসারদের সহায়তায় একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্ গড়ে উঠলো তখন মহান আল্লাহ সমাজ, সংস্কৃতি, লোকাচার, অর্থনীতি ও আইন সম্পর্কিত মৌলিক বিধান দিতে থাকলেন এবং ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে এ নতুন জীবন ব্যবস্থাটি কিভাবে গড়ে তুলতে হবে তারও নির্দেশ দিতে থাকলেন। এ সূরার শেষ ২৩টি রুকূ'তে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ নির্দেশ ও বিধানগুলো বয়ান করা হয়েছে। এর অধিকাংশ শুরুতেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং কিছু পাঠানো হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বিক্ষিপ্তভাবে।

(৩) হিজরাতের পর ইসলাম ও কুফরের সংঘাতও একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল। হিজরাতের আগে ইসলামের দাওয়াত কুফরের ঘরের মধ্যেই দেয়া হচ্ছিল। তখন বিভিন্ন গোত্রের যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করতো তারা নিজেদের জায়গায় দীনের প্রচার করতো। এর জবাবে তাদের নির্যাতনের শিকার হতে হতো। কিন্তু হিজরাতের পরে এ বিক্ষিপ্ত মুসলমানরা মদীনায় একত্র হয়ে একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার পর অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তখন একদিকে ছিল একটি ছোট জনপদ এবং অন্যদিকে সমগ্র আরব ভূখণ্ড তাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এখন এ ছোট্ট জামায়াতটির কেবল সাফল্যই নয় বরং তার অস্তিত্ব ও জীবনই নির্ভর করছিল পাঁচটি জিনিসের ওপর। এক, পূর্ণ শক্তিতে ও পরিপূর্ণ উৎসাহ–উদ্দীপনা সহকারে নিজের মতবাদের প্রচার করে সর্বাধিক সংখ্যক লোককে নিজের চিন্তা ও আকীদা–বিশ্বাসের অনুসারী করার চেষ্টা করা। দুই, বিরোধীদের বাতিল ও ভ্রান্ত পথের অনুসারী বিষয়টি তাকে এমনভাবে প্রমাণ করতে হবে যেন কোন বুদ্ধি–বিবেকবান ব্যক্তির মনে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সংশয় না থাকে। তিন, গৃহহারা ও সারা দেশের মানুষের শত্রুতা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হবার কারণে অভাব–অনটন, অনাহার–অর্ধাহার এবং সার্বক্ষণিক অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় সে ভুগছিল। চতুর্দিক থেকে বিপদ তাকে ঘিরে নিয়েছিল এ অবস্থায় যেন সে ভীত–সন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে। পূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে যেন অবস্থার মোকাবিলা করে এবং নিজের সংকল্পের মধ্যে সামান্যতম দ্বিধা সৃষ্টির সুযোগ না দেয়। চার, তার দাওয়াতকে ব্যর্থকাম করার জন্য যে কোন দিক থেকে যে কোন সশস্ত্র আক্রমণ আসবে পূর্ণ সাহসিকতার সাথে তার মোকাবিলা করার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হবে। বিরোধী পক্ষের সংখ্যা ও তাদের শক্তির আধিক্যের পরোয়া করা চলবে না। পাঁচ, তার মধ্যে এমন সুদৃঢ় হিম্মত সৃষ্টি করতে হবে যার ফলে আরবের লোকেরা ইসলাম যে নতুন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় তাকে আপসে গ্রহণ করতে না চাইলে বল প্রয়োগে জাহেলিয়াতের বাতিল ব্যবস্থাকে মিটিয়ে দিতে সে একটুও ইতস্তত করবে না। এ সূরায় আল্লাহ এ পাঁচটি বিষয়ের প্রাথমিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

(৪) ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে একটি নতুন গোষ্ঠীও আত্মপ্রকাশ শুরু করেছিল। এটি ছিল মুনাফিক গোষ্ঠী। নবী করীমের (সা) মক্কায় অবস্থান কালের শেষের দিকেই

মুনাফিকীর প্রাথমিক আলামতগুলো সুস্পষ্ট হতে শুরু হয়েছিল। তবুও সেখানে কেবল এমন ধরনের মুনাফিক পাওয়া যেতো যারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো এবং নিজেদের ঈমানের ঘোষণাও দিতো। কিন্তু এ সত্যের খাতিরে নিজেদের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে নিজেদের পার্থিব সম্পর্কচ্ছেদ করতে এবং এ সত্য মতবাদটি গ্রহণ করার সাথে সাথেই যে সমস্ত বিপদ–আপদ, যন্ত্রণা–লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন–নির্যাতন নেমে আসতে থাকতো তা মাথা পেতে নিতে তারা প্রস্তুত ছিল না। মদীনায় আসার পর এ ধরনের মুনাফিকদের ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের মুনাফিক ইসলামী দলে দেখা যেতে লাগলো। মুনাফিকদের একটি গোষ্ঠী ছিল ইসলামকে চূড়ান্তভাবে অস্বীকারকারী। তারা নিছক ফিত্‌না সৃষ্টি করার জন্য মুসলমানদের দলে প্রবেশ করতো। মুনাফিকদের দ্বিতীয় গোষ্ঠীটির অবস্থা ছিল এই যে, চতুর্দিক থেকে মুসলিম কর্তৃত্ব ও প্রশাসন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাবার কারণে তারা নিজেদের স্বার্থ–সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদিকে নিজেদেরকে মুসলমানদের অন্তরভুক্ত করতো এবং অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতো। এভাবে তারা উভয় দিকের লাভের হিস্‌সা ঝুলিতে রাখতো এবং উভয় দিকের বিপদের ঝাপ্‌টা থেকেও সংরক্ষিত থাকতো। তৃতীয় গোষ্ঠীতে এমন ধরনের মুনাফিকদের সমাবেশ ঘটেছিল যারা ছিল ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে দ্বিধা–দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান। ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে তারা পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল না। কিন্তু যেহেতু তাদের গোত্রের বা বংশের বেশির ভাগ লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাই তারাও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। মুনাফিকদের চতুর্থ গোষ্ঠীটিতে এমন সব লোকের সমাবেশ ঘটেছিল যারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল কিন্তু জাহেলিয়াতের আচার–আচরণ, কুসংস্কার ও বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করতে, নৈতিক বাধ্যবাধকতার শৃংখল গলায় পরে নিতে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহন করতে তাদের মন চাইতো না।

সূরা বাকারাহ নাযিলের সময় সবেমাত্র এসব বিভিন্ন ধরনের মুনাফিক গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ শুরু হয়েছিল। তাই মহান আল্লাহ এখানে তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইংগিত করেছেন মাত্র। পরবর্তীকালে তাদের চরিত্র ও গতি–প্রকৃতি যতই সুস্পষ্ট হতে থাকলো ততই বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মুনাফিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি অনুযায়ী পরবর্তী সূরাগুলোয় তাদের সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আলিফ লাম মীম।[১] এটি আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।[২] এটি হিদায়াত সেই 'মুত্তাকী'দের[৩] জন্য যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে,[৪] নামায কায়েম করে[৫] এবং যে রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।[৬]

১. এগুলো বিচ্ছিন্ন হরফ। কুরআন মজীদের কোন কোন সূরার শুরুতে এগুলো দেখা যায়। কুরআন মজীদ নাযিলের যুগে সমকালীন আরবী সাহিত্যে এর ব্যবহার ছিল। বক্তার বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সাধারণত এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বক্তা ও কবি উভয় গোষ্ঠীই এ পদ্ধতির আশ্রয় নিতেন। বর্তমানে জাহেলী যুগের কবিতার যেসব নমুনা সংরক্ষিত আছে তার মধ্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে ব্যবহারের কারণে এ বিচ্ছিন্ন হরফগুলো কোন ধাঁধা হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। এগুলো এমন ছিল না যে, কেবল বক্তাই এগুলোর অর্থ বুঝতো বরং শ্রোতারাও এর অর্থ বুঝতে পারতো। এ কারণে দেখা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন বিরোধীদের একজনও এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়নি। তাদের একজনও একথা বলেনি যে, বিভিন্ন সূরার শুরুতে আপনি যে কাটা কাটা হরফগুলো বলে যাচ্ছেন এগুলো কি? এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এগুলোর অর্থ জানতে চেয়েছেন এ মর্মে কোন হাদীসও উদ্ধৃত হতে দেখা যায়নি। পরবর্তীকালে আরবী ভাষায় এ বর্ণনা পদ্ধতি পরিত্যক্ত হতে চলেছে। ফলে কুরআন ব্যাখ্যাকারীদের জন্য এগুলোর অর্থ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করা এ শব্দগুলোর অর্থ বুঝার ওপর নির্ভরশীল নয়। অথবা এ হরফগুলোর মানে না বুঝলে কোন ব্যক্তির সরল সোজা পথ লাভের মধ্যে গলদ থেকে যাবে, এমন কোন কথাও নেই। কাজেই একজন সাধারণ পাঠকের জন্য এর অর্থ অনুসন্ধানে ব্যাকুল হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

২. এর একটা সরল অর্থ এভাবে করা যায় "নিসন্দেহে এটা আল্লাহর কিতাব।" কিন্তু এর একটা অর্থ এও হতে পারে যে, এটা এমন একটা কিতাব যাতে সন্দেহের কোন লেশ নেই। দুনিয়ায় যতগুলো গ্রন্থে অতিপ্রাকৃত এবং মানুষের বুদ্ধি–জ্ঞান বহির্ভূত বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো সবই কল্পনা, ধারণা ও আন্দাজ–অনুমানের ভিত্তিতে লিখিত হয়েছে। তাই এ গ্রন্থগুলোর লেখকরাও নিজেদের রচনাবলীর নির্ভুলতা সম্পর্কে যতই প্রত্যয় প্রকাশ করুক না কেন তাদের নির্ভুলতা সন্দেহ–মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু এ কুরআন মজীদ এমন একটি গ্রন্থ যা আগাগোড়া নির্ভুল সত্য জ্ঞানে সমৃদ্ধ। এর রচয়িতা হচ্ছেন এমন এক মহান সত্তা যিনি সমস্ত তত্ব ও সত্যের জ্ঞান রাখেন। কাজেই এর মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। মানুষ নিজের অজ্ঞতার কারণে এর মধ্যে সন্দেহ পোষণ করলে সেটা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা এবং সে জন্য এ কিতাব দায়ী নয়।

৩. অর্থাৎ এটি একেবারে একটি হিদায়াত ও পথনির্দেশনার গ্রন্থ। কিন্তু এর থেকে লাভবান হতে চাইলে মানুষের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক গুণ থাকতে হবে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে গুণটির প্রয়োজন সেটি হচ্ছে, তাকে "মুত্তাকী" হতে হবে। ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা তার মধ্যে থাকতে হবে। তার মধ্যে মন্দ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ও ভালোকে গ্রহণ করার আকাংখা এবং এ আকাংখাকে বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা থাকতে হবে। তবে যারা দুনিয়ায় পশুর মতো জীবন যাপন করে, নিজেদের কৃতকর্ম সঠিক কি না সে ব্যাপারে কখনো চিন্তা করে না, যেদিকে সবাই চলছে বা যেদিকে প্রবৃত্তি তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে অথবা যেদিকে মন চায় সেদিকে চলতে যারা অভ্যস্ত, তাদের জন্য কুরআন মজীদে কোন পথনির্দেশনা নেই।

৪. কুরআন থেকে লাভবান হবার জন্য এটি হচ্ছে দ্বিতীয় শর্ত। 'গায়েব' বা অদৃশ্য বলতে এমন গভীর সত্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত এবং কখনো সরাসরি সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না। যেমন আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, ফেরেশতা, অহী, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি। এ গভীর সত্যগুলোকে না দেখে মেনে নেয়া এবং নবী এগুলোর খবর দিয়েছেন বলে তাঁর খবরের সত্যতার প্রতি আস্থা রেখে এগুলোকে মেনে নেয়াই হচ্ছে 'ঈমান বিল গায়েব' বা অদৃশ্যে বিশ্বাস। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি অনুভব করা যায় না এমন সত্যগুলো মেনে নিতে প্রস্তুত হবে একমাত্র সে–ই কুরআনের হিদায়াত ও পথনির্দেশনা থেকে উপকৃত হতে পারবে। আর যে ব্যক্তি মেনে নেয়ার জন্য দেখার, ঘ্রাণ নেয়ার ও আস্বাদন করার শর্ত আরোপ করে এবং যে ব্যক্তি বলে, আমি এমন কোন জিনিস মেনে নিতে পারি না যা পরিমাণ করা ও ওজন করা যায় না— সে এ কিতাব থেকে হিদায়াত ও পথনির্দেশনা লাভ করতে পারবে না।

৫. এটি হচ্ছে তৃতীয় শর্ত। এর অর্থ হচ্ছে, যারা কেবল মেনে নিয়ে নীরবে বসে থাকবে তারা কুরআন থেকে উপকৃত হতে পারবে না। বরং মেনে নেয়ার পর সংগে সংগেই তার আনুগত্য করা ও তাকে কার্যকর করাই হচ্ছে এ থেকে উপকৃত হবার জন্য একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজন। আর বাস্তব আনুগত্যের প্রধান ও স্থায়ী আলামত হচ্ছে নামায। ঈমান আনার পর কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হতে না হতেই মুয়াযযিন নামাযের জন্য আহবান জানায় আর ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি বাস্তবে আনুগত্য করতে প্রস্তুত কি না তার ফায়সালা

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

আর যে কিতাব তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং তোমার আগে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল সে সবগুলোর ওপর ঈমান আনে[৭] আর আখেরাতের ওপর একীন রাখে।[৮] এ ধরনের লোকেরা তাদের রবের পক্ষ থেকে সরল সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা কল্যাণ লাভের অধিকারী।

তখনই হয়ে যায়। এ মুয়াযযিন আবার প্রতিদিন পাঁচবার আহবান জানাতে থাকে। যখনই এ ব্যক্তি তার আহবানে সাড়া না দেয় তখনই প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি এবার আনুগত্য থেকে বের হয়ে এসেছে। কাজেই নামায ত্যাগ করা আসলে আনুগত্য ত্যাগ করারই নামান্তর। বলা বাহুল্য কোন ব্যক্তি যখন কারোর নির্দেশ মেনে চলতে প্রস্তুত থাকে না তখন তাকে নির্দেশ দেয়া আর না দেয়া সমান।

ইকামাতে সালাত বা নামায কায়েম করা একটি ব্যাপক ও পূর্ণ অর্থবোধক পরিভাষা একথাটি অবশ্যি জেনে রাখা প্রয়োজন। এর অর্থ কেবল নিয়মিত নামায পড়া নয় বরং সামষ্টিকভাবে নামাযের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করাও এর অর্থের অন্তরভুক্ত। যদি কোন লোকালয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিয়মিতভাবে নামায পড়ে থাকে কিন্তু জামায়াতের সাথে এ ফরযটি আদায় করার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সেখানে নামায কায়েম আছে, একথা বলা যাবে না।

৬. কুরআনের হিদায়াত লাভ করার জন্য এটি হচ্ছে চতুর্থ শর্ত। সংকীর্ণমনা ও অর্থলোলুপ না হয়ে মানুষকে হতে হবে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার আদায়কারী। তার সম্পদে আল্লাহ ও বান্দার যে অধিকার স্বীকৃত হয়েছে তাকে তা আদায় করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যে বিষয়ের ওপর সে ঈমান এনেছে তার জন্য অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার করার ব্যাপারে সে কোন রকম ইতস্তত করতে পারবে না।

৭. এটি হচ্ছে পঞ্চম শর্ত। অর্থাৎ আল্লাহ অহীর মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে যেসব কিতাব নাযিল করেছিলেন সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। এ শর্তটির কারণে যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য বিধান অবতরণের প্রয়োজনীয়তাকে আদতে স্বীকারই করে না অথবা প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করলেও এ জন্য অহী ও নবুওয়াতের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না এবং এর পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া মতবাদকে আল্লাহর বিধান বলে ঘোষণা করে অথবা আল্লাহর কিতাবের স্বীকৃতি দিলেও কেবলমাত্র সেই কিতাবটি

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑥ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑦

যেসব লোক (একথাগুলো মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে,[৯] তাদের জন্য সমান—তোমরা তাদের সতর্ক করো বা না করো, তারা মেনে নেবে না। আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন।[১০] এবং তাদের চোখের ওপর আবরণ পড়ে গেছে। তারা কঠিন শাস্তি পওয়ার যোগ্য।

বা কিতাবগুলোর ওপর ঈমান আনে যেগুলোকে তাদের বাপ–দাদারা মেনে আসছে আর এ উৎস থেকে উৎসারিত অন্যান্য বিধানগুলোকে অস্বীকার করে—তাদের সবার জন্য কুরআনের হিদায়াতের দুয়ার রুদ্ধ। এ ধরনের সমস্ত লোককে আলাদা করে দিয়ে কুরআন তার অনুগ্রহ একমাত্র তাদের ওপর বর্ষণ করে যারা নিজেদেরকে আল্লাহর বিধানের মুখাপেক্ষী মনে করে এবং আল্লাহর এ বিধান আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে না এসে বরং নবীদের ও আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমেই মানুষের কাছে আসে বলে স্বীকার করে আর এই সংগে বংশ, গোত্র বা জাতি প্রীতিতে লিপ্ত হয় না বরং নির্ভেজাল সত্যের পূজারী হয়, সত্য যেখানে যে আকৃতিতে আবির্ভূত হোক না কেন তারা তার সামনে মস্তক অবনত করে দেয়।

৮. এটি ষষ্ঠ ও সর্বশেষ শর্ত। আখেরাত একটি ব্যাপক ও পরিপূর্ণ অর্থবোধক শব্দ। আকীদা–বিশ্বাসের বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টির ভিত্তিতে এ আখেরাতের ভাবধারা গড়ে উঠেছে। বিশ্বাসের নিম্নোক্ত উপাদানগুলো এর অন্তরভুক্ত।

এক ঃ এ দুনিয়ায় মানুষ কোন দায়িত্বহীন জীব নয়। বরং নিজের সমস্ত কাজের জন্য তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

দুই ঃ দুনিয়ার বর্তমান ব্যবস্থা চিরন্তন নয়। এক সময় এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং সে সময়টা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

তিন ঃ এ দুনিয়া শেষ হবার পর আল্লাহ আর একটি দুনিয়া তৈরি করবেন। সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মনুষের জন্ম হয়েছে সবাইকে সেখানে একই সংগে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। সবাইকে একত্র করে তাদের কর্মকাণ্ডের হিসেব নেবেন। সবাইকে তার কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন।

চার ঃ আল্লাহর এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সৎলোকেরা জান্নাতে স্থান পাবে এবং অসৎলোকদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

২ রুকূ'

কিছু লোক এমনও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর ওপর ও আখেরাতের দিনের ওপর ঈমান এনেছি, অথচ আসলে তারা মু'মিন নয়। তারা আল্লাহর সাথে ও যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে ধোঁকাবাজি করছে। কিন্তু আসলে তারা নিজেদেরকেই প্রতারণা করছে, তবে তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয়।[১১] তাদের হৃদয়ে আছে একটি রোগ, আল্লাহ সে রোগ আরো বেশী বাড়িয়ে দিয়েছেন,[১২] আর যে মিথ্যা তারা বলে তার বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যখনই তাদের বলা হয়েছে, যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা একথাই বলেছে, আমরা তো সংশোধনকারী।

পাঁচ ঃ বর্তমান জীবনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অসমৃদ্ধি সাফল্য ও ব্যর্থতার আসল মানদণ্ড নয়। বরং আল্লাহর শেষ বিচারে যে ব্যক্তি উত্‌রে যাবে সে-ই হচ্ছে সফলকাম আর সেখানে যে উত্‌রোবে না সে ব্যর্থ।

এ সমগ্র আকীদা-বিশ্বাসগুলোকে যারা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি তারা কুরআন থেকে কোনক্রমেই উপকৃত হতে পারবে না। কারণ এ বিষয়গুলো অস্বীকার করা তো দূরের কথা এগুলো সম্পর্কে কারো মনে যদি সামান্যতম দ্বিধা ও সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলে মানুষের জীবনের জন্য কুরআন যে পথনির্দেশ করেছে সে পথে তারা চলতে পারবে না।

৯. অর্থাৎ ওপরে বর্ণিত ছয়টি শর্ত যারা পূর্ণ করেনি অথবা সেগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

১০. আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছিলেন বলেই তারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল—এটা এ বক্তব্যের অর্থ নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, যখন তারা ওপরে বর্ণিত মৌলিক বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নিজেদের জন্য কুরআনের উপস্থাপিত পথের পরিবর্তে অন্য পথ বেছে নিয়েছিল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর মেরে

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوٓا أَنُؤْمِنُ كَمَآ آمَنَ السُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ
هُمُ السُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوٓا آمَنَّا ۖ
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ ۙ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ ۙ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾

সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, তবে তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয়। আর যখন তাদের বলা হয়েছে, অন্য লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো[১৩] তখন তারা এ জবাবই দিয়েছে—আমরা কি ঈমান আনবো নির্বোধদের মতো?[১৪] সাবধান! আসলে এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা জানে না। যখন এরা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয়, বলে ঃ "আমরা ঈমান এনেছি," আবার যখন নিরিবিলিতে নিজেদের শয়তানদের[১৫] সাথে মিলিত হয় তখন বলে ঃ "আমরা তো আসলে তোমাদের সাথেই আছি আর ওদের সাথে তো নিছক তামাশা করছি।"

দিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি কখনো ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তিনি অবশ্যি এ মোহর লাগার অবস্থার ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকবেন। আপনার উপস্থাপিত পথ যাচাই করার পর কোন ব্যক্তি একবার যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে তখন উল্‌টো পথে তার মন–মানস এমনভাবে দৌড়াতে থাকে যার ফলে আপনার কোন কথা আর তার বোধগম্য হয় না। আপনার দাওয়াতের জন্য তার কান হয়ে যায় বধির ও কালা। আপনার কার্যপদ্ধতির গুণাবলী দেখার ব্যাপারে তার চোখ হয়ে যায় অন্ধ। তখন সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, সত্যিই তার হৃদয়ের দুয়ারে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

১১. অর্থাৎ তাদের মুনাফেকী কার্যকলাপ তাদের জন্য লাভজনক হবে—এ ভুল ধারণায় তারা নিমজ্জিত হয়েছে। অথচ এসব তাদেরকে দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং আখেরাতেও। একজন মুনাফিক কয়েকদিনের জন্য দুনিয়ায় মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে কিন্তু সবসময়ের জন্য তার এই ধোঁকাবাজি চলতে পারে না। অবশেষে একদিন তার মুনাফিকীর গুমোর ফাঁক হয়ে যাবেই। তখন সমাজে তার সামান্যতম মর্যাদাও খতম হয়ে যাবে। আর আখেরাতের ব্যাপারে বলা যায়, সেখানে তো ঈমানের মৌখিক দাবীর কোন মূল্যই থাকবে না যদি আমল দেখা যায় তার বিপরীত।

১২. মুনাফিকীকেই এখানে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ এ রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি কালবিলম্ব না করে ঘটনাস্থলেই মুনাফিকদেরকে তাদের মুনাফিকী কার্যকলাপের শাস্তি দেন না বরং তাদেরকে

ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت
تِّجَـٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى
ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَـٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾

আল্লাহ এদের সাথে তামাশা করছেন, এদের রশি দীর্ঘায়িত বা ঢিল দিয়ে যাচ্ছেন এবং এরা নিজেদের আল্লাহদ্রোহিতার মধ্যে অন্ধের মতো পথ হাতড়ে মরছে। এরাই হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী কিনে নিয়েছে, কিন্তু এ সওদাটি তাদের জন্য লাভজনক নয় এবং এরা মোটেই সঠিক পথে অবস্থান করছে না। এদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো এবং যখনই সেই আগুন চারপাশ আলোকিত করলো তখন আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদের ছেড়ে দিলেন এমন অবস্থায় যখন অন্ধকারের মধ্যে তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না।[১৬]

ঢিল দিতে থাকেন। এর ফলে মুনাফিকরা নিজেদের কলা-কৌশলগুলোকে আপাত দৃষ্টিতে সফল হতে দেখে আরো বেশী ও পূর্ণ মুনাফিকী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে থাকে।

১৩. অর্থাৎ তোমাদের এলাকার অন্যান্য লোকেরা যেমন সাচ্চা দিলে ও সরল অন্তঃকরণে মুসলমান হয়েছে তোমরাও যদি ইসলাম গ্রহণ করতে চাও তাহলে তেমনি নিষ্ঠা সহকারে সাচ্চা দিলে গ্রহণ করো।

১৪. যারা সাচ্চা দিলে নিষ্ঠা সহকারে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে উৎপীড়ন, নির্যাতন, কষ্ট ও বিপদের মুখে নিক্ষেপ করছিল তাদেরকে তারা নির্বোধ মনে করতো। তাদের মতে নিছক সত্য ও ন্যায়ের জন্য সারা দেশের জনসমাজের শত্রুতার মুখোমুখি হওয়া নিরেট বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা মনে করতো, হক ও বাতিলের বিতর্কে না পড়ে সব ব্যাপারেই কেবলমাত্র নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

১৫. আরবী ভাষায় সীমালংঘনকারী, দাম্ভিক ও স্বৈরাচারীকে শয়তান বলা হয়। মানুষ ও জিন উভয়ের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কুরআনের অধিকাংশ জায়গায় এ শব্দটি জিনদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলেও কোন কোন জায়গায় আবার শয়তান প্রকৃতির মানুষদের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষাপটে এসব ক্ষেত্রে

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ۗ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾

তারা কালা, বোবা, অন্ধ।[১৭] তারা আর ফিরে আসবে না। অথবা এদের দৃষ্টান্ত এমন যে, আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তার সাথে আছে অন্ধকার মেঘমালা, বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রপাতের আওয়াজ শুনে নিজেদের প্রাণের ভয়ে এরা কানে আঙুল ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ এ সত্য অস্বীকারকারীদেরকে সবদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন।[১৮] বিদ্যুৎ চমকে তাদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যেন বিদ্যুৎ শীগ্‌গির তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেবে। যখন সামান্য একটু আলো তারা অনুভব করে তখন তার মধ্যে তারা কিছুদূর চলে এবং যখন তাদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায় তারা দাঁড়িয়ে পড়ে।[১৯] আল্লাহ চাইলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি একেবারেই কেড়ে নিতে পারতেন।[২০] নিসন্দেহে তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।

কোথায় শয়তান শব্দটি জিনদের জন্য এবং কোথায় মানুষদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা সহজেই জানা যায়। তবে আমাদের আলোচ্য স্থানে শয়তান শব্দটিকে বহুবচনে 'শায়াতীন' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে "শায়াতীন' বলতে মুশরিকদের বড় বড় সরদারদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ সরদাররা তখন ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

১৬. যখন আল্লাহর এক বান্দা আলো জ্বালালেন এবং হককে বাতিল থেকে, সত্যকে মিথ্যা থেকে ও সরল সোজা পথকে ভুল পথ থেকে ছেটে সুস্পষ্টরূপে আলাদা করে ফেললেন তখন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের কাছে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সুস্পষ্ট দিবালোকের মতো। কিন্তু প্রবৃত্তি পূজায় অন্ধ মুনাফিকরা এ আলোয় কিছুই দেখতে পেলো না। "আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন"—বাক্যের কারণে কেউ যেন এ ভুল ধারণা পোষণ না করেন যে, তাদের অন্ধকারে হাতড়ে মরার জন্য তারা নিজেরা দায়ী নয়। যে ব্যক্তি নিজে হক ও সত্যের প্রত্যাশী নয়, নিজেই হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীকে নিজের বুকে

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

হে মানব জাতি।[২১] ইবাদাত করো তোমাদের রবের, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের সবার সৃষ্টিকর্তা, এভাবেই তোমরা নিষ্কৃতি লাভের আশা করতে পারো।[২২] তিনিই তোমাদের জন্য মাটির শয্যা বিছিয়েছেন, আকাশের ছাদ তৈরি করেছেন, ওপর থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে সব রকমের ফসলাদি উৎপন্ন করে তোমাদের আহার যুগিয়েছেন। কাজেই একথা জানার পর তোমরা অন্যদেরকে আল্লাহর প্রতিপক্ষে পরিণত করো না।[২৩]

আঁকড়ে ধরে এবং সত্যের আলোকোজ্জ্বল চেহারা দেখার আগ্রহ যার মোটেই নেই, আল্লাহ তারই দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেন। সত্যের আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে নিজেই যখন বাতিলের অন্ধকারে হাতড়ে মরতে চায় তখন আল্লাহও তাকে তারই সুযোগ দেন।

১৭. হককথা শোনার ব্যাপারে বধির, হককথা বলার ক্ষেত্রে বোবা এবং হক ও সত্য দেখার প্রশ্নে অন্ধ।

১৮. কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে এরা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাবে—এ ধারণায় কিছুক্ষণের জন্য ডুবে যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এভাবে তারা বাঁচতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তাঁর সমগ্র শক্তি দিয়ে তাদেরকে ঘিরে রেখেছেন।

১৯. প্রথম দৃষ্টান্তটি ছিল এমন সব মুনাফিকদের যারা মানসিক দিক দিয়ে ঈমান ও ইসলামকে পুরোপুরি অস্বীকার করতো কিন্তু কোন স্বার্থ ও সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। আর এ দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হচ্ছে সন্দেহ, সংশয় ও দ্বিধার শিকার এবং দুর্বল ঈমানের অধিকারীদের। এরা কিছুটা সত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু সে জন্য বিপদ–মুসিবত, কষ্ট–নির্যাতন সহ্য করতে তারা প্রস্তুত ছিল না। এ দৃষ্টান্তে বৃষ্টি বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য একটি রহমত রূপে আবির্ভূত হয়েছে। অন্ধকার মেঘমালা, বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রের গর্জন বলে এখানে সেই ব্যাপক দুঃখ–কষ্ট, বিপদ–আপদ ও সংকটের কথা বুঝানো হয়েছে ইসলামী আন্দোলনের মোকাবিলায় জাহেলী শক্তির প্রবল বিরোধিতার মুখে যেগুলো একের পর এক সামনে

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ
مِنْ مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

আর যে কিতাবটি আমি আমার বান্দার ওপর নাযিল করেছি সেটি আমার কিনা—এ ব্যাপারে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করে থাকো তাহলে তার মতো একটি সূরা তৈরি করে আনো এবং নিজেদের সমস্ত সমর্থক গোষ্ঠীকে ডেকে আনো—এক আল্লাহকে ছাড়া আর যার যার চাও তার সাহায্য নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে এ কাজটি করে দেখাও।[২৪] কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো আর নিসন্দেহে কখনই তোমরা এটা করতে পারবে না, তাহলে ভয় করো সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর,[২৫] যা তৈরি রাখা হয়েছে সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য।

আসছিল। দৃষ্টান্তের শেষ অংশে এক অভিনব পদ্ধতিতে এ মুনাফিকদের এ অবস্থার নক্‌শা আঁকা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাপারটি একটু সহজ হয়ে গেলে তারা চলতে থাকে আবার সমস্যা–সংকটের জট পাকিয়ে গেলে অথবা তাদের প্রবৃত্তি বিরোধী হয়ে পড়লে বা জাহেলী স্বার্থে আঘাত পড়লে তারা সটান দাঁড়িয়ে যায়।

২০. অর্থাৎ যেভাবে প্রথম ধরনের মুনাফিকদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সেভাবে আল্লাহ তাদেরকেও হক ও সত্যের ব্যাপারে কানা ও কালায় পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কিছুটা দেখতে ও শুনতে চায় তাকে ততটুকুও দেখতে শুনতে না দেয়া আল্লাহর রীতি নয়। যতটুকু হক দেখতে ও শুনতে তারা প্রস্তুত ছিল আল্লাহ ততটুকু শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি তাদের আয়ত্বাধীনে রেখেছিলেন।

২১. যদিও কুরআনের দাওয়াত সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির জন্য তবুও এ দাওয়াত থেকে লাভবান হওয়া না হওয়া মানুষের নিজের ইচ্ছা প্রবণতার ওপর এবং সেই প্রবণতা অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগের ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রথমে মানুষের মধ্যে পার্থক্য করে কোন্ ধরনের লোক এ কিতাবের পথনির্দেশনা থেকে লাভবান হতে পারে এবং কোন্ ধরনের লোক লাভবান হতে পারে না তা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তারপর এখন সমগ্র মানবজাতির সামনে সেই আসল কথাটিই পেশ করা হচ্ছে, যেটি পেশ করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল।

২২. অর্থাৎ দুনিয়ায় ভুল চিন্তা–দর্শন, ভুল কাজ–কর্ম ও আখেরাতে আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতিলাভের আশা করতে পারো।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾

আর হে নবী, যারা এ কিতাবের ওপর ঈমান আনবে এবং (এর বিধান অনুযায়ী) নিজেদের কার্যধারা সংশোধন করে নেবে তাদেরকে এ মর্মে সুখবর দাও যে, তাদের জন্য এমন সব বাগান আছে যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা। সেই বাগানের ফল দেখতে দুনিয়ার ফলের মতই হবে। যখন কোন ফল তাদের দেয়া হবে খাবার জন্য, তারা বলে উঠবে ঃ এ ধরনের ফলই ইতিপূর্বে দুনিয়ায় আমাদের দেয়া হতো।[২৬] *তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক-পবিত্র স্ত্রীগণ*[২৭] *এবং তারা সেখানে থাকবে চিরকাল।*

২৩. অর্থাৎ যখন তোমরা নিজেরাই একথা স্বীকার করো এবং এ সমস্তই আল্লাহ করেছেন বলে তোমরা জানো তখন তোমাদের সমস্ত বন্দেগী ও দাসত্ব একমাত্র তাঁর জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। আর কার বন্দেগী ও দাসত্ব তোমরা করবে? আর কে এর অধিকারী হতে পারে? অন্যদেরকে আল্লাহর প্রতিপক্ষ বানাবার অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের দাসত্ব ও বন্দেগীর মধ্য থেকে কোনটিকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের সাথে সম্পর্কিত করা। সামনের দিকে কুরআনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে। তা থেকে জানা যাবে, কোন্ ধরনের ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, যাতে অন্যদেরকে শরীক 'শির্ক'-এর অন্তরভুক্ত এবং যার পথ রোধ করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

২৪. ইতিপূর্বে মক্কায় কয়েকবার এ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছিল, যদি তোমরা এ কুরআনকে মানুষের রচনা মনে করে থাকো তাহলে এর সমমানের কোন বাণী রচনা করে আনো। এখন মদীনায় এসে আবার সেই একই চ্যালেঞ্জের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। (দেখুন সূরা ইউনূস ৩৮ আয়াত, সূরা হুদ ১৩ আয়াত, সূরা বনী ইসরাঈল ৮৮ আয়াত এবং সূরা তূর ৩৩-৩৪ আয়াত)।

২৫. এখানে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে। অর্থাৎ সেখানে দোজখের ইন্ধন কেবল তোমরা একাই হবে না বরং তোমাদের সাথে থাকবে তোমাদের ঠাকুর ও আরাধ্য দেবতাদের সেই সব মূর্তি যাদেরকে তোমরা মাবুদ ও আরাধ্য বানিয়ে পূজা করে আসছিলে। তখন তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে খোদায়ী করার ও উপাস্য হবার ব্যাপারে এদের অধিকার কতটুকু।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ
كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ
يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

অবশ্য আল্লাহ লজ্জা করেন না মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ কোন জিনিসের দৃষ্টান্ত দিতে।[২৮] *যারা সত্য গ্রহণকারী তারা এ দৃষ্টান্ত–উপমাগুলো দেখে জানতে পারে এগুলো সত্য, এগুলো এসেছে তাদের রবেরই পক্ষ থেকে, আর যারা (সত্যকে) গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় তারা এগুলো শুনে বলতে থাকে, এ ধরনের দৃষ্টান্ত–উপমার সাথে আল্লাহর কী সম্পর্ক? এভাবে আল্লাহ একই কথার সাহায্যে অনেককে গোমরাহীতে লিপ্ত করেন আবার অনেককে দেখান সরল সোজা পথ।*[২৯] *আর তিনি গোমরাহীর মধ্যে তাদেরকেই নিক্ষেপ করেন যারা ফাসেক,*[৩০] *যারা আল্লাহর সাথে মজবুতভাবে অংগীকার করার পর আবার তা ভেঙ্গে ফেলে,*[৩১] *আল্লাহ যাকে জোড়ার হুকুম দিয়েছেন তাকে কেটে ফেলে*[৩২] *এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে চলে।*[৩৩] *আসলে এরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।*

২৬. অর্থাৎ এ ফলগুলো নতুন ও অপরিচিত হবে না। দুনিয়ায় যেসব ফলের সাথে তারা পরিচিত ছিল সেগুলোর সাথে এদের আকার আকৃতির মিল থাকবে। তবে হাঁ এদের স্বাদ হবে অনেক গুণ বেশী ও উন্নত পর্যায়ের। যেমন ধরুন আম, কমলা ও ডালিমের মতো হবে অনেকগুলো ফল। জান্নাতবাসীরা ফলগুলো দেখে চিনতে পারবে—এগুলো আম, এগুলো কমলা এবং এগুলো ডালিম। কিন্তু স্বাদের দিক দিয়ে দুনিয়ার আম, কমলা ও ডালিমকে এর সাথে তুলনাই করা যাবে না।

২৭. মূল আরবী বাক্যে 'আযওয়াজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'যওজ'। এর অর্থ হচ্ছে 'জোড়া।' এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রী উভয় অর্থে ব্যবহার করা হয়। স্বামীর জন্য স্ত্রী হচ্ছে 'যওজ।' আবার স্ত্রীর জন্য স্বামী হচ্ছে 'যওজ।' তবে আখেরাতে 'আযওয়াজ' অর্থাৎ জোড়া হবে পবিত্রতার গুণাবলী সহকারে। যদি দুনিয়ায় কোন সৎকর্মশীল পুরুষের স্ত্রী সৎকর্মশীলা না হয় তাহলে আখেরাতে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন

হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ঐ সৎকর্মশীল পুরুষটিকে অন্য কোন সৎকর্মশীলা স্ত্রী দান করা হবে। আর যদি দুনিয়ায় কোন স্ত্রী হয় সৎকর্মশীলা এবং তার স্বামী হয় অসৎ তাহলে আখেরাতে ঐ অসৎ স্বামী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে কোন সৎপুরুষকে তার স্বামী হিসেবে দেয়া হবে। তবে যদি দুনিয়ায় কোন স্বামী–স্ত্রী দু'জনই সৎকর্মশীল হয় তাহলে আখেরাতে তাদের এই সম্পর্কটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সম্পর্কে পরিণত হবে।

২৮. এখানে একটি আপত্তি ও প্রশ্নের উল্লেখ না করেই তার জবাব দেয়া হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য সুস্পষ্ট করার জন্য মশা, মাছি ও মাকড়শা ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। বিরোধীরা এর ওপর আপত্তি উঠিয়েছিল, এটা কোন্ ধরনের আল্লাহর কালাম যেখানে এই ধরনের তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে? তারা বলতো, এটা আল্লাহর কালাম হলে এর মধ্যে এসব বাজে কথা থাকতো না।

২৯. অর্থাৎ যারা কথা বুঝতে চায় না, সত্যের মর্ম অনুসন্ধান করে না, তাদের দৃষ্টি তো কেবল শব্দের বাইরের কাঠামোর ওপর নিবদ্ধ থাকে এবং ঐ জিনিসগুলো থেকে বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সত্য থেকে আরো দূরে চলে যায়। অপর দিকে যারা নিজেরাই সত্য সন্ধানী এবং সঠিক দৃষ্টিশক্তির অধিকারী তারা ঐ সব কথার মধ্যে সূক্ষ্ম জ্ঞানের আলোকচ্ছটা দেখতে পায়। এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ কথা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হতে পারে বলে তাদের সমগ্র হৃদয় মন সাক্ষ দিয়ে ওঠে।

৩০. ফাসেক তাকে বলে যে নাফরমান এবং আল্লাহর আনুগত্যের সীমা অতিক্রম করে যায়।

৩১. বাদশাহ নিজের কর্মচারী ও প্রজাদের নামে যে ফরমান বা নির্দেশনামা জারী করেন আরবী ভাষায় প্রচলিত কথ্যরীতিতে তাকে বলা হয় 'আহদ' বা অংগীকার। কারণ এই অংগীকার মেনে চলা হয় প্রজাদের অপরিহার্য কর্তব্যের অন্তরভুক্ত। এখানে অংগীকার শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহর অংগীকার অর্থ হচ্ছে, তাঁর স্থায়ী ফরমান। এই ফরমানের দৃষ্টিতে বলা যায়, সমগ্র মানবজাতি একমাত্র তাঁরই বন্দেগী, আনুগত্য ও পূজা–উপাসনা করার জন্য আদিষ্ট ও নিযুক্ত হয়েছে। 'মজবুতভাবে অংগীকার করার পর' —কথাটি বলে আসলে হযরত আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির সময় সমগ্র মানবাত্মার নিকট থেকে এ ফরমানটির আনুগত্য করার যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সূরা আরাফ–এর ১৭২ আয়াতে এই অংগীকারের ওপর তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

৩২. অর্থাৎ যেসব সম্পর্ককে শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত করার ওপর মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কল্যাণ নির্ভর করে এবং আল্লাহ যেগুলোকে ত্রুটিমুক্ত রাখার হুকুম দিয়েছেন, তার ওপর এরা অস্ত্র চালায়। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটির মধ্যে রয়েছে অর্থের অশেষ ব্যাপকতা। ফলে দু'টি মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে যে মানবিক সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার বিশাল জগত তার সমগ্র অবয়বও এই অর্থের আওতাধীনে এসে যায়। সম্পর্ক কেটে ফেলার অর্থ নিছক মানবিক সম্পর্কচ্ছেদ নয় বরং সঠিক ও বৈধ সম্পর্ক ছাড়া অন্য যত প্রকারের সম্পর্ক কায়েম করা হবে তা সবই এর অন্তরভুক্ত হবে।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

তোমরা আল্লাহর সাথে কেমন করে কুফরীর আচরণ করতে পারো। অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। অতপর তিনি তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন এবং অতপর তিনি তোমাদের জীবন দান করবেন। তারপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করলেন। তারপর ওপরের দিকে লক্ষ করলেন এবং সাত আকাশ বিন্যস্ত করলেন[৩৪] *তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।*[৩৫]

কারণ অবৈধ ও ভুল সম্পর্কের পরিণতি এবং সম্পর্কচ্ছেদের পরিণতি একই। অর্থাৎ এর পরিণতিতে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হয় এবং নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হয় ধ্বংসের মুখোমুখি।

৩৩. এই তিনটি বাক্যের মধ্যে ফাসেকী ও ফাসেকের চেহারা পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্ক এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন বা বিকৃত করার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে বিপর্যয়। আর যে ব্যক্তি এ বিপর্যয় সৃষ্টি করে সেই হচ্ছে ফাসেক।

৩৪. সাত আকাশের তাৎপর্য কি? সাত আকাশ বলতে কি বুঝায়। এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়া কঠিন। মানুষ প্রতি যুগে আকাশ বা অন্য কথায় পৃথিবীর বাইরের জগত সম্পর্কে নিজের পর্যবেক্ষণ ও ধারণা–বিশ্লেষণ অনুযায়ী বিভিন্ন চিন্তা ও মতবাদের অনুসারী হয়েছে। এ চিন্তা ও মতবাদগুলো বিভিন্ন সময় বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। কাজেই এর মধ্য থেকে কোন একটি মতবাদ নির্দেশ করে তার ভিত্তিতে কুরআনের এই শব্দগুলোর অর্থ নির্ণয় করা ঠিক হবে না। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বুঝে নিতে হবে যে, সম্ভবত পৃথিবীর বাইরে যতগুলো জগত আছে সবগুলোকেই আল্লাহ সাতটি সুদৃঢ় স্তরে বিভক্ত করে রেখেছেন অথবা এই বিশ্ব–জাহানের যে স্তরে পৃথিবীর অবস্থিতি সেটি সাতটি স্তর সমন্বিত।

৩৫. এই বাক্যটিতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এক, যে আল্লাহ তোমাদের সমস্ত গতিবিধি ও কর্মকাণ্ডের খবর রাখেন এবং যার দৃষ্টি থেকে তোমাদের কোন গতিবিধিই গোপন থাকতে পারে না তাঁর মোকাবিলায় তোমরা কুফরী ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করার সাহস কর কেমন করে? দুই, যে আল্লাহ যাবতীয় সত্য

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾

৪ রুকূ'

আবার[৩৬] সেই সময়ের কথা একটু স্মরণ কর যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের[৩৭] বলেছিলেন, "আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা—প্রতিনিধি[৩৮] নিযুক্ত করতে চাই।" তারা বললো, "আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে নিযুক্ত করতে চান যে সেখানকার ব্যবস্থাপনাকে বিপর্যস্থ করবে এবং রক্তপাত করবে?[৩৯] আপনার প্রশংসা ও স্তুতিসহকারে তাসবীহ পাঠ এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা তো আমরা করেই যাচ্ছি।"[৪০] আল্লাহ বললেন, "আমি জানি যা তোমরা জানো না।"[৪১] অতপর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন[৪২] তারপর সেগুলো পেশ করলেন ফেরেশতাদের সামনে এবং বললেন, "যদি তোমাদের ধারণা সঠিক হয় (অর্থাৎ কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করলে ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হবে) তাহলে একটু বলতো দেখি এই জিনিসগুলোর নাম?"

জ্ঞানের অধিকারী, যিনি আসলে সমস্ত জ্ঞানের উৎস তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারে মাথা কুটে মরা ছাড়া তোমাদের আর কী লাভ হতে পারে! তিনি ছাড়া যখন জ্ঞানের আর কোন উৎস নেই, তোমাদের জীবনের পথ সুস্পষ্টভাবে দেখার জন্য যখন তাঁর কাছ থেকে ছাড়া আর কোথাও থেকে আলো পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তখন তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মধ্যে তোমরা নিজেদের জন্য এমন কি কল্যাণ দেখতে পেলে?

৩৬. ওপরের রুকূ'তে আল্লাহর বন্দেগী করার আহবান জানানো হয়েছিল। এ আহবানের ভিত্তিভূমি ছিল নিম্নরূপ ঃ আল্লাহ তোমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তাঁর হাতেই তোমাদের জীবন ও মৃত্যু। যে বিশ্ব–জগতে তোমরা বাস করছো তিনিই তার একচ্ছত্র অধিপতি ও সার্বভৌম শাসক। কাজেই তাঁর বন্দেগী ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি তোমাদের জন্য সঠিক নয়। এখন এই রুকূ'তে অন্য একটি ভিত্তিভূমির ওপর ঐ একই আহবান জানানো হয়েছে। অর্থাৎ এই দুনিয়ায় আল্লাহ তোমাদেরকে খলীফা পদে অভিষিক্ত করেছেন।

খলীফা হবার কারণে কেবল তাঁর বন্দেগী করলেই তোমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না বরং এই সংগে তাঁর পাঠানো হিদায়াত ও নির্দেশাবলী অনুযায়ী জীবন যাপনও করতে হবে। আর যদি তোমরা এমনটি না কর তোমাদের আদি শত্রু শয়তানের ইংগিতে চলতে থাকো, তাহলে তোমরা নিকৃষ্ট পর্যায়ের বিদ্রোহের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং এ জন্য তোমাদের চরম পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

এ প্রসঙ্গে মানুষের স্বরূপ ও বিশ্ব-জগতে তার মর্যাদা ও ভূমিকা যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মানবজাতির ইতিহাসের এমন অধ্যায়ও উপস্থাপন করা হয়েছে যে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোন মাধ্যম মানুষের করায়ত্ত নেই। এই অধ্যায়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লাভ করা হয়েছে তা প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যায়ে মাটির তলদেশ খুড়ে বিক্ষিপ্ত অস্থি ও কংকাল একত্র করে আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে সেগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে অনেক বেশী মূল্যবান।

৩৭. এখানে মূল আরবী শব্দ 'মালাইকা' হচ্ছে বহুবচন। একবচন 'মালাক।' মালাক-এর আসল মানে "বাণীবাহক।" এরি শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে 'যাকে পাঠানো হয়েছে' বা ফেরেশতা। ফেরেশতা নিছক কিছু কায়াহীন, অস্তিত্বহীন শক্তির নাম নয়। বরং এরা সুস্পষ্ট কায়া ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। আল্লাহ তার এই বিশাল সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় তাদের খেদমত নিয়ে থাকেন। তাদেরকে আল্লাহর বিশাল সাম্রাজ্যের কর্মচারী বলা যায়। আল্লাহর বিধান ও নির্দেশাবলী তারা প্রবর্তন করে থাকেন। মূর্খ লোকেরা ভুলক্রমে তাদেরকে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও কাজ-কারবারে অংশীদার মনে করে। কেউ কেউ তাদেরকে মনে করে আল্লাহর আত্মীয়। এ জন্য দেবতা বানিয়ে তাদের পূজা করে।

৩৮. যে ব্যক্তি কারো অধিকারের আওতাধীনে তারই অর্পিত ক্ষমতা-ইখতিয়ার ব্যবহার করে তাকে খলীফা বলে। খলীফা নিজে মালিক নয় বরং আসল মালিকের প্রতিনিধি। সে নিজে ক্ষমতার অধিকারী নয় বরং মালিক তাকে ক্ষমতার অধিকার দান করেছেন, তাই সে ক্ষমতা ব্যবহার করে। সে নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করার অধিকার রাখে না। বরং মালিকের ইচ্ছে পূরণ করাই হয় তার কাজ। যদি সে নিজেকে মালিক মনে করে বসে এবং তার ওপর অর্পিত ক্ষমতাকে নিজের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে থাকে অথবা আসল মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে নিয়ে তারই ইচ্ছে পূরণ করতে এবং তার নির্দেশ পালন করতে থাকে, তাহলে এগুলো সবই বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে গণ্য হবে।

৩৯. এটা ফেরেশতাদের আপত্তি ছিল না। বরং এটা ছিল তাদের জিজ্ঞাসা। আল্লাহর কোন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার অধিকারই ফেরেশতাদের ছিল না। 'খলীফা' শব্দটি থেকে তারা অবশ্যি এতটুকু বুঝতে পেরেছিল যে, পরিকল্পনায় উল্লেখিত সৃষ্টিজীবকে দুনিয়ায় কিছু ক্ষমতা-ইখতিয়ার দান করা হবে। তবে বিশ্ব-জাহানের এ বিশাল সাম্রাজ্য আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের আওতাধীনে কোন স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টজীব কিভাবে অবস্থান করতে পারে—একথা তারা বুঝতে পারছিল না। এই সাম্রাজ্যের কোন অংশে কাউকে যদি সামান্য কিছু স্বাধীন ক্ষমতা দান করা হয় তাহলে সেখানকার ব্যবস্থাপনা বিপর্যয়ের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে, একথা তারা বুঝতে চাইছিল।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۳۲﴾ قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿۳۳﴾

তারা বললো ঃ "ত্রুটিমুক্ত তো একমাত্র আপনারই সত্তা, আমরা তো মাত্র ততটুকু জ্ঞান রাখি যতটুকু আপনি আমাদের দিয়েছেন।[৪৩] প্রকৃতপক্ষে আপনি ছাড়া আর এমন কোন সত্তা নেই যিনি সবকিছু জানেন ও সবকিছু বোঝেন।" তখন আল্লাহ আদমকে বললেন, "তুমি ওদেরকে এই জিনিসগুলোর নাম বলে দাও।" যখন সে তাদেরকে সেসবের নাম জানিয়ে দিল[৪৪] তখন আল্লাহ বললেন ঃ "আমি না তোমাদের বলেছিলাম, আমি আকাশ ও পৃথিবীর এমন সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব জানি যা তোমাদের অগোচরে রয়ে গেছে ? যা কিছু তোমরা প্রকাশ করে থাকো তা আমি জানি এবং যা কিছু তোমরা গোপন করো তাও আমি জানি।"

৪০. এই বাক্যে ফেরেশতারা একথা বলতে চায়নি যে, খিলাফত তাদেরকে দেয়া হোক কারণ তারাই এর হকদার। বরং তাদের বক্তব্যের অর্থ ছিল ঃ হে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ! আপনার হুকুম পালন করা হচ্ছে। আপনার বিধান কার্যকর করার জন্য আমরা সর্বাত্মকভাবে তৎপর রয়েছি। আপনার মহান ইচ্ছা অনুযায়ী সমস্ত বিশ্ব-জাহানকে আমরা পাক পবিত্র করে রাখছি। আর এই সাথে আপনার প্রশংসাগীত গাওয়া ও স্তব-স্তুতি করা হচ্ছে। আমরা আপনার খাদেমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার তাসবীহ পড়ছি তাহলে এখন আর কিসের অভাব থেকে যায় ? একজন খলীফার প্রয়োজন দেখা দিল কেন ? এর কারণ আমরা বুঝতে পারছি না। (তাসবীহ শব্দটির দুই অর্থ হয়। এর একটি অর্থ যেমন পবিত্রতা বর্ণনা করা হয় তেমনি অন্য একটি অর্থ হয় তৎপরতার সাথে কাজ করা এবং মনোযোগ সহকারে প্রচেষ্টা চালানো। ঠিক এভাবেই তাকদীস শব্দটিরও দুই অর্থ হয়। এক, পবিত্রতার প্রকাশ ও বর্ণনা এবং দুই, পাক-পবিত্র করা।)

৪১. এটি হচ্ছে ফেরেশতাদের দ্বিতীয় সন্দেহের জবাব। বলা হয়েছে, খলীফা নিযুক্ত করার কারণ ও প্রয়োজন আমি জানি, তোমরা তা বুঝতে পারবে না। তোমরা নিজেদের যে সমস্ত কাজের কথা বলছো, সেগুলো যথেষ্ট নয়। বরং এর চাইতেও বেশী আরো কিছু আমি চাই। তাই পৃথিবীতে ক্ষমতা-ইখতিয়ার সম্পন্ন একটি জীব সৃষ্টি করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৪২. কোন বস্তুর নামের মাধ্যমে মানুষ তার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে থাকে, এটিই হয় মানুষের জ্ঞানলাভের পদ্ধতি। কাজেই মানুষের সমস্ত তথ্যজ্ঞান মূলত বস্তুর নামের সাথে

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۤ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

তারপর যখন ফেরেশতাদের হুকুম দিলাম, আদমের সামনে নত হও, তখন সবাই[৪৫] অবনত হলো, কিন্তু ইবলিস[৪৬] অস্বীকার করলো। সে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মেতে উঠলো এবং নাফরমানদের অন্তরভুক্ত হলো।[৪৭]

জড়িত। তাই আদমকে সমস্ত নাম শিখিয়ে দেয়ার মানেই ছিল তাঁকে সমস্ত বস্তুর জ্ঞান দান করা হয়েছিল।

৪৩. মনে হচ্ছে প্রত্যেকটি ফেরেশতার এবং ফেরেশতাদের প্রত্যেকটি শ্রেণীর জ্ঞান তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন বাতাসের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত আছেন যেসব ফেরেশতা তারা বাতাস সম্পর্কে সবকিছু জানেন কিন্তু পানি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। অন্যান্য বিভাগের ফেরেশতাদের অবস্থাও এমনি। এদের বিপরীত পক্ষে মানুষকে ব্যাপকতর জ্ঞান দান করা হয়েছে। এক একটি বিভাগ সম্পর্কে মানুষকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ফেরেশতাদের চাইতে তা কোন অংশে কম হলেও সামগ্রিকভাবে সমস্ত বিভাগের জ্ঞান মানুষকে যেভাবে দান করা হয়েছে তা ফেরেশতারা লাভ করতে পারেননি।

৪৪. এই মহড়াটি ছিল ফেরেশতাদের প্রথম সন্দেহের জবাব। এভাবে আল্লাহ যেন জানিয়ে দিলেন, আদমকে আমি কেবল স্বাধীন ক্ষমতা–ইখতিয়ার দিচ্ছি না বরং তাকে জ্ঞানও দিচ্ছি। তার নিয়োগে তোমরা যে বিপর্যয়ের আশংকা করছো, তা এ ব্যাপারটির একটি দিক মাত্র। এর মধ্যে কল্যাণের আর একটি দিকও আছে। বিপর্যয়ের দিকটির তুলনায় এই কল্যাণের গুরুত্ব ও মূল্য অনেক বেশী। ছোটখাট ক্ষতি ও অকল্যাণের জন্য বড় রকমের লাভ ও কল্যাণকে উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

৪৫. এর অর্থ হচ্ছে, পৃথিবী ও তার সাথে সম্পর্কিত মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্তরে যে পরিমাণ ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন তাদের সবাইকে মানুষের জন্য অনুগত ও বিজিত হয়ে যাবার হুকুম দেয়া হয়েছে। যেহেতু এই এলাকায় আল্লাহর হুকুমে মানুষকে তাঁর খলীফার পদে নিযুক্ত করা হচ্ছিল তাই ফরমান জারী হলো ঃ আমি মানুষকে যে ক্ষমতা–ইখতিয়ার দান করছি ভালো–মন্দ যে কোন কাজে মানুষ তা ব্যবহার করতে চাইলে এবং আমার বিশেষ ইচ্ছার অধীনে তাকে সেটি করার সুযোগ দেয়া হলে তোমাদের যার যার কর্মক্ষেত্রের সাথে ঐ কাজের সম্পর্ক থাকবে। তাদের নিজেদের ক্ষেত্রের পরিধি পর্যন্ত ঐ কাজে তার সাথে সহযোগিতা করা হবে তোমাদের ওপর ফরয। সে চুরি করতে বা নামায পড়তে চাইলে, ভালো কাজ বা মন্দ কাজ করার এরাদা করলে উভয় অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে তার পছন্দ অনুযায়ী কাজ করার অনুমতি দিতে থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত

তোমাদের দায়িত্ব হবে তার কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, কোন বাদশাহ যখন কোন ব্যক্তিকে নিজের রাজ্যের কোন প্রদেশের বা জেলার শাসক নিযুক্ত করেন তখন তার আনুগত্য করা সেই এলাকার সমস্ত সরকারী কর্মচীদের দায়িত্ব হয়ে পড়ে। তিনি কোন সঠিক বা বেঠিক কাজে তার ক্ষমতা ব্যবহার করুন না কেন যতদিন বাদশাহ চান ততদিন তাকে তার ক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে। তার সমস্ত কাজে সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সাহায্য করতে হবে। তবে বাদশাহর পক্ষ থেকে যখন যে কাজটি না করতে দেয়ার ইংগিত পাওয়া যাবে তখনই সেখানেই ঐ শাসকের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব খতম হয়ে যাবে। এ সময় তিনি অনুভব করতে থাকেন যেন চারদিকের সমস্ত কর্মচারী ও কর্মকর্তরা ধর্মঘট করেছে। এমন কি বাদশাহর পক্ষ থেকে যখন ঐ শাসককে বরখাস্ত ও গ্রেফতার করার ফরমান জারী হয় তখন কাল পর্যন্ত তার অধীনে যারা কাজ করছিল এবং তার আঙুলের ইশারায় যারা ওঠা–বসা করতো তারাই আজ তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে তাকে ফাসেক তথা বিদ্রোহীদের আবাসস্থলের দিকে নিয়ে যেতে একটুও দ্বিধা করে না। ফেরেশতাদেরকে আদমের সামনে সিজদানত হবার হুকুম দেয়া হয়েছিল। এর ধরনটা কিছুটা এই রকমেরই ছিল। হতে পারে কেবল বিজিত হয়ে যাওয়াকেই হয়তো বা সিজদা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। আবার অনুগত হয়ে যাওয়ার লক্ষণ হিসেবে তার বাহ্যিক প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এটাও সম্ভবপর। তবে এটাই বেশী সঠিক বলে মনে হয়।

৪৬. 'ইবলিস' শব্দের অর্থ হচ্ছে, "চরম হতাশ।" আর পারিভাষিক অর্থে এমন একটি জিনকে ইবলিস বলা হয় যে আল্লাহর হুকুমের নাফরমানি করে আদম ও আদম সন্তানদের অনুগত ও তাদের জন্য বিজিত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করার ও কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে ভুল পথে চলার প্রেরণা দান করার জন্য সে আল্লাহর কাছে সময় ও সুযোগ প্রার্থনা করেছিল। আসলে শয়তান ও ইবলিস নিছক কোন জড় শক্তি পিণ্ডের নাম নয়। বরং সেও মানুষের মতো একটি কায়া সম্পন্ন প্রাণীসত্তা। তা ছাড়া সে ফেরেশতাদের অন্তরভুক্ত ছিল, এ ভুল ধারণাও কারো না থাকা উচিত। কারণ পরবর্তী আলোচনাগুলোয় কুরআন নিজেই তার জিনদের অন্তরভুক্ত থাকার এবং ফেরেশতাদের থেকে আলাদা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য পরিবেশন করেছে।

৪৭. এই শব্দগুলো থেকে মনে হয় সম্ভবত শয়তান একা সিজদা করতে অস্বীকার করেনি। বরং তার সাথে জিনদের একটি দলই আল্লাহর নাফরমানি করতে প্রস্তুত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে একমাত্র শয়তানের নাম নেয়া হয়েছে তাদের নেতা হবার এবং বিদ্রোহের ক্ষেত্রে সবার চেয়ে বেশী অগ্রসর থাকার কারণে। কিন্তু এই আয়াতটির আর একটি অনুবাদও হতে পারে। সেটি হচ্ছে ঃ 'সে ছিল কাফেরদের অন্তরভুক্ত।' এ অবস্থায় এর অর্থ হবে ঃ পূর্ব থেকেই জিনদের মধ্যে একটি বিদ্রোহী ও নাফরমান দল ছিল এবং ইবলিস এই দলের অন্তরভুক্ত ছিল। কুরআনে সাধারণভাবে 'শায়াতীন' (শয়তানরা) শব্দটি এসব জিন ও তাদের বংশধরদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর কুরআনের যেখানে 'শায়াতীন' শব্দের অর্থ 'মানুষ' বুঝার জন্য কোন স্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণ নেই সেখানে এর অর্থ হবে জিন শয়তান।

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾

তখন আমরা আদমকে বললাম, "তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়েই জান্নাতে থাকো এবং এখানে স্বাচ্ছন্দের সাথে ইচ্ছেমতো খেতে থাকো, তবে এই গাছটির কাছে যেয়ো না।[৪৮] অন্যথায় তোমরা দু'জন যালেমদের[৪৯] অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।" শেষ পর্যন্ত শয়তান তাদেরকে সেই গাছটির লোভ দেখিয়ে আমার হুকুমের আনুগত্য থেকে সরিয়ে দিল এবং যে অবস্থার মধ্যে তারা ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে ছাড়লো। আমি আদেশ করলাম, "এখন তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু।[৫০] তোমাদের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করতে ও জীবন অতিবাহিত করতে হবে।"

৪৮. এ থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে অর্থাৎ নিজের কর্মস্থলে খলীফা নিযুক্ত করে পাঠাবার আগে মানসিক প্রবণতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে তাদের দু'জনকে পরীক্ষা করার জন্য জান্নাতে রাখা হয়। তাদেরকে এভাবে পরীক্ষা করার জন্য একটি গাছ বাছাই করা হয়। হুকুম দেয়া হয়, ঐ গাছটির কাছে যেয়ো না। গাছটির কাছে গেলে তার পরিণাম কি হবে তাও বলে দেয়া হয়। বলে দেয়া হয়, এমনটি করলে আমার দৃষ্টিতে তোমরা যালেম হিসেবে গণ্য হবে। সে গাছটি কি ছিল এবং তার মধ্যে এমন কি বিষয় ছিল যেজন্য তার কাছে যেতে নিষেধ করা হয়—এ বিতর্ক এখানে অবান্তর। নিষেধ করার কারণ এ ছিল না যে, গাছটি প্রকৃতিগতভাবে এমন কোন দোষদুষ্ট ছিল যার ফলে তার কাছে গেলে আদম ও হাওয়ার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল। আসল উদ্দেশ্য ছিল আদম ও হাওয়ার পরীক্ষা। শয়তানের প্রলোভনের মোকাবিলায় তারা আল্লাহর এই হুকুমটি কতটুকু মেনে চলে তা দেখা। এই উদ্দেশ্যে কোন একটি জিনিস নির্বাচন করাই যথেষ্ট ছিল। তাই আল্লাহ কেবল একটি গাছের নাম নিয়েছেন, তার প্রকৃতি সম্পর্কে কোন কথাই বলেননি।

এই পরীক্ষার জন্য জান্নাতই ছিল সবচেয়ে উপযোগী স্থান। আসলে জান্নাতকে পরীক্ষাগৃহ করার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, মানবিক মর্যাদার প্রেক্ষিতে তোমাদের জন্য জান্নাতই উপযোগী স্থান। কিন্তু শয়তানের প্রলোভনে পড়ে যদি তোমরা আল্লাহর নাফরমানির পথে এগিয়ে যেতে থাকো তাহলে যেভাবে শুরুতে তোমরা এ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলে তেমনি শেষেও বঞ্চিত হবে। তোমাদের উপযোগী এই আবাসস্থলটি এবং এই হারানো ফিরদৌসটি লাভ করতে হলে তোমাদের অবশ্যি নিজেদের

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾

তখন আদম তার রবের কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তাওবা করলো।[৫১] *তার রব তার এই তাওবা কবুল করে নিলেন। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।*[৫২]

সেই দুশমনের সফল মোকাবিলা করতে হবে, যে তোমাদেরকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

৪৯. যালেম শব্দটি গভীর অর্থবোধক। 'যুলুম' বলা হয় অধিকার হরণকে। যে ব্যক্তি কারো অধিকার হরণ করে সে যালেম। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম পালন করে না, তাঁর নাফরমানি করে সে আসলে তিনটি বড় বড় মৌলিক অধিকার হরণ করে। প্রথমত সে আল্লাহর অধিকার হরণ করে। কারণ আল্লাহর হুকুম পালন করতে হবে, এটা আল্লাহর অধিকার। দ্বিতীয়ত এই নাফরমানি করতে গিয়ে সে যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করে তাদের সবার অধিকার সে হরণ করে তার দেহের অংগ–প্রত্যংগ, স্নায়ু মণ্ডলী, তার সাথে বসবাসকারী সমাজের অন্যান্য লোক, তার ইচ্ছা ও সংকল্প পূর্ণ করার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাগণ এবং যে জিনিসগুলো সে তার কাজে ব্যবহার করে—এদের সবার তার ওপর অধিকার ছিল, এদেরকে কেবলমাত্র এদের মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু যখন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে তাদের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ব্যবহার করে তখন সে আসলে তাদের ওপর যুলুম করে। তৃতীয়ত তার নিজের অধিকার হরণ করে। কারণ তার ওপর তার আপন সত্তাকে ধ্বংস থেকে বাঁচবার অধিকার আছে। কিন্তু নাফরমানি করে যখন সে নিজেকে আল্লাহর শাস্তিলাভের অধিকারী করে তখন সে আসলে নিজের ব্যক্তি সত্তার ওপর যুলুম করে। এসব কারণে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'গোনাহ' শব্দটির জন্য যুলুম এবং 'গোনাহগার' শব্দটির জন্য যালেম পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

৫০. অর্থাৎ মানুষের শত্রু শয়তান এবং শয়তানের শত্রু মানুষ। শয়তান মানুষের শত্রু, একথা তো সুস্পষ্ট। কারণ সে মানুষকে আল্লাহর হুকুম পালনের পথ থেকে সরিয়ে রাখার এবং ধ্বংসের পথে পরিচালনা করার চেষ্টা করে। কিন্তু শয়তানের শত্রু মানুষ, একথার অর্থ কি? আসলে শয়তানের প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করাই তো মানবতার দাবী। কিন্তু প্রবৃত্তির কামনা–বাসনার সামনে সে যে সমস্ত প্রলোভন এনে হাযির করে মানুষ সেগুলোর দ্বারা প্রতারিত হয়ে তাকে নিজের বন্ধু ভেবে বসে। এই ধরনের বন্ধুত্বের অর্থ এ নয় যে, প্রকৃতপক্ষে শত্রুতা বন্ধুত্বে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এক শত্রু আর এক শত্রুর হাতে পরাজিত হয়েছে এবং তার জালে ফেঁসে গেছে।

৫১. অর্থাৎ আদম (আ) যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, তিনি আল্লাহর নাফরমানির পথ পরিহার করে তাঁর হুকুম মেনে চলার পথ অবলম্বন করতে চাইলেন এবং তাঁর মনে যখন নিজের রবের কাছে নিজের গোনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার আকাংখা জাগলো তখন ক্ষমা প্রার্থনা করার ভাষা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁর অবস্থা দেখে আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনার ভাষা তাঁকে শিখিয়ে দিলেন।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾

আমরা বললাম, "তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও।[৫৩] *এরপর যখন আমার পক্ষ থেকে কোন হিদায়াত তোমাদের কাছে পৌঁছুবে তখন যারা আমার সেই হিদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের জন্য থাকবে না কোন ভয় দুঃখ বেদনা।*

তাওবার আসল অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা। বান্দার পক্ষ থেকে তাওবার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে সীমালংঘন ও বিদ্রোহের পথ পরিহার করে বন্দেগীর পথে পা বাড়িয়েছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওবা করার অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজের লজ্জিত ও অনুতপ্ত দাসের প্রতি অনুগ্রহ সহকারে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং বান্দার প্রতি তাঁর দান পুনর্বার বর্ষিত হতে শুরু করেছে।

৫২. গোনাহের ফল অনিবার্য এবং মানুষকে অবশ্যি তা ভোগ করতে হবে, কুরআন এ মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এটা মানুষের মনগড়া ভুল মতবাদগুলোর মধ্যে একটি বড়ই বিভ্রান্তিকর মতবাদ। কারণ যে ব্যক্তি একবার গোনাহে লিপ্ত হয়েছে এই মতবাদ তাকে চিরকালের জন্য হতাশার সাগরে নিক্ষেপ করে। একবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে ঐ ব্যক্তি যদি তার অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় এবং ভবিষ্যতে সৎ-সুন্দর জীবন যাপন করতে আগ্রহী হয়, তাহলে এই মতবাদ তাকে বলে তোমার বাঁচার কোন আশা নেই, যা কিছু তুমি করে এসেছো তার ফল অবশ্যি তোমাকে ভোগ করতে হবে। এর বিপরীত পক্ষে কুরআন বলে, সৎকাজের পুরস্কার ও অসৎকাজের শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। তোমরা যে সৎকাজের পুরস্কার পাও সেটা তোমাদের সৎকাজের স্বাভাবিক ফল নয়। সেটা আল্লাহর দান। তিনি চাইলে দান করতে পারেন, চাইলে নাও করতে পারেন। অনুরূপভাবে তোমরা যে অসৎকাজের শাস্তি লাভ করো সেটা তোমাদের অসৎকাজের অনিবার্য ফল নয়। বরং এ ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমতা ও ইখতিয়ার রয়েছে, তিনি চাইলে ক্ষমা করতে এবং চাইলে শাস্তি দিতে পারেন। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত তাঁর জ্ঞানের সাথে গভীর সূত্রে আবদ্ধ। তিনি জ্ঞানী হবার কারণে তাঁর ক্ষমতা কর্তৃত্ব অন্ধের মতো ব্যবহার করেন না। কোন সৎকাজের পুরস্কার দেয়ার সময় বান্দা আন্তরিকতা সহকারে, সাচ্চা নিয়তে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই সৎকাজটি করেছে, এ দিকটি বিবেচনা করেই তিনি তাকে পুরস্কৃত করেন। আর কোন সৎকাজকে প্রত্যাখ্যান করলে এই উদ্দেশ্যে করেন যে, তার বাইরের রূপটি ছিল ঠিক সৎকাজের মতোই কিন্তু তার ভেতরে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নির্ভেজাল প্রেরণা ও ভাবধারা কার্যকর ছিল না। অনুরূপভাবে বিদ্রোহাত্মক ধৃষ্টতা সহকারে কোন অসৎকাজ করা হলে তার পেছনে যদি লজ্জার মনোভাবের পরিবর্তে আরো বেশী অপরাধ করার প্রবণতা সক্রিয় থাকে তাহলে এ ধরনের অপরাধের তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন। আর যে অসৎকাজ করার পর বান্দা লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতে নিজের সংশোধন প্রয়াসী হয় এই ধরনের অসৎকাজে ত্রুটি তিনি নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেন। মারাত্মক ধরনের অপরাধী কট্টর কাফেরের জন্যও আল্লাহর

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٣٩

আর যারা একে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে এবং আমার আয়াতকে[৫৪] মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে তারা হবে আগুনের মধ্যে প্রবেশকারী। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।[৫৫]

দরবার থেকে নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, সে যদি তার অপরাধ স্বীকার করে, নিজের নাফরমানির জন্য লজ্জিত হয় এবং বিদ্রোহের মনোভাব ত্যাগ করে আনুগত্যের পথে এগিয়ে চলতে প্রস্তুত হয়, তাহলে আল্লাহ তার গোনাহ ও ত্রুটি মাফ করে দেবেন।

৫৩. এই বাক্যটির পুনরাবৃত্তি তাৎপর্যপূর্ণ। আগের বাক্যে বলা হয়েছে আদম তাওবা করলেন এবং আল্লাহ তা কবুল করে নিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়ালো, আদম তাঁর নাফরমানির জন্য আযাবের হকদার হলেন না। গোনাহগারীর যে দাগ তাঁর গায়ে লেগেছিল তা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। না এ দাগের কোন চিহ্ন তাঁর বা তাঁর বংশধরদের গায়ে রইলো, ফলে আর না এ প্রয়োজন হলো যে, আল্লাহর—একমাত্র পুত্রকে (মায়াযাল্লাহ) (নাউযুবিল্লাহ) বনী আদমের গোনাহর কাফফারাহ আদায় করার জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়ে শূলে চড়াতে হলো। বিপরীত পক্ষে মহান আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামের কেবল তাওবাই কবুল করে ক্ষান্ত হননি এবং এরপর আবার তাঁকে নবুওয়াতও দান করলেন। এভাবে তিনি নিজের বংশধরদেরকে সত্য–সহজ পথ দেখিয়ে গেলেন।

এখানে আবার জান্নাত থেকে বের করে দেয়ার হুকুমের পুনরাবৃত্তি করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, আদমকে পৃথিবীতে না নামিয়ে জান্নাতে রেখে দেয়া তাওবা কবুলিয়াতের অপরিহার্য দাবী ছিল না। পৃথিবী তাঁর জন্য দারুল আযাব বা শস্তির আবাস ছিল না। শাস্তি দেয়ার জন্য তাঁকে এখানে পাঠানো হয়নি। বরং তাঁকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। জান্নাত তাঁর আসল কর্মস্থল ছিল না। সেখান থেকে বের করে দেয়ার হুকুম তাঁকে শাস্তি দেয়ার পর্যায়ভুক্ত ছিল না। তাঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়াটাই ছিল মূল পরিকল্পনার অন্তরভুক্ত। তবে এর আগে ৪৮নং টীকায় যে পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই পরীক্ষার জন্যই তাকে জান্নাতে রাখা হয়েছিল

৫৪. আরবীতে আয়াতের আসল মানে হচ্ছে নিশানী বা আলামত। এই নিশানী কোন জিনিসের পক্ষ থেকে পথনির্দেশ দেয়। কুরআনে এই শব্দটি চারটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও এর অর্থ হয়েছে নিছক আলামত বা নিশানী। কোথাও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনসমূহকে বলা হয়েছে আল্লাহর আয়াত। কারণ এই বিশ্ব–জাহানের অসীম ক্ষমতাধর আল্লাহর সৃষ্ট প্রতিটি বস্তুই তার বাহ্যিক কাঠামোর অভ্যন্তরে নিহিত সত্যের প্রতি ইংগিত করছে। কোথাও নবী–রসূলগণ যেসব 'মু'জিযা' (অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম) দেখিয়েছেন সেগুলোকে বলা হয়েছে আল্লাহর আয়াত। কারণ এ নবী–রসূলগণ যে

يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّٰىَ فَٱرْهَبُونِ ﴿٤٠﴾

৫ রুকূ'

হে বনী ইসরাঈল![৫৬] আমার সেই নিয়ামতের কথা মনে করো, যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম, আমার সাথে তোমাদের যে অংগীকার ছিল, তা পূর্ণ করো, তা হলে তোমাদের সাথে আমার যে অংগীকার ছিল, তা আমি পূর্ণ করবো এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো।

এ বিশ্ব–জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভুর প্রতিনিধি এই মু'জিযাগুলো ছিল আসলে তারই প্রমাণ ও আলামত। কোথাও কুরআনের বাক্যগুলোকে আয়াত বলা হয়েছে। কারণ এ বাক্যগুলো কেবল সত্যের দিকে পরিচালিত করেই ক্ষান্ত নয় বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কোন কিতাবই এসেছে, তার কেবল বিষয়বস্তুই নয়, শব্দ, বর্ণনাভংগী ও বাক্য গঠনরীতির মধ্যেও এই গ্রন্থের মহান মহিমান্বিত রচয়িতার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে। কোথায় 'আয়াত' শব্দটির কোন্ অর্থ গ্রহণ করতে হবে তা বাক্যের পূর্বাপর আলোচনা থেকে সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

৫৫. এটা হচ্ছে সৃষ্টির প্রথম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য আল্লাহর স্থায়ী ফরমান। তৃতীয় রুকূ'তে এটিকেই আল্লাহর 'অংগীকার' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিজেই নিজের পথ তৈরি করে নেয়া মানুষের কাজ নয়। বরং একদিকে বান্দা এবং অন্যদিকে খলীফার দ্বিবিধ ভূমিকা পালনের লক্ষে তার রব–নির্ধারিত পথের অনুসরণ করার জন্যই সে নিযুক্ত হয়েছে। দু'টো উপায়ে এ পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এক, কোন মানুষের কাছে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী আসতে পারে। দুই, অথবা যে মানুষটির কাছে অহী এসেছে, তার অনুসরণ করা যেতে পারে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের তৃতীয় কোন পথ নেই। এ দু'টি পথ ছাড়া বাদবাকি সমস্ত পথই মিথ্যা ও ভুল। শুধু ভুলই নয়, প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের পথও। আর এর শাস্তি জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

কুরআন মজীদের সাতটি জায়গায় আদমের জন্ম ও মানব জাতির সূচনা কালের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। এ সাতটি জায়গার মধ্যে এটিই হচ্ছে প্রথম এবং আর ছয়টি জায়গা হচ্ছে ঃ সূরা আল আ'রাফ ২য় রুকূ', আল হিজর ৩য় রুকূ', বনী ইসরাঈল ৭ম রুকূ', আল কাহাফ ৭ম রুকূ', তা–হা ৭ম রুকূ' এবং সা'দ ৫ম রুকূ'। বাইবেলের জন্ম অধ্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদেও এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বাইবেল ও কুরআন উভয়ের বর্ণনার তুলনা করার পর একজন বিবেকবান ও সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নিজেই উভয় কিতাবের পার্থক্য অনুধাবন করতে পারবেন।

আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টিকালীন আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যকার কথাবার্তার বর্ণনা তালমূদেও উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআন বর্ণিত কাহিনীতে যে গভীর অন্তরনিহিত প্রাণসত্তার সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে তা অনুপস্থিত। বরং সেখানে কিছু রসাত্মক

আলাপও পাওয়া যায়। যেমন, ফেরেশতারা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হচ্ছে?' জবাবে আল্লাহ বললেন, 'এ জন্য যে, তাদের মধ্যে সৎলোক জন্ম নেবে।' অসৎলোকদের কথা আল্লাহ বললেন না। অন্যথায় ফেরেশতারা মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনার পক্ষে অনুমোদন দিতেন না। [Talmudic Miscellany, Paul Issac Herson, London 1880, P. 294-95]

৫৬. 'ইসরাঈল' শব্দের অর্থ হচ্ছে আবদুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা। এটি হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালামের উপাধি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি এ উপাধিটি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের পুত্র ও ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রপুত্র। তাঁরই বংশধরকে বলা হয় বনী ইসরাঈল। আগের চারটি রুকূ'তে যে ভাষণ পেশ করা হয়েছে তা একটি ভূমিকামূলক ভাষণ। এই ভাষণে সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এখন এই পঞ্চম রুকূ' থেকে চৌদ্দ রুকূ' পর্যন্ত যে ভাষণ চলছে, এটি একটি ধারাবাহিক ভাষণ। এই ভাষণে মূলত বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করা হয়েছে। তবে মাঝে মধ্যে কোথাও কোথাও খৃস্টান ও আরবের মুশ্‌রিকদের দিকে লক্ষ করেও কথা বলা হয়েছে। আবার সুবিধেমতো কোথাও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যারা ইসলামের ওপর ঈমান এনেছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। এ ভাষণটি পড়ার সময় নিম্নোক্ত কথাগুলো বিশেষভাবে সামনে রাখতে হবে ঃ

এক ঃ পূর্ববর্তী নবীদের উম্মাতের মধ্যে এখনো কিছু সংখ্যক সত্যনিষ্ঠ এবং সৎবৃত্তি ও সদিচ্ছাসম্পন্ন লোক রয়ে গেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সত্যের আহবায়ক এবং যে আন্দোলনের মহানায়ক করে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার এবং তাঁর আন্দোলনে শরীক হবার জন্য আহবান জানানোই এ ভাষণের উদ্দেশ্য। তাই তাদের বলা হচ্ছে, ইতিপূর্বে তোমাদের নবীগণ এবং তোমাদের কাছে আগত সহীফাগুলো যে দাওয়াত ও আন্দোলন নিয়ে বার বার এসেছিল এই কুরআন ও এই নবী সেই একই দাওয়াত ও আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। প্রথমে এটি তোমাদেরকেই দেয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা নিজেরা এ পথে চলবে এবং অন্যদেরকেও এদিকে আহবান জানাবে এবং এ পথে চালাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু অন্যদেরকে পথ দেখানো তো দূরের কথা তোমরা নিজেরাই সে পথে চলছো না। তোমরা বিকৃতির পথেই এগিয়ে চলছো। তোমাদের ইতিহাস এবং তোমাদের জাতির বর্তমান নৈতিক ও দীনি অবস্থাই তোমাদের বিকৃতির সাক্ষ দিয়ে চলছে। এখন আল্লাহ সেই একই জিনিস দিয়ে তাঁর এক বান্দাকে পাঠিয়েছেন এটি কোন নতুন ও অজানা জিনিস নয়। তোমাদের নিজেদের জিনিস। কাজেই জেনে–বুঝে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করো না। বরং তাকে মেনে নাও। যে কাজ তোমাদের করার ছিল কিন্তু তোমরা করোনি। সেই কাজ আজ অন্যেরা করার জন্য এগিয়ে এসেছে। তোমরা তাদের সাথে সহযোগিতা করো।

দুই ঃ সাধারণ ইহুদিদের কাছে চূড়ান্ত কথা বলে দেয়া এবং তাদের দীনি ও নৈতিক অবস্থাকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য। তোমাদের নবীগণ যে দীনের পতাকাবাহী ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে দীনেরই দাওয়াত দিচ্ছেন—একথাটিই তাদের সামনে প্রমাণ করা হয়েছে। দীনের মূলনীতির মধ্যে এমন

একটি বিষয়ও নেই যেখানে কুরআনের শিক্ষা তাওরাতের শিক্ষা থেকে আলাদা—একথাই তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তাদের সামনে একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, তোমাদের যে বিধান দান করা হয়েছিল তার আনুগত্য করার এবং নেতৃত্বের যে দায়িত্ব তোমাদেরকে ওপর অর্পণ করা হয়েছিল তার হক আদায় করার ব্যাপারে তোমরা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছো। এমন সব ঘটনাবলী থেকে এর সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যার প্রতিবাদ করা তাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। আবার সত্যকে জানার পরও যেভাবে তারা তার বিরোধিতায় চক্রান্ত, বিভ্রান্তি সৃষ্টি, হঠধর্মিতা, কূটতর্ক ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছিল এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনকে সফলকাম হতে না দেয়ার জন্য যেমন পদ্ধতি অবলম্বন করছিল তা সবই ফাঁস করে দেয়া হয়েছে। এ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাদের বাহ্যিক ধার্মিকতা নিছক একটি ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে বিশ্বস্ততা ও সত্যনিষ্ঠার পরিবর্তে হঠধর্মিতা, অজ্ঞতা ও মূর্খতাপ্রসূত বিদ্বেষ ও স্বার্থান্ধতা। আসলে সৎকর্মশীলতার কোন কাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধি তারা চায় না। এভাবে চূড়ান্ত কথা বলে দেয়ায় যে সুফল হয়েছে তা হচ্ছে এই যে একদিকে ঐ জাতির মধ্যে যেসব সৎলোক ছিল তাদের চোখ খুলে গেছে এবং অন্যদিকে মদীনার জনগণের বিশেষ করে আরবদেশের মুশরিকদের ওপর তাদের যে ধর্মীয় ও নৈতিক প্রভাব ছিল, তা খতম হয়ে গেছে। তৃতীয়ত নিজেদের আবরণহীন চেহারা দেখে তারা নিজেরাই হিম্মতহারা হয়ে পড়েছে। ফলে নিজের সত্যপন্থী হবার ব্যাপারে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ রূপে নিশ্চিত সে যেমন সৎসাহস ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলায় এগিয়ে আসে তেমনটি করা তাদের পক্ষে কোনদিন সম্ভব হয়নি।

তিন ঃ আগের চারটি রুকূ'তে সমগ্র মানবজাতিকে সাধারণভাবে দাওয়াত দিয়ে যেসব কথা বলা হয়েছিল সে একই প্রসংগে যে জাতি আল্লাহ প্রেরিত বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তেমনি একটি বিশেষ জাতির বিশেষ দৃষ্টান্ত দিয়ে তার পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে বক্তব্য সুস্পষ্ট করার জন্য বনী ইসরাঈলকে বাছাই করার একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। পৃথিবীর অসংখ্য জাতিদের মধ্যে বর্তমান বিশ্বে একমাত্র বনী ইসরাঈলই ক্রমাগত চার হাজার বছর থেকে সমগ্র মানবজাতির সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে বেঁচে আছে। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করার পথে কোন জাতির জীবনে যত চড়াই উতরাই আসতে পারে তার সবগুলোরই সন্ধান পাই আমরা এ জাতিটির মর্মান্তিক ইতিকথায়।

চার ঃ মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের শিক্ষা দেয়াই এর উদ্দেশ্য। পূর্ববর্তী নবীদের উম্মাতরা অধপতনের যে গভীর গর্তে পড়ে গিয়েছিল তা থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে রক্ষা করাই এর লক্ষ। ইহুদিদের নৈতিক দুর্বলতা, ধর্মীয় বিভ্রান্তি এবং বিশ্বাস ও কর্মের গলদগুলোর মধ্য থেকে প্রতিটির দিকে অংগুলি নির্দেশ করে তার মোকাবিলায় আল্লাহর সত্য দীনের দাবীসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে মুসলমানরা পরিষ্কারভাবে নিজেদের পথ দেখে নিতে পারবে এবং ভুল পথ থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হবে। এ প্রসংগে ইহুদি ও খৃষ্টানদের সমালোচনা করে কুরআন যা কিছু বলেছে সেগুলো পড়ার সময় মুসলমানদের অবশ্যি নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বিখ্যাত হাদীস মনে রাখা উচিত। হাদীসটিতে তিনি বলেছেন ঃ তোমরাও অবশেষে পূর্ববর্তী উম্মাতদের কর্মনীতির অনুসরণ করবেই। এমন কি তারা যদি কোন গো-সাপের গর্তে

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِیْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۡ وَّاِيَّایَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

আর আমি যে কিতাব পাঠিয়েছি তার ওপর ঈমান আন। তোমাদের কাছে আগে থেকেই যে কিতাব ছিল এটি তার সত্যতা সমর্থনকারী। কাজেই সবার আগে তোমরাই এর অস্বীকারকারী হয়ো না। সামান্য দামে আমার আয়াত বিক্রি করো না।[৫৭] আমার গযব থেকে আত্মরক্ষা করো। মিথ্যার রঙে রাঙিয়ে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করো না এবং জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করো না।[৫৮]

ঢুকে থাকে, তাহলে তোমরাও তার মধ্যে ঢুকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল। আপনি কি ইহুদি ও খৃস্টানদের কথা বলছেন? জবাব দিলেন, তাছাড়া আর কি? নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটি কেবলমাত্র একটি ভীতি প্রদর্শনই ছিল না বরং আল্লাহ প্রদত্ত গভীর অন্তরদৃষ্টির মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছিলেন, বিভিন্ন নবীর উম্মাতের মধ্যে বিকৃতি এসেছিল কোন্ কোন্ পথে এবং কোন্ আকৃতিতে তার প্রকাশ ঘটেছিল।

৫৭. 'সামান্য দাম' বলে দুনিয়ার স্বার্থ ও লাভের কথা বুঝানো হয়েছে। এর বিনিময়ে মানুষ আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করছিল। সত্যকে বিক্রি করে তার বিনিময়ে সারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ হাসিল করলেও তা আসলে সামান্য দামই গণ্য হবে। কারণ সত্য নিসন্দেহে তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।

৫৮. এ আয়াতটির অর্থ বুঝার জন্য সমকালীন আরবের শিক্ষাগত অবস্থাটা সামনে থাকা দরকার। আরববাসীরা সাধারণভাবে ছিল অশিক্ষিত। তাদের তুলনায় ইহুদিদের মধ্যে এমনিতেই শিক্ষার চর্চা ছিল অনেক বেশী। তাছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইহুদিদের মধ্যে এমন অনেক বড় বড় আলেম ছিলেন যাদের খ্যাতি আরবের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্ব পর্যায়েও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই আরবদের ওপর ইহুদিদের 'জ্ঞানগত' প্রতিপত্তি ছিল অনেক বেশী। এর ওপর ছিল আবার তাদের উলামা ও মাশায়েখের ধর্মীয় দরবারের বাহ্যিক শান-শওকত। এসব জাঁকালো দরবারে বসে তারা ঝাড়-ফুঁক, দোয়া-তাবিজ ইত্যাদির কারবার চালিয়েও জনগণের ওপর নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি গভীরতর ও ব্যাপকতর করেছিলেন। বিশেষ করে মদীনাবাসীদের ওপর তাদের প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। কারণ তাদের আশেপাশে ছিল বড় বড় ইহুদি গোত্রের আবাস। ইহুদিদের সাথে তাদের রাতদিন ওঠাবসা ও মেলামেশা চলতো। একটি অশিক্ষিত জনবসতি যেমন তার চাইতে বেশী শিক্ষিত, বেশী সংস্কৃতিবান ও বেশী সুস্পষ্ট ধর্মীয় গুণাবলীর অধিকারী প্রতিবেশীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, এই মেলামেশায় মদীনাবাসীরাও ঠিক তেমনি ইহুদিদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল। এ অবস্থায় নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজেকে নবী হিসেবে পেশ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾

নামায কায়েম করো, যাকাত দাও[৫৯] এবং যারা আমার সামনে অবনত হচ্ছে তাদের সাথে তোমরাও অবনত হও। তোমরা অন্যদের সৎকর্মশীলতার পথ অবলম্বন করতে বলো কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাকো। তোমরা কি জ্ঞান বুদ্ধি একটুও কাজে লাগাও না? সবর ও নামায সহকারে সাহায্য নাও।[৬০] নিসন্দেহে নামায বড়ই কঠিন কাজ, কিন্তু সেসব অনুগত বান্দাদের জন্য কঠিন নয় যারা মনে করে, সবশেষে তাদের মিলতে হবে তাদের রবের সাথে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।[৬১]

করলেন এবং লোকদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে থাকলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই অশিক্ষিত আরবরা আহলে কিতাব ইহুদিদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতো, "আপনারাও তো একজন নবীর অনুসারী এবং একটি আসমানী কিতাব মেনে চলেন, আপনারাই বলুন, আমাদের মধ্যে এই যে ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করছেন তাঁর এবং তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি?" মক্কার লোকেরাও ইতিপূর্বে ইহুদিদের কাছে এ প্রশ্নটি বার বার করেছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার পর এখানেও বহু লোক ইহুদি আলেমদের কাছে গিয়ে একথা জিজ্ঞেস করতো। কিন্তু ইহুদি আলেমরা কখনো এর জবাবে সত্য কথা বলেনি। ডাহা মিথ্যা কথা বলা তাদের জন্য কঠিন ছিল। যেমন, মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাওহীদ পেশ করছেন তা মিথ্যা। অথবা আম্বিয়া, আসমানী গ্রন্থসমূহ, ফেরেশতা ও আখেরাত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সঠিক নয়। অথবা তিনি যে নৈতিক মূলনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন তার মধ্যে কোন গলদ রয়ে গেছে। তবে যা কিছু তিনি পেশ করছেন তা সঠিক ও নির্ভুল—এ ধরনের স্পষ্ট ভাষায় সত্যের স্বীকৃতি দিতেও তারা প্রস্তুত ছিল না তারা প্রকাশ্যে সত্যের প্রতিবাদ করতে পারছিল না আবার সোজাসুজি তাকে সত্য বলে মেনে নিতেও প্রস্তুত ছিল না। এ দু'টি পথের মাঝখানে তারা তৃতীয় একটি পথ অবলম্বন করলো। প্রত্যেক প্রশ্নকারীর মনে তারা নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর জামায়াত ও তাঁর মিশনের বিরুদ্ধে কোন না কোন অসঅসা–প্ররোচনা দিয়ে দিত। তাঁর বিরুদ্ধে কোন না কোন অভিযোগ আনতো, এমন

يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৬ রুকূ'

হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের দান করেছিলাম এবং একথাটিও যে, আমি দুনিয়ার সমস্ত জাতিদের ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।[৬২] *আর ভয় করো সেই দিনকে যেদিন কেউ কারো সামান্যতমও কাজে লাগবে না, কারো পক্ষ থেকে সুপারিশ গৃহীত হবে না, বিনিময় নিয়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না এবং অপরাধীরা কোথাও থেকে সাহায্য লাভ করতে পারবে না।*[৬৩]

কোন ইংগিতপূর্ণ কথা বলতো যার ফলে লোকেরা সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে পড়ে যেতো। এভাবে তারা মানুষের মনে সন্দেহ ও সংশয়ের বীজ বপন করে তাদেরকে তার বেড়াজালে আটকে রাখতে এবং তাদের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদেরকেও আটকাতে চাইতো। তাদের এ দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতির কারণে তাদেরকে বলা হচ্ছে ঃ সত্যের গায়ে মিথ্যার আবরণ চড়িয়ে দিয়ো না। নিজেদের মিথ্যা প্রচারণা এবং শয়তানী সন্দেহ-সংশয় আপত্তির সাহায্যে সত্যকে দাবিয়ে ও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করো না। সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে দুনিয়াবাসীকে প্রতারিত করো না।

৫৯. নামায ও যাকাত প্রতি যুগে দীন ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। অন্যান্য সব নবীদের মতো বনী ইসরাঈলদের নবীরাও এর প্রতি কঠোর তাগিদ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইহুদিরা এ ব্যাপারে গাফেল হয়ে পড়েছিল। তাদের সমাজে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থাপনা প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছেল। বেশীর ভাগ লোক ব্যক্তিগত পর্যায়েও নামায ছেড়ে দিয়েছিল। আর যাকাত দেয়ার পরিবর্তে তারা সুদ খেতো।

৬০. অর্থাৎ যদি সৎকর্মশীলতার পথে চলা তোমরা কঠিন মনে করে থাকো তাহলে সবর ও নামায এই কাঠিন্য দূর করতে পারে। এদের সহায্যে শক্তি সঞ্চয় করলে এ কঠিন পথ পাড়ি দেয়া তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

সবর শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বাধা দেয়া, বিরত রাখা ও বেঁধে রাখা। এ ক্ষেত্রে মজবুত ইচ্ছা, অবিচল সংকল্প ও প্রবৃত্তির আশা-আকাংখাকে এমনভাবে শৃংখলাবদ্ধ করা বুঝায়, যার ফলে এক ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়না ও বাইরের সমস্যাবলীর মোকাবিলায় নিজের হৃদয় ও বিবেকের পছন্দনীয় পথে অনবরত এগিয়ে যেতে থাকে। এখানে আল্লাহর এ

وَإِذْ نَجَّيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾

স্মরণ করো সেই সময়ের কথা[৬৪] যখন আমরা ফেরাউনী দলের[৬৫] দাসত্ব থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম। তারা তোমাদের কঠিন যন্ত্রণায় নিমজ্জিত করে রেখেছিল, তোমাদের পুত্র সন্তানদের যবেহ করতো এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদের জীবিত রেখে দিতো। মূলত এ অবস্থায় তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য বড় কঠিন পরীক্ষা ছিল।[৬৬]

স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা সাগর চিরে তোমাদের জন্য পথ করে দিয়েছিলাম, তারপর তার মধ্য দিয়ে তোমাদের নির্বিঘ্নে পার করে দিয়েছিলাম, আবার সেখানে তোমাদের চোখের সামনেই ফেরাউনী দলকে সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই নৈতিক গুণটিকে নিজের মধ্যে লালন করা এবং বাইর থেকে একে শক্তিশালী করার জন্য নিয়মিত নামায পড়া।

৬১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত নয় এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তার জন্য নিয়মিত নামায পড়া একটি আপদের শামিল। এ ধরনের আপদে সে কখনো নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সোপর্দ করেছে এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর তার মহান প্রভুর সামনে হাযির হবার কথা চিন্তা করে, তার জন্য নামায পড়া নয়, নামায ত্যাগ করাই কঠিন।

৬২. এখানে সেই যুগের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যখন দুনিয়ার সকল জাতির মধ্যে একমাত্র বনী ইসরাঈলের কাছে আল্লাহ প্রদত্ত সত্যজ্ঞান ছিল এবং তাদেরকে বিশ্বের জাতিসমূহের নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। অন্যান্য জাতিদেরকে আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বের পথে আহবান করাই ছিল তার দায়িত্ব।

৬৩. বনী ইসরাঈলদের আখেরাত সম্পর্কিত আকীদার মধ্যে গলদের অনুপ্রবেশ ছিল তাদের বিকৃতির অন্যতম বড় কারণ। এ ব্যাপারে তারা এক ধরনের উদ্ভট চিন্তা পোষণ করতো। তারা মনে করতো, তারা মহান মর্যাদা সম্পন্ন নবীদের সন্তান। বড় বড় আউলিয়া, সৎকর্মশীল ব্যক্তি, আবেদ ও যাহেদদের সাথে তারা সম্পর্কিত। ঐ সব মহান মনীষীদের বদৌলতে তাদের পাপ মোচন হয়ে যাবে। তাদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে এবং তাদের

وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوسٰىٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهٖ
وَأَنْتُمْ ظٰلِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾
وَإِذْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾
وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ
الْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوٓا أَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা মূসাকে চল্লিশ দিন–রাত্রির জন্য ডেকে নিয়েছিলাম,[৬৭] তখন তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে নিজেদের উপাস্যে[৬৮] পরিণত করেছিলে। সে সময় তোমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিলে। কিন্তু এরপরও আমরা তোমাদের মাফ করে দিয়েছিলাম এ জন্য যে, হয়তো এবার তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।

স্মরণ করো (ঠিক যখন তোমরা এই যুলুম করছিলে সে সময়) আমরা মূসাকে কিতাব ও ফুরকান[৬৯] দিয়েছিলাম, যাতে তার মাধ্যমে তোমরা সোজা পথ পেতে পারো।

স্মরণ করো যখন মূসা (এই নিয়ামত নিয়ে ফিরে এসে) নিজের জাতিকে বললো, "হে লোকেরা! তোমরা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিজেদের ওপর বড়ই যুলুম করেছো, কাজেই তোমরা নিজেদের স্রষ্টার কাছে তাওবা করো এবং নিজেদেরকে হত্যা করো,[৭০] এরি মধ্যে তোমাদের স্রষ্টার কাছে তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।" সে সময় তোমাদের স্রষ্টা তোমাদের তাওবা কবুল করে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

আস্তিন জড়িয়ে ধরে থাকার পরও কোন ব্যক্তি কেমন করে শাস্তি লাভ করতে পারে। এসব মিথ্যা নির্ভরতা ও সান্ত্বনা তাদেরকে দীন থেকে গাফেল করে গোনাহের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিল। তাই নিয়ামত ও আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাবার সাথে সাথেই তাদের এই ভুল ধারণাগুলো দূর করা হয়েছে।

৬৪. এখান থেকে নিয়ে পরবর্তী কয়েক রুকূ' পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যেসব ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে সেগুলো সবই বনী ইসরাঈলদের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ

وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

স্মরণ করো, যখন তোমরা মূসাকে বলেছিলে, "আমরা কখনো তোমার কথায় বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না আমরা স্বচক্ষে আল্লাহকে তোমার সাথে প্রকাশ্যে (কথা বলতে) দেখবো।" সে সময় তোমাদের চোখের সামনে তোমাদের ওপর একটি ভয়াবহ বজ্রপাত হলো, তোমরা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে গেলে। কিন্তু আবার আমরা তোমাদের বাঁচিয়ে জীবিত করলাম, হয়তো এ অনুগ্রহের পর তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।[৭১]

ঘটনা। ইসরাঈল জাতির যুব-বৃদ্ধ-শিশু নির্বেশেষে সবাই সেগুলো জানতো। তাই ঘটনাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা না করে এক একটি ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইংগিত করা হয়েছে মাত্র। এই ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ আসলে যে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চান সেটি হচ্ছে এই যে, একদিকে আল্লাহ তোমাদের প্রতি এসব অনুগ্রহ করেছিলেন আর অন্যদিকে তার জবাবে এসব হচ্ছে তোমাদের কীর্তিকলাপ।

৬৫. 'আলে ফেরাউন' শব্দের অনুবাদ করেছি আমি 'ফেরাউনী দল।" এতে ফেরাউনের বংশ ও মিসরের শাসকশ্রেণী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৬৬. যে চুল্লীর মধ্যে তোমাদের নিক্ষেপ করা হয়েছিল তা থেকে তোমরা খাঁটি সোনা হয়ে বের হও, না ভেজাল হয়ে—এরি ছিল পরীক্ষা। এত বড় বিপদের মুখ থেকে অলৌকিকভাবে মুক্তি লাভ করার পরও তোমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হও কি না, এ মর্মেও ছিল পরীক্ষা।

৬৭. মিসর থেকে মুক্তি লাভ করার পর বনী ইসরাঈল যখন সাইনা (সিনাই) উপদ্বীপে পৌঁছে গেলো তখন মহান আল্লাহ হযরত মূসা আলাইহিস সাল্লামকে চল্লিশ দিন-রাতের জন্য তূর পাহাড়ে ডেকে নিলেন। ফেরাউনের দাসত্ব মুক্ত হয়ে যে জাতিটি এখন মুক্ত পরিবেশে স্বাধীন জীবন যাপন করছে তার জন্য শরীয়াতের আইন এবং জীবন যাপনের বিধান দান করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। (বাইবেল, নির্গমন পুস্তক, ২৪-৩১ পরিচ্ছেদ দেখুন)

৬৮. বনী ইসরাঈলদের প্রতিবেশী জাতিদের মধ্যে গাভী ও ষাঁড় পূজার রোগ সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। মিসর ও কেনানে এর প্রচলন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সাল্লামের পর বনী ইসরাঈল যখন অধপতনের শিকার হ'লা এবং ধীরে ধীরে কিবতীদের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে পড়লো তখন অন্যান্য আরো বহু রোগের মধ্যে এ রোগটিও তারা নিজেদের শাসকদের থেকে গ্রহণ করেছিলা। (বাছুর পূজার এ ঘটনাটি বাইবেলের নির্গমন পুস্তকের ৩২ অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে)

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

আমরা তোমাদের ওপর মেঘমালার ছায়া দান করলাম,[৭২] তোমাদের জন্য সরবরাহ করলাম মান্না ও সালওয়ার খাদ্য[৭৩] এবং তোমাদের বললাম, যে পবিত্র দ্রব্য–সামগ্রী আমরা তোমাদের দিয়েছি তা থেকে খাও। কিন্তু তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা কিছু করেছে তা আমাদের ওপর যুলুম ছিল না বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।

আরো স্মরণ করো যখন আমরা বলেছিলাম, "তোমাদের সামনের এই জনপদে[৭৪] প্রবেশ করো এবং সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্যাদি যেমন ইচ্ছা খাও মজা করে। কিন্তু জনপদের দুয়ারে সিজদানত হয়ে প্রবেশ করবে 'হিত্তাতুন' 'হিত্তাতুন' বলতে বলতে।[৭৫] আমরা তোমাদের ত্রুটিগুলো মাফ করে দেবো এবং সৎকর্মশীলদের প্রতি অত্যধিক অনুগ্রহ করবো।" কিন্তু যে কথা বলা হয়েছিল যালেমরা তাকে বদলে অন্য কিছু করে ফেললো। শেষ পর্যন্ত যুলুমকারীদের ওপর আমরা আকাশ থেকে আযাব নাযিল করলাম। এ ছিল তারা যে নাফরমানি করছিল তার শাস্তি।

৬৯. ফুরকান হচ্ছে এমন একটি জিনিস যার মাধ্যমে হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে তোলা হয়। আমাদের ভাষায় এই অর্থটিকে সুস্পষ্ট করার জন্য সবচাইতে কাছাকাছি শব্দ হচ্ছে 'মানদণ্ড।' এখানে ফুরকানের মানে হচ্ছে দীনের এমন জ্ঞান, বোধ ও উপলব্ধি যার মাধ্যমে মানুষ হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।

৭০. অর্থাৎ তোমাদের যেসব লোক গো–শাবককে উপাস্য বানিয়ে তার পূজা করেছে তাদেরকে হত্যা করো।

৭১. এখানে যে ঘটনাটির দিকে ইংগিত করা হয়েছে সেটি হচ্ছে ঃ চল্লিশ দিন-রাতের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হযরত মূসা আলাইহিস সাল্লাম যখন তূর পাহাড়ে চলে গেলেন, আল্লাহ তাঁকে হুকুম দিলেন বনী ইসরাঈলের সত্তরজন প্রতিনিধিকেও তাঁর সাথে নিয়ে আসার। তারপর মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সাল্লামকে কিতাব ও ফুরকান দান করলেন। তিনি তা ঐ প্রতিনিধিদের সামনে পেশ করলেন। কুরআন বলছে, ঠিক তখনই তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলতে থাকলো, মহান আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলেছেন একথাটি আমরা শুধুমাত্র আপনার কথায় কেমন করে মেনে নিতে পারি? তাদের একথায় আল্লাহর ক্রোধ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো এবং তিনি তাদেরকে শাস্তি দিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বাইবেল বলছে ঃ

"তারা ইসরাঈলের খোদাকে দেখেছে। তাঁর চরণ তলের স্থানটি ছিল নীলকান্তমণি খচিত পাথরের চত্বরের ন্যায়। আকাশের মতো ছিল তার স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য। তিনি বনী ইসরাঈলের সম্মানিত ব্যক্তিদের ওপর নিজের হাত প্রসারিত করেননি। কাজেই তারা খোদাকে দেখেছে, খেয়েছে এবং পান করেছে।" (নির্গমন পুস্তক, ২৪ অনুচ্ছেদ, ১০-১১ শ্লোক)।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই বাইবেলের আরো সামনের দিকে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ "যখন হযরত মূসা (আ) খোদার কাছে আরজ করলেন, আমাকে তোমার প্রতাপ ও জ্যোতি দেখাও। জবাবে তিনি বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পারো না।" (নির্গমন পুস্তক, ৩৩ অনুচ্ছেদ, ১৮-২৩ শ্লোক)।

৭২. অর্থাৎ প্রখর রৌদ্র থেকে বাঁচার জন্য যেখানে সিনাই উপদ্বীপে তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল ছিল না সেখানে আমরা মেঘমালার ছায়া দান করে তোমাদের বাঁচার উপায় করে দিয়েছি। এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে, লক্ষ লক্ষ বনী ইসরাঈল মিসর থেকে বের হয়ে এসেছিল। আর সিনাই উপত্যকায় গৃহ তো দূরের কথা সামান্য একটু মাথা গোঁজার মতো তাঁবুও তাদের কাছে ছিল না। সে সময় যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সময়ের জন্য আকাশকে মেঘাবৃত করে রাখা না হতো, তাহলে খর-রৌদ্র-তাপে বনী ইসরাঈলী জাতি সেখানেই ধ্বংস হয়ে যেতো।

৭৩. মান্না ও সালওয়া ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক প্রকার প্রাকৃতিক খাদ্য। বনী ইসরাঈলরা তাদের বাস্তুহারা জীবনের সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে এই খাদ্য লাভ করতে থেকেছে। মান্না ছিল ধনিয়ার দানার মতো ক্ষুদ্রাকৃতির এক ধরনের খাদ্য। সেগুলোর বর্ষণ হতো কুয়াসার মতো। জমিতে পড়ার পর জমে যেতো। আর সালওয়া ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির কবুতরের মতো একপ্রকার পাখি। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে এই খাদ্যের বিপুল প্রাচুর্য ছিল। বিপুল জনসংখ্যার অধিকারী একটি জাতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই খাদ্যের ওপর জীবন নির্বাহ করেছে। তাদের কাউকে কোনদিন অনাহারে থাকতে হয়নি। অথচ আজকের উন্নত বিশ্বের কোন দেশে যদি হঠাৎ কয়েক লাখ শরণার্থী প্রবেশ করে তাহলে তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা একটি প্রাণান্তকর সমস্যায় পরিণত হয়। (মান্না ও সালওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে বাইবেলের নির্গমন পুস্তক ঃ ১৬ অনুচ্ছেদ, গণনা ঃ ১১ অনুচ্ছেদ, ৭-৯ ও ৩১-৩৬ শ্লোক এবং ঈশু ঃ ৫ অনুচ্ছেদ, ১২ শ্লোক)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝٦٠

৭ রুকু’

স্মরণ করো, যখন মূসা তার জাতির জন্য পানির দোয়া করলো, তখন আমরা বললাম, অমুক পাথরের ওপর তোমার লাঠিটি মারো। এর ফলে সেখান থেকে বারোটি ঝর্ণাধারা উৎসারিত হলো।[৭৬] প্রত্যেক গোত্র তার পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল। (সে সময় এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে,) আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক খাও, পান করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

৭৪. এখনো পর্যন্ত যথার্থ অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ জনপদটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। তবে যে ঘটনা পরম্পরায় এর উল্লেখ হয়েছে তা এমন এক যুগের সাথে সম্পর্কিত যখন বনী ইসরাঈল সাইনা উপদ্বীপেই অবস্থান করছিল। তাতেই মনে হয়, উল্লেখিত জনপদটির অবস্থান এ উপদ্বীপের কোথাও হবে। কিন্তু এ জনপদটি ‘সিত্তীম’ও হতে পারে। সিত্তীম শহরটি ‘ইয়ারীহো’–এর ঠিক বিপরীত দিকে জর্দান নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল। বাইবেলে উল্লেখিত হয়েছে, বনী ইসরাঈলরা মূসার (আ) জীবনের শেষ অধ্যায়ে এ শহরটি জয় করেছিল। সেখানে তারা ব্যাপক ব্যভিচার করে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে ভয়াবহ মহামারীর শিকারে পরিণত করেন এবং এতে চব্বিশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। (গণনা, ২৫ অনুচ্ছেদ, ১–৮ শ্লোক)

৭৫. অর্থাৎ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, স্বেচ্ছাচারী যালেম বিজয়ীদের মতো অহংকার মদমত্ত হয়ে প্রবেশ করো না। বরং আল্লাহর প্রতি অনুগত ও তাঁর ভয়ে ভীত বান্দাদের মতো বিনম্রভাবে প্রবেশ করো। যেমন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় বিনয়াবনত হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। ‘হিত্তাতুন’ শব্দটির দুই অর্থ হতে পারে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কাছে নিজের গোনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে প্রবেশ করো। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, ব্যাপক গণহত্যা ও লুটতরাজ করতে করতে প্রবেশ না করে বরং জনপদের অধিবাসীদের ভুল–ত্রুটি উপেক্ষা করে তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে করতে শহরে প্রবেশ করো।

৭৬. সে পাথরটি এখনো সিনাই উপদ্বীপে রয়েছে। পর্যটকরা এখনো গিয়ে সেটি দেখেন। পাথরের গায়ে এখনো ঝর্ণার উৎস মুখের গর্তগুলো দেখা যায়। ১২টি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করার কারণ ছিল এই যে, বনী ইসরাঈলদেরও ১২টি গোত্র ছিল। প্রত্যেক গোত্রের জন্য আল্লাহ একটি করে ঝর্ণা প্রবাহিত করেন। তাদের মধ্যে পানি নিয়ে কলহ সৃষ্টি না হয়, এ জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا
وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ
اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ
وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾

স্মরণ করো, যখন তোমরা বলেছিলে, "হে মূসা! আমরা একই ধরনের খাবারের ওপর সবর করতে পারি না, তোমার রবের কাছে দোয়া করো যেন তিনি আমাদের জন্য শাক-সব্জি, গম, রসুন, পেঁয়াজ, ডাল ইত্যাদি কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন করেন।" তখন মূসা বলেছিল, "তোমরা কি একটি উৎকৃষ্ট জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস নিতে চাও?[৭৭] *তাহলে তোমরা কোন নগরে গিয়ে বসবাস করো, তোমরা যা কিছু চাও সেখানে পেয়ে যাবে।" অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যার ফলে লাঞ্ছনা, অধপতন, দুরবস্থা ও অনটন তাদের ওপর চেপে বসলো এবং আল্লাহর গযব তাদেরকে ঘিরে ফেললো। এ ছিল তাদের আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করার*[৭৮] *এবং পয়গম্বরদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার ফল।*[৭৯] *এটি ছিল তাদের নাফরমানির এবং শরীয়াতের সীমালংঘনের ফল।*

৭৭. এর অর্থ এ নয় যে, বিনা শ্রমে লব্ধ মান্না ও সালওয়া বাদ দিয়ে তোমরা এমন জিনিস চাচ্ছো যে জন্য শারীরিক মেহনত করে কৃষি করতে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, যে মহান উদ্দেশ্যে তোমাদের মরুচারিতায় লিপ্ত করা হয়েছে তার মোকাবিলায় খাদ্যের স্বাদ তোমাদের কাছে বেশী প্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে তোমরা ঐ মহান উদ্দেশ্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছো কিন্তু সামান্য সময়ের জন্য ঐ খাদ্যের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকতে চাও না। (তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য দেখুন গণনা পুস্তক ১১ অনুচ্ছেদ, ৪-৯ শ্লোক)

৭৮. আয়াতের সাথে কুফরী করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। যেমন, এক ঃ আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষাবলীর মধ্য থেকে যে কথাটিকে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাংখার বিরোধী পেয়েছে তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। দুই ঃ কোন বক্তব্যকে আল্লাহর বক্তব্য জানার পরও পূর্ণ দাম্ভিকতা, নির্লজ্জতা ও বিদ্রোহাত্মক মনোভাব সহকারে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং আল্লাহর নির্দেশের কোন পরোয়া

করেনি। তিন ঃ আল্লাহর বাণীর অর্থ ও উদ্দেশ্য ভালোভাবে জানার ও বুঝার পরও নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছে।

৭৯. বনী ইসরাঈল নিজেদের এই অপরাধকে নিজেদের ইতিহাস গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বাইবেলের কয়েকটি ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করছি।

এক ঃ হযরত সুলাইমানের পর ইসরাঈলী সাম্রাজ্য দু'টি রাষ্ট্রে (জেরুযালেমের ইহুদিয়া রাষ্ট্র এবং সামারিয়ার ইসরাঈল রাষ্ট্র) বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকে। অবশেষে ইহুদিয়া রাষ্ট্র নিজের ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দামেস্কের আরামী রাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করে। এতে আল্লাহর হুকুমে হানানী নবী ইহুদিয়া রাষ্ট্রের শাসক 'আসা'-কে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেন। কিন্তু 'আসা' এই সতর্কবাণী গ্রহণ করার পরিবর্তে আল্লাহর নবীকে কারারুদ্ধ করে। (২ বংশাবলী, ১৭ অধ্যায়, ৭-১০ শ্লোক)

দুই ঃ হযরত ইলিয়াস (ইলিয়াহ—ELLIAH) আলাইহিস সাল্লাম যখন বা'ল দেবতার পূজার জন্য ইহুদিদের তিরস্কার করেন এবং নতুন করে আবার তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন তখন সামারিয়ার ইসরাঈলী রাজা 'আখিআব' নিজের মুশরিক স্ত্রীর প্ররোচনায় তাঁর প্রাণনাশের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় মেতে ওঠেন। ফলে তাঁকে সিনাই উপদ্বীপের পর্বতাঞ্চলে আশ্রয় নিতে হয়। এ সময় হযরত ইলিয়াস যে দোয়া করেন তার শব্দাবলী ছিল নিম্নরূপ ঃ

"বনী ইসরাঈল তোমার সাথে কৃত অংগীকার ভংগ করেছে.................তোমার নবীদের হত্যা করেছে তলোয়ারের সাহায্যে এবং একমাত্র আমিই বেঁচে আছি। তাই তারা আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করছে। (১ রাজাবলী, ১৭ অধ্যায়, ১-১০ শ্লোক)

তিন ঃ সত্য ভাষণের অপরাধে হযরত 'মিকাইয়াহ' নামে আর একজন নবীকেও এই ইসরাঈলী শাসক আখিআব কারারুদ্ধ করে। সে হুকুম দেয়, এই ব্যক্তিকে বিপদের খাদ্য খাওয়াও এবং বিপদের পানি পান করাও। (১ রাজাবলী, ২২ অধ্যায়, ২৬—২৭ শ্লোক)।

চার ঃ আবার যখন ইহুদিয়া রাষ্ট্রে প্রকাশ্যে মূর্তি পূজা ও ব্যভিচার চলতে থাকে এবং হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সাল্লাম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন তখন ইহুদি রাজা ইউআস-এর নির্দেশে তাকে মূল হাইকেলে সুলাইমানীতে 'মাকদিস' (পবিত্র স্থান) ও 'যবেহ ক্ষেত্র'-এর মাঝখানে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়। (২ বংশাবলী, ২৪ অধ্যায়, ২১ শ্লোক)।

পাঁচ ঃ অতপর আশুরিয়াদের হাতে যখন সামারিয়াদের ইসরাঈলী রাষ্ট্রের পতন হয় এবং জেরুসালেমের ইহুদি রাষ্ট্র মহাধ্বংসের সম্মুখীন হয় তখন 'ইয়ারমিয়াহ' নবী নিজের জাতির পতনে আর্তনাদ করে ওঠেন। তিনি পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে নিজের জাতিকে সম্বোধন করে বলতে থাকেন, "সতর্ক হও, নিজেদেরকে সংশোধন করো, অন্যথায় তোমাদের পরিণাম সামারিয়া জাতির চাইতেও ভয়াবহ হবে।" কিন্তু জাতির পক্ষ থেকে এই সাবধান বাণীর বিরূপ জওয়াব আসে। চারদিক থেকে তাঁর ওপর প্রবল বৃষ্টিধারার মতো অভিশাপ ও গালি-গালাজ বর্ষিত হতে থাকে। তাঁকে মারধর করা হয়। কারারুদ্ধ করা হয়। ক্ষুধা ও পিপাসায় শুকিয়ে মেরে ফেলার জন্য রশি দিয়ে বেঁধে তাকে কর্দমাক্ত কূয়ার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার এবং বিদেশী শত্রুর সাথে আতাত করার অভিযোগ আনা হয়। (যিরমিয়, ১৫ অধ্যায়, ১০ শ্লোক; ১৮ অধ্যায়, ২০—২৩ শ্লোক; ২০ অধ্যায়, ১—১৮ শ্লোক; ৩৬—৪০ অধ্যায়)।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

৮ রুকূ'

নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, যারা শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনে কিংবা ইহুদি, খৃস্টান বা সাবি তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তার প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের জন্য কোন ভয় ও মর্মবেদনার অবকাশ নেই।[৮০]

ছয় ঃ 'আমুস' নামক আর একজন নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ যখন তিনি সামারিয়ার ইসরাঈলী রাষ্ট্রের ভ্রষ্টতা ও ব্যভিচারের সমালোচনা করেন এবং এই অসৎকাজের পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেন তখন তাঁকে চরমপত্র দিয়ে বলে দেয়া হয়, এদেশ থেকে বের হয়ে যাও এবং বাইরে গিয়ে নিজের নবুওয়াত প্রচার করো। (আমুস, ৭ অধ্যায়, ১০—১৩ শ্লোক)।

সাত ঃ হযরত ইয়াহইয়া (John the Baptist) আলাইহিস সালাম যখন ইহুদি শাসক হিরোডিয়াসের দরবারে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত ব্যভিচার ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান তখন প্রথমে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। তারপর বাদশাহ নিজের প্রেমিকার নির্দেশানুসারে জাতির এই সবচেয়ে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিটির শিরচ্ছেদ করে। কর্তিত মস্তক একটি থালায় করে নিয়ে বাদশাহ তার প্রেমিকাকে উপহার দেয়। (মার্ক, ৬ অধ্যায়, ১৭–২৯ শ্লোক)।

আট ঃ সবশেষে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলের আলেম সমাজ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের ক্রোধ উদ্দীপিত হয়। কারণ তিনি তাদের পাপ কাজ ও লোক দেখানো সৎকাজের সমালোচনা করতেন। তাদেরকে ঈমান ও সৎকাজের দিকে আহবান জানাতেন। এসব অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা তৈরি করা হয়। রোমান আদালত তাঁকে প্রাণদণ্ড দানের সিদ্ধান্ত করে। রোমান শাসক পীলাতীস যখন ইহুদিদের বললো, আজ ঈদের দিন, আমি তোমাদের স্বার্থে ঈসা ও বারাব্বা (Barabbas) ডাকাতের মধ্য থেকে একজনকে মুক্তি দিতে চাই। আমি কাকে মুক্তি দেবো? ইহুদিরা সমস্বরে বললো, আপনি বারাব্বাকে মুক্তি দিন এবং ঈসাকে ফাঁসি দিন। (মথি, ২৭ অধ্যায়, ২০-২৬ শ্লোক)।

এই হচ্ছে ইহুদি জাতির অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের একটি কলংকজনক অধ্যায়। কুরআনের উল্লেখিত আয়াতগুলোতে সংক্ষেপে এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে জাতি নিজের ফাসেক ও দুশ্চরিত্র সম্পন্ন লোকদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসাতে এবং

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ
فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ
عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا
قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا
وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা 'তূর'কে তোমাদের ওপর উঠিয়ে তোমাদের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম[৮১] ঃ "যে কিতাব আমরা তোমাদেরকে দিচ্ছি তাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তার মধ্যে যে সমস্ত নির্দেশ ও বিধান রয়েছে সেগুলো স্মরণ রেখো। এভাবেই আশা করা যেতে পারে যে, তোমরা তাকওয়ার পথে চলতে পারবে।" কিন্তু এরপর তোমরা নিজেদের অংগীকার ভংগ করলে। তবুও আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত তোমাদের সংগ ছাড়েনি, নয়তো তোমরা কবেই ধ্বংস হয়ে যেতে।

নিজেদের জাতির সেইসব লোকের ঘটনা তো তোমাদের জানাই আছে যারা শনিবারের[৮২] বিধান ভেঙেছিল। আমরা তাদের বলে দিলাম ঃ বানর হয়ে যাও এবং এমনভাবে অবস্থান করো যাতে তোমাদের সবদিক থেকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতে হয়।[৮৩] এভাবে আমরা তাদের পরিণতিকে সমকালীন লোকদের এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য শিক্ষণীয় এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য মহান উপদেশে পরিণত করেছি।

সৎ ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী লোকদেরকে কারাগারে স্থান দিতে চায় আল্লাহ তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ না করলে আর কাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করবেন?

৮০. বক্তব্য ও বিষয়বস্তু বর্ণনার ধারবাহিকতাকে সামনে রাখলে একথা আপনা আপনি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এখানে ঈমান ও সৎকাজের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া মূল লক্ষ নয়। কোন্ বিষয়গুলো মানতে হবে এবং কোন্ কাজগুলো করলে মানুষ আল্লাহর কাছে প্রতিদান লাভের অধিকারী হবে, এ আয়াতে সে প্রসংগ আলোচিত হয়নি। বরং যথাস্থানে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা আসবে। ইহুদিরা যে একমাত্র ইহুদি গোষ্ঠীকেই নাজাত ও

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۶۷﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِىَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿۶۸﴾

এরপর স্মরণ করো সেই ঘটনার কথা যখন মূসা তার জাতিকে বললো, আল্লাহ তোমাদের একটি গাভী যবেহ করার হুকুম দিচ্ছেন। তারা বললো, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছো? মূসা বললো, নিরেট মূর্খদের মতো কথা বলা থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তারা বললো, আচ্ছা তাহলে তোমার রবের কাছে আবেদন করো তিনি যেন সেই গাভীর কিছু বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানিয়ে দেন। মূসা জবাব দিল আল্লাহ বলছেন, সেটি অবশ্যি এমন একটি গাভী হতে হবে যে বৃদ্ধা নয়, একেবারে ছোট্ট বাছুরটিও নয় বরং হবে মাঝারি বয়সের। কাজেই যেমনটি হুকুম দেয়া হয় ঠিক তেমনটিই করো।

পরকালীন মুক্তির ইজারাদার মনে করতো সেই ভ্রান্ত ধারণাটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোই এখানে এই আয়াতটির উদ্দেশ্য। তারা এই ভুল ধারণা পোষণ করতো যে, তাদের দলের সাথে আল্লাহর কোন বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে—যা অন্য মানুষের সাথে নেই, কাজেই তাদের দলের সাথে যে-ই সম্পর্ক রাখবে, তার আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক যাই হোক না কেন, সে নির্ঘাত নাজাত লাভ করবে। আর তাদের দলের বাইরে বাদবাকি সমগ্র মানবজাতি কেবল জাহান্নামের ইন্ধন হবার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য বলা হচ্ছে, আল্লাহর কাছে তোমাদের এই দল ও গোত্র বিভক্তিই আসল কথা নয় বরং সেখানে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বিষয় হচ্ছে তোমাদের ঈমান ও সৎকাজ. যে ব্যক্তি এগুলো নিয়ে আল্লাহর সামনে হাযির হবে সে তার রবের কাছ থেকে তার প্রতিদান লাভ করবে. আল্লাহর ওখানে ফায়সালা হবে মানুষের গুণাবলীর ওপর, জনসংখ্যার হিসেবের খাতাপত্রের ওপর নয়।

৮১. এ ঘটনাটিকে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, এটি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি সুবিখ্যাত ও সর্বজনবিদিত ঘটনা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর বিস্তারিত অবস্থা জানা কঠিন। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বুঝে নেয়া উচিত যে, পাহাড়ের পাদদেশে অংগীকার নেয়ার সময় এমন ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিল যার ফলে তারা মনে করছিল পাহাড় তাদের ওপর আপতিত হবে। সূরা আ'রাফের ১৭১ আয়াতে কিছুটা এ ধরনেরই একটি ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। (সূরা আ'রাফের ১৩২ নম্বর টীকাটি দেখুন)।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ
لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ
وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ
بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

আবার তারা বলতে লাগলো, তোমার রবের কাছে আরো জিজ্ঞেস করো, তার রংটি কেমন? মূসা জবাব দিল, তিনি বলছেন, গাভীটি অবশ্যি হলুদ রংয়ের হতে হবে, তার রং এতই উজ্জ্বল হবে যাতে তা দেখে মানুষের মন ভরে যাবে। আবার তারা বললো, তোমার রবের কাছ থেকে এবার পরিষ্কারভাবে জেনে নাও, তিনি কেমন ধরনের গাভী চান? গাভীটি নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমরা সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছি। আল্লাহ চাইলে আমরা অবশ্যি এটি বের করে ফেলবো। মূসা জবাব দিল আল্লাহ বলছেন, সেটি এমন একটি গাভী যাকে কোন কাজে নিযুক্ত করা হয় না, জমি চাষ বা ক্ষেতে পানি সেচ কোনটিই করে না, সুস্থ–সবল ও নিখুঁত। একথায় তারা বলে উঠলো, হাঁ, এবার তুমি ঠিক সন্ধান দিয়েছো। অতপর তারা তাকে যবেহ করলো, অন্যথায় তারা এমনটি করতো বলে মনে হচ্ছিল না।[৮৪]

৮২. বনী ইসরাঈলদের জন্য শনিবারের বিধান তৈরি করা হয়েছিল। অর্থাৎ আইনের মাধ্যমে শনিবার দিনটি তাদের বিশ্রাম ও ইবাদাত করার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এদিনে তারা পার্থিব কোন কাজ এমন কি রান্না–বান্নার কাজ নিজেরা করতে পারবে না এবং চাকর–বাকরদের দ্বারাও এ কাজ করাতে পারবে না। এ প্রসংগে কড়া নির্দেশ জারী করে বলা হয়েছিল, যে ব্যক্তি এই পবিত্র দিনের নির্দেশ অমান্য করবে তাকে হত্যা করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়বে। (যাত্রা পুস্তক, ৩১ অধ্যায়, ১২—১৭ শ্লোক)।

কিন্তু বনী ইসরাঈলরা নৈতিক ও ধর্মীয় পতনের শিকার হবার পর প্রকাশ্যে শনিবারের বিধানের অবমাননা করতে থাকে। এমনকি তাদের শহরগুলোতে প্রকাশ্যে শনিবার ব্যবসা–বাণিজ্য, কাজ–কারবার চলতে থাকে।

৮৩. সূরা আ'রাফের ২১ রুকূ'তে এ ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। তাদেরকে বানরে পরিণত করার ধরন সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকে মনে করেন, তাদের

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ
كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ
الْأَنْهٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا
يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

৯ রুকূ'

আর স্মরণ করো সেই ঘটনার কথা যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একজন আর একজনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনছিলে। আর আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছিলেন তোমরা যা কিছু গোপন করছো তা তিনি প্রকাশ করে দেবেন। সে সময় আমরা হুকুম দিলাম, নিহতের লাশকে তার একটি অংশ দিয়ে আঘাত করো। দেখো এভাবে আল্লাহ মৃতদের জীবন দান করেন এবং তোমাদেরকে নিজের নিশানী দেখান, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।[৮৫] কিন্তু এ ধরনের নিশানী দেখার পরও তোমাদের দিল কঠিন হয়ে গেছে, পাথরের মত কঠিন বরং তার চেয়েও কঠিন। কারণ এমন অনেক পাথর আছে যার মধ্য দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয় আবার অনেক পাথর ফেটে গেলে তার মধ্য থেকে পানি বের হয়ে আসে, আবার কোন কোন পাথর আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পড়েও যায়। আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বেখবর নন।

দৈহিক কাঠামো পরিবর্তন করে বানরে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছিল। আবার অনেকে এর অর্থ এই গ্রহণ করে থাকে যে, তাদের মধ্যে বানরের স্বভাব ও বানরের গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কুরআনের শব্দাবলী ও বর্ণনাভংগী থেকে মনে হয়, তাদের মধ্যে নৈতিক নয়, দৈহিক বিকৃতি ঘটেছিল: আমার মতে, তাদের মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তিকে পূর্ববৎ অবিকৃত রেখে শারীরিক বিকৃতি ঘটিয়ে বানরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এটিই যুক্তিসংগত বলে মনে হয়।

৮৪. তাদের প্রতিবেশী জাতিরা গরুকে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র মনে করতো এবং গরু পূজা করতো আর প্রতিবেশীদের থেকে এ রোগ তাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়, তাই তাদেরকে গরু যবেহ করার হুকুম দেয়া হয়। তাদের ঈমানের পরীক্ষা এভাবেই হওয়া সম্ভবপর

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

হে মুসলমানরা! তোমরা কি তাদের থেকে আশা করো তারা তোমাদের দাওয়াতের ওপর ঈমান আনবে?[৮৬] অথচ তাদের একটি দলের চিরাচরিত রীতি এই চলে আসছে যে, আল্লাহর কালাম শুনার পর খুব ভালো করে জেনে বুঝে সজ্ঞানে তার মধ্যে 'তাহরীফ' বা বিকৃতি সাধন করেছে।[৮৭] (মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর ওপর) যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে সাক্ষাত হলে বলে, আমরাও তাঁকে মানি। আবার যখন পরস্পরের সাথে নিরিবিলিতে কথা হয় তখন বলে, তোমরা কি বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেলে? এদেরকে তোমরা এমন সব কথা বলে দিচ্ছো যা আল্লাহ তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন, ফলে এরা তোমাদের রবের কাছে তোমাদের মোকাবিলায় তোমাদের একথাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে?[৮৮]

ছিল। এখন যদি তারা যথার্থই আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে মাবুদ বলে স্বীকার না করে তাহলে এ আকীদা গ্রহণ করার পূর্বে যেসব ঠাকুর–দেবতার মূর্তিকে তারা মাবুদ মনে করে আসছিল তাদেরকে নিজের হাতে ভেঙে ফেলতে হবে। এটা অনেক বড় পরীক্ষা ছিল। তাদের দিলের মধ্যে ঈমান পুরোপুরি বাসা বাঁধতে পারেনি, তাই তারা টালবাহানা করতে থাকে এবং বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। কিন্তু যতই বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে ততই তারা নিজেরা ঘেরাও হয়ে যেতে থাকে। অবশেষে সেকালে যে বিশেষ ধরনের সোনালী গাভীর পূজা করা হতো তার প্রতি প্রায় অংগুলি নির্দেশ করে তাকেই যবেহ করতে বলা হলো। বাইবেলেও এই ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তবে বনী ইসরাঈলরা এ নির্দেশটি উপেক্ষা করার জন্য কোন্ ধরনের টালবাহানা করেছিল, তা সেখানে বলা হয়নি। (গণনা পুস্তক, ১৯ অধ্যায়, ১—১০ শ্লোক)।

৮৫. এখানে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে, হত্যাকারীর সন্ধান বলে দেয়ার জন্য নিহত ব্যক্তির লাশের মধ্যে পুনরায় কিছুক্ষণের জন্য প্রাণস্পন্দন ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির লাশকে তার একটি অংশ দিয়ে আঘাত করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। তবুও এর ব্যাখ্যায় প্রাচীনতম তাফসীরকারগণ যা বলেছেন তাকেই এর

নিকটতম অর্থ ধরা যায়। অর্থাৎ আগে যে গাভী যবেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তারই গোশ্ত দিয়ে নিহত ব্যক্তির লাশের গায়ে আঘাত করতে বলা হয়েছিল। এভাবে এক ঢিলে দুই পাখি মারা গেলো। প্রথমত আল্লাহর কুদরাত ও অসীম ক্ষমতার একটি প্রমাণ তাদের সামনে তুলে ধরা হলো। দ্বিতীয়ত গরুর পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও তাকে উপাস্য হবার যোগ্যতার ওপরও একটি শক্তিশালী আঘাত হানা হলো। এই তথাকথিত উপাস্যটি যদি সামান্যতম ক্ষমতারও অধিকারী হতো তাহলে তাকে যবেহ করার কারণে একটি মহাবিপদ ও দুর্যোগ ঘনিয়ে আসতো। কিন্তু বিপরীত পক্ষে আমরা দেখছি তা মানুষের কল্যাণে লেগেছে।

৮৬. এখানে মদীনার নওমুসলিমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা নিকটবর্তী কালে শেষ নবীর ওপর ঈমান এনেছিল। ইতিপূর্বে নবুওয়াত, শরীয়াত, কিতাব, ফেরেশতা, আখেরাত ইত্যাদি শব্দগুলো তাদের কানে পৌঁছেছিল। এসব তারা শুনেছিল তাদের প্রতিবেশী ইহুদিদের কাছ থেকে। তারা ইহুদিদের মুখ থেকে আরো শুনেছিল যে, দুনিয়ায় আরো একজন নবী আসবেন। যারা তাঁর সাথে সহযোগিতা করবে সারা দুনিয়ায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই জানার ভিত্তিতে মদীনাবাসীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের চর্চা শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এখন তারা আশা করছিল, যারা আগে থেকে নবী ও আসমানী কিতাবের অনুসারী এবং যাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবরের বদৌলতে তারা ঈমানের মহামূল্যবান সম্পদের অধিকারী হয়েছে, তারা নিশ্চয়ই তাদের সহযোগী হবে। বরং এ পথে তারা অগ্রগামী হবে। এই বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে মদীনার উদ্যোগী নওমুসলিমরা তাদের ইহুদি বন্ধু ও প্রতিবেশীদের কাছে যেতো এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতো। তারা এ দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে মুনাফিক ও ইসলাম বিরোধীরা এ সুযোগ গ্রহণ করতো। তারা এ থেকে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করতো যে, ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক ও সংশয়পূর্ণ মনে হচ্ছে, নইলে মুহাম্মাদ (সা) যদি সত্যিই নবী হতেন তাহলে 'আহলি কিতাব'দের উলামা, মাশায়েখ ও পবিত্র বুযর্গগণ কি জেনে বুঝে ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানাতো এবং তারা কি অনর্থক এভাবে নিজেদের পরকাল নষ্ট করতো? তাই বনী ইসরাঈলদের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করার পর এবার সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, অতীতে যারা এ ধরনের কীর্তিকলাপ করেছে তাদের ব্যাপারে তোমরা বেশী কিছু আশা করো না। অন্যথায় তোমাদের দাওয়াত তাদের পাষাণ অন্তরে ধাক্কা খেয়ে যখন ফিরে আসবে তখন তোমাদের মন ভেঙে পড়বে। এই ইহুদিরা শত শত বছর থেকে বিকৃত হয়ে আছে। আল্লাহর যে সমস্ত আয়াত শুনে তোমাদের দিল কেঁপে ওঠে সেগুলোকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে করতে তাদের কয়েক পুরুষ কেটে গেছে। আল্লাহর সত্য দীনকে তারা নিজেদের ইচ্ছা ও চাহিদা মোতাবিক বিকৃত করেছে। এই বিকৃত দীনের মাধ্যমেই তারা পরকালীন নাজাত লাভের প্রত্যাশী। সত্যের আওয়াজ বুলন্দ হবার সাথে সাথেই তারা সেদিকে দৌড়ে যাবে, তাদের সম্পর্কে এ ধারণা রাখা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৮৭. "একটি দল" বলতে তাদের উলামা ও শরীয়াতধারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। এখানে তাওরাত, যাবুর ও অন্যান্য কিতাব, যেগুলো তারা নিজেদের নবীদের মাধ্যমে লাভ

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

এরা কি জানে না, যা কিছু এরা গোপন করছে এবং যা কিছু প্রকাশ করছে সমস্তই আল্লাহ জানেন? এদের মধ্যে দ্বিতীয় একটি দল হচ্ছে নিরক্ষরদের। তাদের কিতাবের জ্ঞান নেই, নিজেদের ভিত্তিহীন আশা–আকাংখাগুলো নিয়ে বসে আছে এবং নিছক অনুমান ও ধারণার ওপর নির্ভর করে চলছে।[৮৯] কাজেই তাদের জন্য ধ্বংস অবধারিত যারা স্বহস্তে শরীয়াতের লিখন লেখে তারপর লোকদের বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এভাবে তারা এর বিনিময়ে সামান্য স্বার্থ লাভ করে।[৯০] তাদের হাতের এই লিখন তাদের ধ্বংসের কারণ এবং তাদের এই উপার্জনও তাদের ধ্বংসের উপকরণ।

করেছিল, সেগুলোকেই বলা হয়েছে "আল্লাহর কালাম।" 'তাহরীফ' অর্থ হচ্ছে কোন কথাকে তার আসল অর্থ ও তাৎপর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের ইচ্ছে মতো এমন কোন অর্থে ব্যবহার করা যা বক্তার উদ্দেশ্য ও লক্ষের পরিপন্থী। তাছাড়া শব্দের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করাকেও তাহরীফ বলে। বনী ইসরাঈলী আলেমগণ আল্লাহর কালামের মধ্যে এই দু' ধরনের তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করেছিল।

৮৮. অর্থাৎ তারা পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় বলতো, এই নবী সম্পর্কে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত হয়েছে অথবা আমাদের পবিত্র কিতাবসমূহে আমাদের বর্তমান মনোভাব ও কর্মনীতিকে অভিযুক্ত করার মতো যে সমস্ত আয়াত ও শিক্ষা রয়েছে, সেগুলো মুসলমানদের সামনে বিবৃত করো না। অন্যথায় তারা আল্লাহর সামনে এগুলোকে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে। আল্লাহ সম্পর্কে নাদান ইহুদিদের বিশ্বাস এভাবেই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ তারা যেন মনে করতো, দুনিয়ায় যদি তারা আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করে ও সত্য গোপন করে তাহলে এ জন্য আখেরাতে তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা চলবে না। তাই পরবর্তী প্রাসংগিক বাক্যে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা কি আল্লাহকে বেখবর মনে করো?

৮৯. এ ছিল তাদের জনগণের অবস্থা। আল্লাহর কিতাবের কোন জ্ঞানই তাদের ছিল না। আল্লাহ তাঁর কিতাবে দীনের কি কি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, শরীয়াত ও নৈতিকতার কি

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ
اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾
بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

তারা বলে, জাহান্নামের আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না, তবে কয়েক দিনের শাস্তি হলেও হয়ে যেতে পারে।[৯১] এদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোন অংগীকার নিয়েছো, যার বিরুদ্ধাচরণ তিনি করতে পারেন না? অথবা তোমরা আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দিয়ে এমন কথা বলছো যে কথা তিনি নিজের ওপর চাপিয়ে নিয়েছেন বলে তোমাদের জানা নেই? আচ্ছা জাহান্নামের আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না কেন? যে ব্যক্তিই পাপ করবে এবং পাপের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়বে সে-ই জাহান্নামী হবে এবং জাহান্নামের আগুনে পুড়তে থাকবে চিরকাল। আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।

বিধান দিয়েছেন এবং কোন কোন জিনিসের ওপর মানুষের কল্যাণ ও ক্ষতির ভিত রেখেছেন, তার কিছুই তারা জানতো না। এই জ্ঞান না থাকার কারণে তারা নিজেদের ইচ্ছা, আশা–আকাংখা ও কল্পনার অনুসারী বিভিন্ন মনগড়া কথাকে দীন মনে করতো এবং এরি ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মিথ্যা আশা বুকে নিয়ে জীনব ধারণ করতো।

৯০. তাদের আলেমদের সম্পর্কে একথাগুলো বলা হচ্ছে। তারা কেবলমাত্র আল্লাহর কালামের অর্থ নিজেদের ইচ্ছা ও পার্থিব স্বার্থ অনুযায়ী পরিবর্তন করেনি বরং এই সংগে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা, জাতীয় ইতিহাস, কল্পনা, আন্দাজ–অনুমান, লৌকিক চিন্তাদর্শন এবং নিজেদের তৈরি করা আইন–কানুনগুলোর বাইবেলের মূল কালামের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। সাধারণ মানুষের সামনে সেগুলোকে তারা এমনভাবে পেশ করেছে যেন সেগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। বাইবেলে স্থান লাভ করেছে এমন প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক কাহিনী, ভাষ্যকারের মনগড়া ব্যাখ্যা, ধর্মতাত্বিক ন্যায়শাস্ত্রবিদের আল্লাহ সম্পর্কিত আকীদা–বিশ্বাস এবং প্রত্যেক আইন শাস্ত্রবিদের উদ্ভাবিত আইন আল্লাহর বাণীর (Word of God) মর্যাদা লাভ করেছে। তার প্রতি ঈমান আনা ও বিশ্বাস স্থাপন করা একান্ত কর্তব্যে পরিণত হয়ে গেছে। তাকে প্রত্যাহার করা ধর্মকে প্রত্যাহার করার নামান্তর বিবেচিত হয়েছে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۚ وَبِالْوَا
لِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ
حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا
مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ
دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ
تَشْهَدُونَ ۝ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا
مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ

১০ রুকূ'

স্মরণ করো যখন ইসরাঈল সন্তানদের থেকে আমরা এই মর্মে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করবে না, মা-বাপ, আত্মীয়-পরিজন, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, লোকদেরকে ভালো কথা বলবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। কিন্তু সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই অংগীকার ভংগ করেছিলে এবং এখনো ভেঙে চলছো। আবার স্মরণ করো, যখন আমরা তোমাদের থেকে মজবুত অংগীকার নিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা পরস্পরের রক্ত প্রবাহিত করবে না এবং একে অন্যকে গৃহ থেকে উচ্ছেদ করবে না। তোমরা এর অংগীকার করেছিলে, তোমরা নিজরাই এর সাক্ষী। কিন্তু আজ সেই তোমরাই নিজেদের ভাই-বেরাদারদেরকে হত্যা করছো, নিজেদের গোত্রীয় সম্পর্কযুক্ত কিছু লোককে বাস্তভিটা ছাড়া করছো, যুলুম ও অত্যধিক বাড়াবাড়ি সহকারে তাদের বিরুদ্ধে দল গঠন করছো এবং তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এলে তাদের মুক্তির জন্য তোমরা মুক্তিপণ আদায় করছো। অথচ তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে উচ্ছেদ করাই তোমাদের জন্য হারাম ছিল।

৯১. এখানে ইহুদি সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি ভুল ধারণার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের আলেম, অ-আলেম, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ এই

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا بِالْءَاخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

তাহলে কি তোমরা কিতাবের একটি অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশের সাথে কুফরী করছো?[৯২] তারপর তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এমনটি করবে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং আখেরাতে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে? তোমাদের কর্মকাণ্ড থেকে আল্লাহ বেখবর নন। এই লোকেরাই আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে। কাজেই তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না।

ভুল ধারণায় লিপ্ত: তারা মনে করতো, আমরা যাই কিছু করি না কেন, আমাদের সাতখুন মাফ, জাহান্নামের আগুন আমাদের ওপর হারাম। কারণ আমরা ইহুদি। আর ধরে নেয়া যাক যদি আমাদের কখনো শাস্তি দেয়াও হয় তাহলেও তা হবে মাত্র কয়েকদিনের। কয়েকদিন জাহান্নামে রেখে তারপর আমাদের জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

৯২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পূর্বে মদীনার আশপাশের ইহুদি গোত্ররা তাদের প্রতিবেশী আরব গোত্রগুলোর (আওস ও খাযরাজ) সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছিল। একটি আরব গোত্র অন্য একটি আরব গোত্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে উভয়ের বন্ধু ইহুদি গোত্র ও নিজেদের বন্ধুদের সাহায্য করতো এবং এভাবে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হতো। ইহুদিদের এ কাজটি তাদের কাছে রক্ষিত আল্লাহর কিতাবের বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থি ছিল। ইহুদিরা এটা জানতো। তারা জেনে বুঝেই এভাবে আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করতো। কিন্তু যুদ্ধের পর একটি ইহুদি গোত্রের লোকেরা অন্য ইহুদি গোত্রের কাছে যুদ্ধবন্দী হয়ে এলে বিজয়ী গোত্রটি মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি দিতো। বিজিত গোত্রের লোকেরা এই মুক্তিপণের অর্থ সরবরাহ করতো। তাদের মুক্তিপণের লেনদেনকে বৈধ গণ্য করার জন্য তারা আল্লাহর কিতাব থেকে দলীল-প্রমাণ পেশ করতো। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে উল্লেখিত মুক্তিপণের বিনিময়ে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেয়ার বিধানটি তারা সাগ্রহে মেনে চলতো কিন্তু পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ না করার বিধানটি মেনে চলতো না।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز وَآتَيْنَا
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَأَيَّدْنٰهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ط أَفَكُلَّمَا
جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوٰى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيقًا
كَذَّبْتُمْ ز وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۝ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ لَعَنَهُمُ
اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ لا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ
كَفَرُوا ج فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهٖ ز فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ ۝

১১ রুকূ'

আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি। তারপর ক্রমাগতভাবে রসূল পাঠিয়েছি। অবশেষে ঈসা ইবনে মারয়ামকে পাঠিয়েছি উজ্জ্বল নিশানী দিয়ে এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছি।[৯৩] এরপর তোমরা এ কেমনতর আচরণ করে চলছো, যখনই কোন রসূল তোমাদের প্রবৃত্তির কামনা বিরোধী কোন জিনিস নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে তখনই তোমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছো, কাউকে মিথ্যা বলেছো এবং কাউকে হত্যা করেছো। তারা বলে, আমাদের হৃদয় সুরক্ষিত।[৯৪] না, আসলে তাদের কুফরীর কারণে তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে, তাই তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে। আর এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে যে একটি কিতাব এসেছে তার সাথে তারা কেমন ব্যবহার করছে? তাদের কাছে আগে থেকেই কিতাবটি ছিল যদিও এটি তার সত্যতা স্বীকার করতো এবং যদিও এর আগমনের পূর্বে তারা নিজেরাই কাফেরদের মোকাবিলায় বিজয় ও সাহায্যের দোয়া চাইতো, তবুও যখন সেই জিনিসটি এসে গেছে এবং তাকে তারা চিনতেও পেরেছে তখন তাকে মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছে।[৯৫] আল্লাহর লানত এই অস্বীকারকারীদের ওপর।

৯৩. 'পবিত্র রূহ' বলতে অহী–জ্ঞান বুঝানো হয়ছে। অহী নিয়ে দুনিয়ায় আগমনকারী জিব্রীলকেও বুঝানো হয়েছে। আবার হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পাক রূহকেও বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ নিজেই তাঁকে পবিত্র গুণাবলীতে ভূষিত করেছিলেন। 'উজ্জ্বল

নিশানী' অর্থ সুস্পষ্ট আলামত ও চিহ্ন, যা দেখে প্রত্যেকটি সত্যপ্রিয় ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর নবী বলে চিনতে পারে।

৯৪. অর্থাৎ আমাদের আকীদা–বিশ্বাস ও চিন্তা এতই পাকাপোক্ত যে, তোমরা যাই কিছু বল না কেন আমাদের মনে তোমাদের কথা কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। যেসব হঠধর্মী লোকের মন–মস্তিষ্ক অজ্ঞতা ও মূর্খতার বিদ্বেষে আচ্ছন্ন থাকে তারাই এ ধরনের কথা বলে। তারা একে মজবুত বিশ্বাস নাম দিয়ে নিজেদের একটি গুণ বলে গণ্য করে। অথচ এটা মানুষের গুণ নয় দোষ। নিজের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আকীদা–বিশ্বাস ও চিন্তার গলদ ও মিথ্যা বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হবার পরও তার ওপর অবিচল থাকার চাইতে বড় দোষ মানুষের আর কি হতে পারে?

৯৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে ইহুদিরা তাদের পূর্ববর্তী নবীগণ যে নবীর আগমন বার্তা শুনিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর জন্য প্রতীক্ষারত ছিল। তারা দোয়া করতো, তিনি যেন অবিলম্বে এসে কাফেরদের প্রাধান্য খতম করে ইহুদি জাতির উন্নতি ও পুনরুত্থানের সূচনা করেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পূর্বে মদীনাবাসীদের প্রতিবেশী ইহুদি সম্প্রদায় নবীর আগমনের আশায় জীবন ধারণ করতো, মদীনাবাসীরা নিজেরাই একথার সাক্ষ্য দেবে। যত্রতত্র যখন তখন তারা বলে বেড়াতো ঃ "ঠিক আছে, এখন প্রাণ ভরে আমাদের ওপর যুলুম করে নাও। কিন্তু যখন সেই নবী আসবেন, আমরা তখন এই যালেমদের সবাইকে দেখে নেবো।" মদীনাবাসীরা এসব কথা আগে থেকেই শুনে আসছিল। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা এবং তাঁর অবস্থা শুনে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো ঃ দেখো, ইহুদিরা যেন তোমাদের পিছিয়ে দিয়ে এই নবীর ধর্ম গ্রহণ করে বাজী জিতে না নেয়। চলো, তাদের আগে আমরাই এ নবীর ওপর ঈমান আনবো। কিন্তু তারা অবাক হয়ে দেখলো, যে ইহুদিরা নবীর আগমন প্রতীক্ষায় দিন গুণছিল, নবীর আগমনের পর তারাই তাঁর সবচেয়ে বড় বিরোধী পক্ষে পরিণত হলো।

'এবং তারা তাকে চিনতেও পেরেছে' বলে যে কথা মূল আয়াতে বলা হয়েছে, তার স্বপক্ষে বহু তথ্য–প্রমাণ সেই যুগেই পাওয়া গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য পেশ করেছেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি নিজে ছিলেন একজন বড় ইহুদি আলেমের মেয়ে এবং আর একজন বড় আলেমের ভাইঝি। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পর আমার বাপ ও চাচা দু'জনই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ তাঁর সাথে কথাবার্তা বলার পর তারা ঘরে ফিরে আসেন। এ সময় আমি নিজের কানে তাদেরকে এভাবে আলাপ করতে শুনি ঃ

চাচা ঃ আমাদের কিতাবে যে নবীর খবর দেয়া হয়েছে ইনি কি সত্যিই সেই নবী?

পিতা ঃ আল্লাহর কসম, ইনিই সেই নবী।

চাচা ঃ এ ব্যাপারে তুমি কি একেবারে নিশ্চিত?

পিতা ঃ হাঁ।

চাচা ঃ তাহলে এখন কি করতে চাও?

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن
يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ
عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا
بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا
وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ
أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُم
مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾

যে জিনিসের সাহায্যে তারা মনের সান্ত্বনা লাভ করে, তা কতই না নিকৃষ্ট![৯৬] সেটি হচ্ছে, আল্লাহ যে হিদায়াত নাযিল করেছেন তারা কেবল এই জিদের বশবর্তী হয়ে তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে যে, আল্লাহ তাঁর যে বান্দাকে চেয়েছেন নিজের অনুগ্রহ (অহী ও রিসালাত) দান করেছেন।[৯৭] কাজেই এখন তারা উপর্যুপরি গযবের অধিকারী হয়েছে। আর এই ধরনের কাফেরদের জন্য চরম লাঞ্ছনার শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তার ওপর ঈমান আনো, তারা বলে, "আমরা কেবল আমাদের এখানে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের মধ্যে) যা কিছু নাযিল হয়েছে তার ওপর ঈমান আনি।" এর বাইরে যা কিছু এসেছে তার প্রতি ঈমান আনতে তারা অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। অথচ তা সত্য এবং তাদের কাছে পূর্ব থেকে যে শিক্ষা ছিল তার সত্যতার স্বীকৃতিও দিচ্ছে। তাদেরকে বলে দাও ঃ যদি তোমরা তোমাদের ওখানে যে শিক্ষা নাযিল হয়েছিল তার ওপর ঈমান এনে থাকো, তাহলে ইতিপূর্বে আল্লাহর নবীদেরকে (যারা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন) হত্যা করেছিলে কেন? তোমাদের কাছে মূসা এসেছিল কেমন সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে। তারপরও তোমরা এমনি যালেম হয়ে গিয়েছিলে যে, সে একটু আড়াল হতেই তোমরা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে বসেছিলে।

পিতা ঃ যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে এর বিরোধিতা করে যাবো। একে সফলকাম হতে দেবো না। (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ আধুনিক সংস্করণ)।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ
قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾ قُلْ إِنْ كَانَتْ
لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ ۚ
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ
بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

তারপর সেই অংগীকারের কথাটাও একবার স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের থেকে নিয়েছিলাম তূর পাহাড়কে তোমাদের ওপর উঠিয়ে রেখে। আমি জোর দিয়েছিলাম, যে পথনির্দেশ আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, দৃঢ়ভাবে তা মেনে চলো এবং মন দিয়ে শুনো। তোমাদের পূর্বসূরীরা বলেছিল, আমরা শুনেছি কিন্তু মানবো না। তাদের বাতিলপ্রিয়তা ও অন্যায় প্রবণতার কারণে তাদের হৃদয় প্রদেশে বাছুরই অবস্থান গেড়ে বসেছিল। যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো, তাহলে এ কেমন ঈমান, যা তোমাদেরকে এহেন খারাপ কাজের নির্দেশ দেয়?

তাদেরকে বলো, যদি সত্যিসত্যিই আল্লাহ সমগ্র মানবতাকে বাদ দিয়ে একমাত্র তোমাদের জন্য আখেরাতের ঘর নির্দিষ্ট করে থাকেন, তাহলে তো তোমাদের মৃত্যু কামনা করা উচিত[৯৮]—যদি তোমাদের এই ধারণায় তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তারা কখনো এটা কামনা করবে না। কারণ তারা স্বহস্তে যা কিছু উপার্জন করে সেখানে পাঠিয়েছে তার স্বাভাবিক দাবী এটিই (অর্থাৎ তারা সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে না)। আল্লাহ ঐ সব যালেমদের অবস্থা ভালোভাবেই জানেন। বেঁচে থাকার ব্যাপারে তোমরা তাদেরকে পাবে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে লোভী।[৯৯] এমনকি এ ব্যাপারে তারা মুশরিকদের চাইতেও এগিয়ে রয়েছে। এদের প্রত্যেকে চায় কোনক্রমে সে যেন হাজার বছর বাঁচতে পারে, অথচ দীর্ঘ জীবন কোন অবস্থায়ই তাকে আযাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। যে ধরনের কাজ এরা করছে আল্লাহ তার সবই দেখছেন।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾

১২ রুকূ

ওদেরকে বলে দাও, যে ব্যক্তি জিব্রীলের সাথে শত্রুতা করে[১০০] তার জেনে রাখা উচিত, জিব্রীল আল্লাহরই হুকুমে এই কুরআন তোমার দিলে অবতীর্ণ করেছে[১০১] এটি পূর্বে আগত কিতাবগুলোর সত্যতা স্বীকার করে ও তাদের প্রতি সমর্থন যোগায়[১০২] এবং ঈমানদারদের জন্য পথনির্দেশনা ও সাফল্যের বার্তাবাহী।[১০৩] (যদি এই কারণে তারা জিব্রীলের প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করে থাকে তাহলে তাদেরকে বলে দাও) যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা, তাঁর রসূলগণ, জিব্রীল ও মীকাইলের শত্রু আল্লাহ সেই কাফেরদের শত্রু।

৯৬. এই আয়াতটির দ্বিতীয় একটি অনুবাদও হতে পারে। সেটি হচ্ছে ঃ "যতই না নিকৃষ্ট সেটি, যার জন্য তারা নিজেদের জীবন বিক্রি করে দিয়েছে। অর্থাৎ নিজেদের কল্যাণ, শুভ পরিণতি ও পরকালীন নাজাতকে কুরবানী করে দিয়েছে।"

৯৭. তারা চাচ্ছিল, ঐ নবী তাদের ইসরাঈল বংশের মধ্যে জন্ম নেবে। কিন্তু যখন তিনি বনী ইসরাঈলের বাইরে এমন এক বংশে জন্মগ্রহণ করলেন, যাদেরকে তারা নিজেদের মোকাবিলায় তুচ্ছ–জ্ঞান করতো, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করতে উদ্যত হলো। অর্থাৎ তারা যেন বলতে চাচ্ছিল, আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নবী পাঠালেন না কেন? যখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস না করে যাকে ইচ্ছা তাকে নবী বানিয়ে পাঠালেন তখন তারা বেঁকে বসলো।

৯৮. ইহুদিদের দুনিয়া প্রীতির প্রতি এটি সূক্ষ্ম বিদ্রূপ বিশেষ। আখেরাতের জীবন সম্পর্কে যারা সচেতন এবং আখেরাতের জীবনের সাথে যাদের সত্যিই কোন মানসিক সংযোগ থাকে তারা কখনো পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু ইহুদিদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল এবং এখনো আছে।

৯৯. কুরআনের মূল শব্দে এখানে 'আলা হায়াতিন' বলা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, কোন না কোনভাবে বেঁচে থাকা, তা যে কোন ধরনের বেঁচে থাকা হোক না কেন, সম্মানের ও মর্যাদার বা হীনতার, দীনতার, লাঞ্ছনা–অবমাননার জীবনই হোক না কেন তার প্রতিই তাদের লোভ।

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

আমি তোমার প্রতি এমন সব আয়াত নাযিল করেছি যেগুলো দ্ব্যর্থহীন সত্যের প্রকাশে সমুজ্জ্বল। একমাত্র ফাসেক গোষ্ঠী ছাড়া আর কেউ তার অনুগামিতায় অস্বীকৃতি জানায়নি। যখনই তারা কোন অংগীকার করেছে তখনই কি তাদের কোন না কোন উপদল নিশ্চিতরূপেই তার বুড়ো আঙুল দেখায়নি। বরং তাদের অধিকাংশই সাচ্চা দিলে ঈমান আনে না। আর যখনই তাদের কাছে পূর্ব থেকে রক্ষিত কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে ও তার প্রতি সমর্থন দিয়ে কোন রসূল এসেছে তখনই এই আহলি কিতাবদের একটি উপদল আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে পেছনে ঠেলে দিয়েছে যেন তারা কিছু জানেই না।

১০০. ইহুদিরা কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকেই গালাগালি দিতো না বরং তারা আল্লাহর প্রিয় মহান ফেরেশতা জিব্রীলকেও গালাগালি দিতো এবং বলতো ঃ সে আমাদের শত্রু। সে রহমতের নয়, আযাবের ফেরেশতা।

১০১. অর্থাৎ এ জন্যই তোমাদের গালমন্দ জিব্রীলের ওপর নয়, আল্লাহর মহান সত্তার ওপর আরোপিত হয়।

১০২. এর অর্থ হচ্ছে, জিব্রীল এ কুরআন মজীদ বহন করে এনেছেন বলেই তোমরা এ গালাগালি করছো। অথচ কুরআন সরাসরি তাওরাতকে সমর্থন যোগাচ্ছে। কাজেই তোমাদের গালিগালাজ তাওরাতের বিরুদ্ধেও উচ্চারিত হয়েছে।

১০৩. এখানে একটি বিশেষ বিষয়বস্তুর প্রতি সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে ঃ ওহে নির্বোধের দল! তোমাদের সমস্ত অসন্তুষ্টি হচ্ছে হিদায়াত ও সত্য–সহজ পথের বিরুদ্ধে। তোমরা লড়ছো সঠিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। অথচ এই সঠিক ও নির্ভুল নেতৃত্বকে সহজভাবে মেনে নিলে তা তোমাদের জন্য সাফল্যের সুসংবাদ বহন করে আনতো।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ
وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ
عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى
يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ
بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۗ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ
وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ
مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۗ
لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾

আর এই সংগে তারা এমন সব জিনিসের অনুসরণ করাতে মেতে ওঠে, যেগুলো শয়তানরা পেশ করতো সুলাইমানী রাজত্বের নামে।[১০৪] অথচ সুলাইমান কোন দিন কুফরী করেনি। কুফরী করেছে সেই শয়তানরা, যারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো। তারা ব্যাবিলনে দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা আয়ত্ব করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। অথচ তারা (ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এর শিক্ষা দিতো, তাকে পরিষ্কার ভাষায় এই বলে সতর্ক করে দিতো ঃ দেখো, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তুমি কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না।[১০৫] এরপরও তারা তাদের থেকে এমন জিনিস শিখতো, যা স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এনে দিতো।[১০৬] একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহর হুকুম ছাড়া এ উপায়ে তারা কাউকেও ক্ষতি করতে পারতো না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিখতো যা তাদের নিজেদের জন্য লাভজনক ছিল না বরং ছিল ক্ষতিকর। তারা ভালো করেই জানতো, এর ক্রেতার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। কতই না নিকৃষ্ট জিনিসের বিনিময়ে তারা বিকিয়ে দিল নিজেদের জীবন! হায়, যদি তারা একথা জানতো! যদি তারা ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান লাভ করতো এটি তাদের জন্য হোত বেশী ভালো। হায়, যদি তারা একথা জানতো।

১০৪. শয়তানরা বলতে জ্বিন্ন জাতি ও মানবজাতি উভয়ের অন্তরভূক্ত শয়তান হতে পারে। এখানে উভয়ের কথাই বলা হয়েছে। বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যখন নৈতিক ও বস্তুগত পতন সূচিত হলো, গোলামি, মূর্খতা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ও হীনতা যখন তাদের সমস্ত জাতিগত উচ্চ মনোবল ও উচ্চাকাংখার বিলোপ সাধন করলো তখন যাদু–টোনা, তাবীজ–তুমার, টোটকা ইত্যাদির প্রতি তারা আকৃষ্ট হতে থাকলো বেশী করে। তারা এমন সব পন্থার অনুসন্ধান করতে লাগলো যাতে কোন প্রকার পরিশ্রম ও সংগ্রাম–সাধন ছাড়াই নিছক ঝাড়–ফুঁক তন্ত্রমন্ত্রের জোরে বাজীমাত করা যায়। তখন শয়তানরা তাদেরকে প্ররোচনা দিতে লাগলো। তাদেরকে বুঝাতে থাকলো যে, সুলাইমান আলাইহিস সালামের বিশাল রাজত্ব এবং তাঁর বিস্ময়কর ক্ষমতা তো আসলে কিছু মন্ত্র–তন্ত্র ও কয়েকটা আঁচড়, নকশা তথা তাবীজের ফল। শয়তানরা তাদেরকে সেগুলো শিখিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিল। বনী ইসরাঈলরা অপ্রত্যাশিত মহামূল্যবান সম্পদ মনে করে এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফলে আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ ও আকর্ষণ থাকলো না এবং কোন সত্যের আহবায়কের আওয়াজ তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো না।

১০৫. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আমি যা কিছু বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র বনী ইসরাঈল জাতি যে সময় ব্যাবিলনে বন্দী ও গোলামির জীবন যাপন করছিল, আল্লাহ তখন তাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে দু'জন ফেরেশতাকে মানুষের বেশে তাদের কাছে হয়তো পাঠিয়ে থাকবেন। লূত জাতির কাছে যেমন ফেরেশতারা গিয়েছিলেন সুদর্শন বালকের বেশ ধারণ করে তেমনি বনী ইসরাঈলদের কাছে তারা হয়তো পীর ও ফকীরের ছদ্মবেশে হাযির হয়ে থাকবে। সেখানে একদিকে তারা নিজেদের যাদুর দোকান সাজিয়ে বসে থাকতেন আর অন্যদিকে লোকদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিতেন ঃ দেখো, আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। কাজেই নিজেদের পরকাল নষ্ট করো না। কিন্তু তাদের এই সতর্কবাণী ও সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও লোকেরা তাদের দেয়া ঝাড়–ফুঁক ও তাবীজ–তুমারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ফেরেশতাদের মানুষের আকার ধারণ করে মানুষের মধ্যে কাজ করার ব্যাপারটায় অবাক হবার কিছুই নেই। তারা আল্লাহর সাম্রাজ্যের কর্মচারী। নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য যে সময় যে আকৃতি ধারণ করার প্রয়োজন হয় তারা তাই করেন। এখনই এ মুহূর্তে আমাদের চারদিকে কতজন ফেরেশতা মানুষের আকার ধরে এসে কাজ করে যাচ্ছেন তার কতটুকু খবরই বা আমরা রাখি। তবে ফেরেশতাদের এমন একটা কাজ শেখাবার দায়িত্ব নেয়া, যা মূলত খারাপ, এর অর্থ কি? এটা বুঝার জন্য এ ক্ষেত্রে এমন একটি পুলিশের দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে যে পুলিশের পোশাক ছেড়ে সাধারণ নাগরিকের পোশাক পরে কোন ঘুষখোর প্রশাসকের কাছে হাযির হয় তার ঘুষখোরীর প্রমাণ সংগ্রহের জন্য। একটি নোটের গায়ে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে সে ঘুষ হিসেবে প্রশাসককে দেয়, যাতে ঘুষ নেয়ার সময় হাতেনাতে তাকে ধরতে পারে এবং তার পক্ষে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার কোন অবকাশই না থাকে।

১০৬. অর্থাৎ সেই বাজারে সবচেয়ে বেশী চাহিদা ছিল এমন তাবীজের যার সাহায্যে এক ব্যক্তি অন্য একজনের স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নিজের প্রতি

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٥﴾

১৩ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ![১০৭] 'রাইনা' বলো না বরং 'উনযুরনা' বলো এবং মনোযোগ সহকারে কথা শোনো।[১০৮] এই কাফেররা তো যন্ত্রণাদায়ক আযাব লাভের উপযুক্ত।

আহলি কিতাব বা মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা সত্যের দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তারা কখনোই তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর কোন কল্যাণ নাযিল হওয়া পছন্দ করে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান নিজের রহমত দানের জন্য বাছাই করে নেন এবং তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

প্রেমাসক্ত করতে পারে। তাদের মধ্যে যে নৈতিক পতন দেখা দিয়েছিল এটি ছিল তার নিকৃষ্টতম পর্যায়। যে জাতির সদস্যবৃন্দ পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হওয়া ও অন্যের বিয়ে করা বউকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়াকে নিজেদের সবচেয়ে বড় বিজয় মনে করে এবং এটিই তাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্বাধিক আকর্ষণীয় কাজে পরিণত হয়, তার নৈতিক অধপতন যে ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে গেছে তা নিসন্দেহে বলা যেতে পারে।

আসলে দাম্পত্য সম্পর্ক হচ্ছে মানব সভ্যতা–সংস্কৃতির মূল। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সুস্থতার ওপর সমগ্র মানব সভ্যতার সুস্থতা এবং এর অসুস্থতার ওপর সমগ্র মানব সভ্যতার অসুস্থতা নির্ভরশীল। কাজেই যে বৃক্ষটির দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ থাকার ওপর ব্যক্তির ও সমগ্র সমাজের টিকে থাকা নির্ভর করে তার মূলে যে ব্যক্তি কুঠারঘাত করে তার চাইতে নিকৃষ্ট বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আর কে হতে পারে? হাদীসে বলা হয়েছে, ইবলিস তার কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর প্রত্যেক এলাকায় নিজের এজেন্ট পাঠায়। এজেন্টরা কাজ শেষে ফিরে এসে নিজেদের কাজের নিপোর্ট শুনাতে থাকে। কেউ বলে আমি অমুক ফিতনা সৃষ্টি করেছি। কেউ বলে, আমি অমুক পাপের আয়োজন করেছি। কিন্তু ইবলিস প্রত্যেককে বলে যেতে থাকে, তুমি কিছুই করোনি। তারপর একজন এসে বলে, আমি এক জোড়া স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এসেছি। একথা শুনে ইবলিস তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সে বলতে থাকে, তুমি একটা কাজের মতো কাজ করে এসেছো। এ হাদীসটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে বনী ইসরাঈলদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল তাদের কেন যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার 'আমল'

লোকদেরকে শিখাবার হুকুম দেয়া হয়েছিল তা সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করা যায়। আসলে তাদের নৈতিক অধপতনের যথাযথ পরিমাপের জন্য এটিই ছিল একমাত্র মানদণ্ড।

১০৭. এ রুকূ'তে এবং পরবর্তী রুকূ'গুলোতে ইহুদিদের পক্ষ থেকে ইসলাম ও ইসলামী দলের বিরুদ্ধে যেসব অনিষ্টকর কাজ করা হচ্ছিল সে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তারা মুসলমানদের মনে যে সমস্ত সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল এখানে সেগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের সাথে ইহুদিদের আলাপ-আলোচনায় যেসব বিশেষ বিশেষ প্রসংগ উত্থাপিত হতো, সেগুলোও এখানে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসংগে এ বিষয়টিও সামনে থাকা উচিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পর যখন শহরের আশপাশের এলাকায় ইসলামের দাওয়াত বিস্তার লাভ করতে থাকলো। তখন ইহুদিরা বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় বিতর্কে টেনে আনার চেষ্টা করতে থাকলো। তাদের তিলকে তাল করার, অতি গুরুত্বহীন বিষয়কে বিরাট গুরুত্ব দেয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা করার, সন্দেহ-সংশয়ের বীজ বপন করার ও প্রশ্নের মধ্য থেকে প্রশ্ন বের করার মারাত্মক রোগটি এসব সরলমনা লোকদের মনেও তারা সঞ্চারিত করতে চাচ্ছিল। এমন কি তারা নিজেরাও সশরীরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে এসে প্রতারণামূলক কথাবার্তা বলে নিজেদের নীচ মনোবৃত্তির প্রমাণ পেশ করতো।

১০৮. ইহুদিরা কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে এলে অভিবাদন, সম্ভাষণ ও কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে নিজেদের মনের ঝাল মিটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতো। দ্ব্যর্থবোধক শব্দ বলা, উচ্চস্বরে কিছু বলা এবং অনুচ্চস্বরে অন্য কিছু বলা, বাহ্যিক ভদ্রতা ও আদব-কায়দা মেনে চলে পর্দান্তরালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননা ও অপমান করার কোন কসরতই তারা বাকি রাখতো না। পরবর্তী পর্যায়ে কুরআনে এর বহু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে মুসলমানদেরকে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ শব্দটি বহু অর্থবোধক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলোচনার সময় ইহুদিদের যখন একথা বলার প্রয়োজন হতো যে, থামুন বা 'কথাটি আমাদের একটু বুঝে নিতে দিন' তখন তারা 'রাইনা' বলতো। এ শব্দটির বাহ্যিক অর্থ ছিল, 'আমাদের একটু সুযোগ দিন' বা 'আমাদের কথা শুনুন।' কিন্তু এর আরো কয়েকটি সম্ভাব্য অর্থও ছিল। যেমন হিব্রু ভাষায় অনুরূপ যে শব্দটি ছিল তার অর্থ ছিল ঃ 'শোন, তুই বধির হয়ে যা।' আরবী ভাষায়ও এর একটি অর্থ ছিল, 'মূর্খ ও নির্বোধ'। আলোচনার মাঝখানে এমন সময় শব্দটি প্রয়োগ করা হতো যখন এর অর্থ দাঁড়াতো, তোমরা আমাদের কথা শুনলে আমরাও তোমাদের কথা শুনবো। আবার মুখটাকে একটু বড় করে 'রা-ঈয়ানা' (راعينا) ও বলার চেষ্টা করা হতো। এর অর্থ দাঁড়াতো 'ওহে, আমাদের রাখাল!' তাই মুসলমানদের হুকুম দেয়া হয়েছে, তোমরা এ শব্দটি ব্যবহার না করে বরং 'উনযুরনা' বলো। এর অর্থ হয়, 'আমাদের দিকে দেখুন' 'আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন' অথবা 'আমাদের একটু বুঝতে দিন।' এরপর আবার বলা হয়েছে, 'মনোযোগ সহকারে কথা শোনো।' অর্থাৎ ইহুদিদের একথা বার বার বলার প্রয়োজন হয়। কারণ তারা নবীর কথার প্রতি আগ্রহী হয় না এবং তাঁর

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ
اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۰۶﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۰۷﴾
اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ
يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿۱۰۸﴾ وَدَّ كَثِيْرٌ
مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۖۚ حَسَدًا
مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا
وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۰۹﴾

আমি যে আয়াতকে 'মানসুখ' করি বা ভুলিয়ে দেই, তার জায়গায় আনি তার চাইতে ভালো অথবা কমপক্ষে ঠিক তেমনটিই।[১০৯] তুমি কি জানো না, আল্লাহ সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাশালী? তুমি কি জানো না, পৃথিবী ও আকাশের শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর? আর তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।

তাহলে তোমরা কি তোমাদের রসূলের কাছে সেই ধরনের প্রশ্ন ও দাবী করতে চাও যেমন এর আগে মূসার কাছে করা হয়েছিল?[১১০] অথচ যে ব্যক্তি ঈমানী নীতিকে কুফরী নীতিতে পরিবর্তিত করেছে, সে-ই সত্য-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আহ্‌লি কিতাবদের অধিকাংশই তোমাদেরকে কোনক্রমে ঈমান থেকে আবার কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিতে চায়। যদিও হক তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে তবুও নিজেদের হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণে এটিই তাদের কামনা। এর জবাবে তোমরা ক্ষমা ও উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করো।[১১১] যতক্ষণ না আল্লাহ নিজেই এর কোন ফায়সালা করে দেন। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশালী।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾ بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٢﴾

নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও। নিজেদের পরকালের জন্য তোমরা যা কিছু সৎকাজ করে আগে পাঠিয়ে দেবে, তা সবই আল্লাহর ওখানে মজুত পাবে। তোমরা যা কিছু করো সবই আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে।

তারা বলে, কোন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যে পর্যন্ত না সে ইহুদি হয় অথবা (খৃষ্টানদের ধারণামতে) খৃষ্টান হয়। এগুলো হচ্ছে তাদের আকাংখা।[১১২] তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের প্রমাণ আনো, যদি নিজেদের দাবীর ব্যাপারে তোমরা সত্যবাদী হও। (আসলে তোমাদের বা অন্য কারোর কোন বিশেষত্ব নেই।) সত্য বলতে কি যে ব্যক্তিই নিজের সত্ত্বাকে আল্লাহর আনুগত্যে সোপর্দ করবে এবং কার্যত সৎপথে চলবে, তার জন্য তার রবের কাছে আছে এর প্রতিদান। আর এই ধরনের লোকদের জন্য কোন ভয় বা মর্মবেদনার অবকাশ নেই।

কথা বলার মাঝখানে তারা নিজেদের চিন্তাজালে বার বার জড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু তোমাদের তো মনোযোগ সহকার নবীর কথা শুনতে হবে। কাজেই এ ধরনের ব্যবহার করার প্রয়োজনই তোমাদের দেখা দেবে না।

১০৯. ইহুদিরা মুসলমানদের মনে যেসব সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাতো তার মধ্য থেকে একটি বিশেষ সন্দেহের জবাব এখানে দেয়া হয়েছে। তাদের অভিযোগ ছিল, পূর্ববর্তী কিতাবগুলো যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থেকে থাকে এবং এ কুরআনও আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাহলে ঐ কিতাবগুলোর কতিপয় বিধানের জায়গায় এখানে ভিন্নতর বিধান দেয়া হয়েছে কেন? একই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিধান কেমন করে হতে পারে? আবার তোমাদের কুরআন এ দাবী উত্থাপন করেছে যে, ইহুদিরা ও খৃষ্টানরা তাদেরকে প্রদত্ত এ শিক্ষার একটি অংশ ভুলে গেছে। আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা হাফেজদের মন থেকে কেমন করে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে? সঠিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তারা এসব কথা বলতো না। বরং কুরআনের আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে মুসলমানদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তারা এগুলো বলতো। এর জবাবে আল্লাহ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

১৪ রুকূ'

ইহুদিরা বলে, খৃষ্টানদের কাছে কিছুই নেই। খৃষ্টানরা বলে ইহুদিদের কাছে কিছুই নেই। অথচ তারা উভয়ই কিতাব পড়ে। আর যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান নেই তারাও এ ধরনের কথা বলে থাকে।[১১৩] এরা যে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ এর চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবেন।

বলেছেন ঃ আমি মালিক। আমার ক্ষমতা সীমাহীন। আমি নিজের ইচ্ছে মতো যে কোন বিধান 'মান্‌সুখ' বা রহিত করে দেই এবং যে কোন বিধানকে হাফেজদের মন থেকে মুছে ফেলি। কিন্তু যে জিনিসটি আমি 'মান্‌সুখ' করি তার জায়গায় তার চেয়ে ভালো জিনিস আনি অথবা কমপক্ষে সেই জিনসটি নিজের জায়গায় আগেরটির মতই উপযোগী ও উপকারী হয়।

১১০. ইহুদিরা তিলকে তাল করে এবং সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা করে মুসলমানদের সামনে নানা ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করতো। তোমাদের নবীর কাছে এটা জিজ্ঞেস করো ওটা জিজ্ঞেস করো বলে তারা মুসলমানদের উস্কানী দিতো। তাই এ ব্যাপারে আল্লাহ মুসলমানদেরকে ইহুদিদের নীতি অবলম্বন করা থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করে দিচ্ছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ ব্যাপারে মুসলমানদেকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলতেন, অনর্থক প্রশ্ন করা এবং তিলকে তাল করার কারণে পূর্ববর্তী উম্মাতরা ধ্বংস হয়েছে, কাজেই তোমরা এ পথে পা দিয়ো না। আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেননি সেগুলোর পেছনে জোঁকের মতো লেগে থেকো না। তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা মেনে চলো এবং যে বিষয়গুলো থেকে নিষেধ করা হয় সেগুলো করো না। অপ্রয়োজনীয় কথা বাদ দিয়ে কাজের কথার প্রতি মনোযোগ দাও।

১১১. অর্থাৎ ওদের হিংসা ও বিদ্বেষ দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ো না। নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলো না। এদের সাথে তর্ক–বিতর্ক ও ঝগড়া করে নিজের মূল্যবান সময় ও মর্যাদা নষ্ট করো না। ধৈর্যসহকারে দেখতে থাকো আল্লাহ কি করেন। অনর্থক আজেবাজে কাজে নিজের শক্তি ক্ষয় না করে আল্লাহর যিকির ও সৎকাজে সময় ব্যয় করো। এগুলোই আল্লাহর ওখানে কাজে লাগবে। বিপরীত পক্ষে ঐ বাজে কাজগুলোর আল্লাহর ওখানে কোন মূল্য নেই।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى
فِيْ خَرَابِهَا ۚ أُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَّدْخُلُوْهَآ إِلَّا خَآئِفِيْنَ ۚ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلّٰهِ
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ
وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

আর তার চাইতে বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহর ঘরে তাঁর নাম স্মরণ করা থেকে মানুষকে বাধা দেয় এবং সেগুলো ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়? এই ধরনের লোকেরা এসব ইবাদাতগৃহে প্রবেশের যোগ্যতা রাখে না আর যদি কখনো প্রবেশ করে, তাহলে ভীত–সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারে।[১১৪] তাদের জন্য রয়েছে এ দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে বিরাট শাস্তি।

পূর্ব ও পশ্চিম সব আল্লাহর। তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান।[১১৫] আল্লাহ বড়ই ব্যাপকতার অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জ্ঞাত।[১১৬]

১১২. আসলে এটা নিছক তাদের অন্তরের বাসনা এবং আকাংখা মাত্র। কিন্তু তারা এটাকে এমনভাবে বর্ণনা করছে যেন সত্যি সত্যিই এমনটি ঘটবে।

১১৩. অর্থাৎ আরবের মুশরিকরা।

১১৪. অর্থাৎ ইবাদাতগৃহগুলো এ ধরনের যালেমদের কর্তৃত্বে ও পরিচালনাধীনে থাকার এবং তারা এর রক্ষণাবেক্ষণকারী হবার পরিবর্তে শাসন কর্তৃত্ব থাকা উচিত আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর প্রতি অনুগত এমন সব লোকদের হাতে আর তারাই হবে ইবাদাতগৃহগুলোর রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাহলে এ দুষ্কৃতিকারীরা সেখানে গেলেও কোন দুষ্কর্ম করার সাহস করবে না। কারণ তারা জানবে, সেখানে গিয়ে কোন দুষ্কর্ম করলে শাস্তি পেতে হবে। এখানে মক্কার কাফেরদের যুলুমের প্রতিও সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে। তাদের নিজেদের জাতির যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা তাদেরকে আল্লাহর ঘরে ইবাদাত করতে বাধা দিয়েছিল।

১১৫. অর্থাৎ আল্লাহ পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। তিনি সকল দিকের ও সকল স্থানের মালিক। কিন্তু নিজে কোন স্থানের পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই। কাজেই তাঁর ইবাদাতের জন্য কোন দিক বা স্থান নির্দিষ্ট করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ সেদিকে বা সে স্থানে

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۹﴾

তারা বলে, আল্লাহ কাউকে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ পবিত্র এসব কথা থেকে। আসলে পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত জিনিসই তাঁর মালিকানাধীন, সবকিছুই তাঁর নির্দেশের অনুগত। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি যে বিষয়েরই সিদ্ধান্ত নেন সে সম্পর্কে কেবলমাত্র হুকুম দেন 'হও', তাহলেই তা হয়ে যায়।

অজ্ঞ লোকেরা বলে, আল্লাহ নিজে আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন অথবা কোন নিশানী আমাদের কাছে আসে না কেন?[১১৭] এদের আগের লোকেরাও এমনি ধারা কথা বলতো। এদের সবার (আগের ও পরের পথভ্রষ্টদের) মানসিকতা একই।[১১৮] দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আমরা নিশানীসমূহ সুস্পষ্ট করে দিয়েছি।[১১৯] (এর চাইতে বড় নিশানী আর কি হতে পারে যে) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সত্য জ্ঞান সহকারে সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে।[১২০] যারা জাহান্নামের সাথে সম্পর্ক জুড়েছে তাদের জন্য তুমি দায়ী নও এবং তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

থাকেন। কাজেই ইতিপূর্বে তোমরা ওখানে বা ঐ দিকে ফিরে ইবাদাত করতে আর এখন সেই জায়গা বা দিক পরিবর্তন করলে কেন—একথা নিয়ে ঝগড়া বা বিতর্ক করার কোন অবকাশ নেই।

১১৬. অর্থাৎ মহান আল্লাহ সীমাবদ্ধ নন। তিনি সংকীর্ণ মন, সংকীর্ণ দৃষ্টি ও সংকীর্ণ হাতের অধিকারী নন। অথচ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের মতো ভেবে এ রকম মনে করে রেখেছো। বরং তাঁর খোদায়ী কর্তৃত্ব বিশাল-বিস্তৃত এবং তাঁর দৃষ্টিকোণ ও অনুগ্রহ দানের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। তাঁর কোন্ বান্দা কোথায় কোন্ সময় কি উদ্দেশ্যে তাঁকে স্মরণ করছে—একথাও তিনি জানেন।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٢٠﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ۚ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٢١﴾

ইহুদি ও খৃষ্টানরা তোমার প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের পথে চলতে থাকো।[১২১] পরিষ্কার বলে দাও, পথ মাত্র একটিই, যা আল্লাহ বাতলে দিয়েছেন। অন্যথায় তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তারপরও যদি তুমি তাদের ইচ্ছা ও বাসনা অনুযায়ী চলতে থাকো, তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষাকারী তোমার কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না। যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে যথাযথভাবে পাঠ করে। তারা তার ওপর সাচ্চা দিলে ঈমান আনে। আর যারা তার সাথে কুফরীর নীতি অবলম্বন করে তারাই আসলে ক্ষতিগ্রস্ত।

১১৭. তারা বলতে চাচ্ছিল, আল্লাহ নিজে তাদের সামনে এসে বলবেন ঃ এই ধরো আমার কিতাব আর এ আমার বিধান, তোমরা এর অনুসারী হও। অথবা তাদেরকে এমন কোন নিশানী দেখানো হবে যা দেখে তারা নিশ্চিন্তভাবে বিশ্বাস করতে পারবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলছেন আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলছেন।

১১৮. অর্থাৎ আজকের পথভ্রষ্টরা এমন কোন অভিযোগ ও দাবী উত্থাপন করেনি, যা এর আগে পথভ্রষ্টরা করেনি। প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পথভ্রষ্টতার প্রকৃতি অপরিবর্তিত রয়েছে। বার বার একই ধরনের সংশয়, সন্দেহ, অভিযোগ ও প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিই সে করে চলছে।

১১৯. "আল্লাহ নিজে এসে আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন?"—এ অভিযোগটি এতবেশী অর্থহীন ছিল যে, এর জবাব দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। আমাদের নিশানী দেখানো হয় না কেন?—শুধুমাত্র এ প্রশ্নটির জবাব দেয়া হয়েছে। এর জবাবে বলা হয়েছে, নিশানী তো রয়েছে অসংখ্য কিন্তু যে ব্যক্তি মানতেই চায় না তাকে কোন্ নিশানীটা দেখানো যায়?

১২০. অর্থাৎ অন্যান্য নিশানী আর কি দেখবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের ব্যক্তিত্বই সবচেয়ে বড় ও উজ্জ্বল নিশানী। তাঁর নবুওয়াত লাভের পূর্বের অবস্থা, যে দেশের ও জাতির মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিল তার অবস্থা এবং যে অবস্থার মধ্যে তিনি লালিত–পালিত হন ও চল্লিশ বছর জীবন যাপন করেন তারপর নবুওয়াত লাভ করে

يَبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿١٢٢﴾

১৫ রুকূ'

হে বনী[১২৩] ইসরাঈল! তোমাদের আমি যে নিয়ামত দান করেছিলাম এবং বিশ্বের জাতিদের ওপর তোমাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম তার কথা স্মরণ করো।

মহান ও বিস্ময়কর কার্যাবলী সম্পাদন করেন—এসব কিছুই এমন একটি উজ্জ্বল নিশানী হিসেবে চিহ্নিত যে, এর পরে আর কোন নিশানীর প্রয়োজনই হয় না।

১২১. এর অর্থ হচ্ছে, তাদের অসন্তুষ্টির কারণ এ নয় যে, তারা যথার্থই সত্যসন্ধানী এবং তুমি সত্যকে তাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরোনি। বরং তোমার প্রতি তাদের অসন্তুষ্টির কারণ হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহর নিদর্শনসমূহ ও তাঁর দীনের সাথে তাদের মতো মুনাফিকসূলভ ও প্রতারণামূলক আচরণ করছো না কেন? আল্লাহ–পূজার ছদ্মবেশে তারা যেমন আত্মপূজা করে যাচ্ছে তুমি তেমন করছো না কেন? দীনের মূলনীতি ও বিধানসমূহের নিজের চিন্তা–ধারণা–কল্পনা এবং নিজের ইচ্ছা–কামনা–বাসনা অনুযায়ী পরিবর্তিত করার ব্যাপারে তাদের মতো দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছো না কেন? তাদের মতো প্রদর্শনীমূলক আচরণ, ছল–চাতুরী ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছো না কেন? কাজেই তাদেরকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা ছেড়ে দাও। কারণ যতদিন তুমি নিজে তাদের রঙে রঞ্জিত হয়ে তাদের স্বভাব আচরণ গ্রহণ করবে না, নিজেদের ধর্মের সাথে তারা যে আচরণ করে যতদিন তুমি তোমার দীনের সাথে অনুরূপ আচরণ করবে না এবং যতদিন তুমি ধর্মীয় আকীদা–বিশ্বাস ও কর্মের ব্যাপারে তাদের মতো ভ্রষ্টনীতি অবলম্বন করবে না, ততদিন পর্যন্ত তারা কোনক্রমেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।

১২২. এখানে আহ্‌লি কিতাবদের অন্তরগত সৎলোকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তারা সততা ও দায়িত্বশীলতার সাথে আল্লাহর কিতাব পড়ে। তাই আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে যা সত্য তাকেই তারা সত্য বলে মেনে নেয়।

১২৩. এখান থেকে আর একটি ধারাবাহিক ভাষণ শুরু হচ্ছে। এখানে পরিবেশিত বক্তব্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন।

এক ঃ হযরত নূহের পরে হযরত ইবরাহীম প্রথম বিশ্বজনীন নবী। মহান আল্লাহ তাঁকে ইসলামের বিশ্বজনীন দাওয়াত ছড়াবার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রথমে তিনি নিজে সশরীরে ইরাক থেকে মিসর পর্যন্ত এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তীন থেকে নিয়ে আরবের মরু অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান পর্যন্ত বছরের পর বছর সফর করে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের (অর্থাৎ ইসলাম) দিকে আহবান করতে থাকেন। অতপর এই মিশন সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। পূর্ব জর্দানে নিজের ভাতিজা হযরত লূতকে

নিযুক্ত করেন। সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে নিযুক্ত করেন নিজের ছেলে হযরত ইসহাককে এবং আরবের অভ্যন্তরে নিযুক্ত করেন নিজের বড় ছেলে হযরত ইসমাঈলকে। তারপর মহান আল্লাহর নির্দেশে মক্কায় কা'বাগৃহ নির্মাণ করেন এবং আল্লাহর নির্দেশ মতো এটিকেই এই মিশনের কেন্দ্র গণ্য করেন।

দুই ঃ হযরত ইবরাহীমের বংশধারা দু'টি বড় বড় শাখায় বিভক্ত হয়। একটি শাখা হচ্ছে, হযরত ইসমাঈলের সন্তান-সন্ততিবর্গ। এরা আরবে বসবাস করতো। কুরাইশ ও আরবের আরো কতিপয় গোত্র এরি অন্তরভুক্ত ছিল। আর যেসব আরব গোত্র বংশগত দিক দিয়ে হযরত ইসমাঈলের সন্তান ছিল না তারাও তাঁর প্রচারিত ধর্মে কমবেশী প্রভাবিত ছিল বলেই তাঁর সাথেই নিজেদের সম্পর্ক জুড়তো। দ্বিতীয় শাখাটি ছিল হযরত ইসহাকের সন্তানবর্গের। এই শাখায় হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ, হযরত মূসা, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান, হযরত ইয়াহ্ইয়া, হযরত ঈসা প্রমুখ অসংখ্য নবী জন্মগ্রহণ করেন। আর ইতিপূর্বে বলেছি, যেহেতু হযরত ইয়াকুবের আর এক নাম ছিল ইসরাঈল, তাই তাঁর বংশ বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত হয়। তাঁর প্রচার অভিযানের ফলে যেসব জাতি তাঁর দীন গ্রহণ করে তারা তার মধ্যে নিজেদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বিলুপ্ত করে দেয় অথবা তারা বংশগতভাবে তাদের থেকে আলাদা থাকলেও ধর্মীয়ভাবে তাদের অনুসারী থাকে। এই শাখায় অবনতি ও অধপতন সূচিত হলে প্রথমে ইহুদিবাদ ও পরে খৃষ্টবাদের উদ্ভব হয়।

তিন ঃ হযরত ইবরাহীমের আসল কাজ ছিল সমগ্র দুনিয়াবাসীকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহবান জানানো এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা পরিশুদ্ধ ও সংশোধিত করে গড়ে তোলা। তিনি নিজে ছিলেন আল্লাহর অনুগত। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান অনুযায়ী নিজের জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার পরিচালনা করতেন সারা দুনিয়ায় এই জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটাতেন এবং চেষ্টা করতেন যাতে সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভুর অনুগত হয়ে এ দুনিয়ায় জীবন যাপন করে। এই মহান ও বিরাট কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে তাঁকে বিশ্বনেতার পদে অভিষিক্ত করা হয়। তারপর তাঁর বংশধারা থেকে যে শাখাটি বের হয়ে হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুবের নামে অগ্রসর হয়ে বনী ইসরাঈল নাম ধারণ করে সেই শাখাটি তার এ নেতৃত্বের উত্তরাধিকার লাভ করে। এই শাখায় নবীদের জন্ম হতে থাকে এবং এদেরকেই সত্য-সঠিক পথের জ্ঞানদান করা হয়। বিশ্বের জাতিসমূহকে সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার দায়িত্ব এদের ওপর সোপর্দ করা হয়। এটি ছিল আল্লাহর মহান অনুগ্রহ ও নিয়ামত। মহান আল্লাহ এ বংশের লোকদেরকে তাই একথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এ শাখাটি হযরত সুলাইমানের আমলে বাইতুল মাকদিসকে নিজেদের কেন্দ্র গণ্য করে। তাই যতদিন পর্যন্ত এ শাখাটি নেতৃত্বের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিল ততদিন পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসই ছিল দাওয়াত ইলাল্লাহ—মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান জানাবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র।

চার ঃ পেছনের দশটি রুকূ'তে মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে তাদের ঐতিহাসিক অপরাধসমূহ এবং কুরআন নাযিল হবার সময়ে তাদের যে অবস্থা ছিল তা হুবহু বর্ণনা করেছেন। এ সংগে তাদেরকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা আমার নিয়ামতের চরম অমর্যাদা করেছো। তোমরা কেবল নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত থাকোনি বরং নিজেরাও সত্য ও সততার পথ পরিহার করেছো। আর এখন
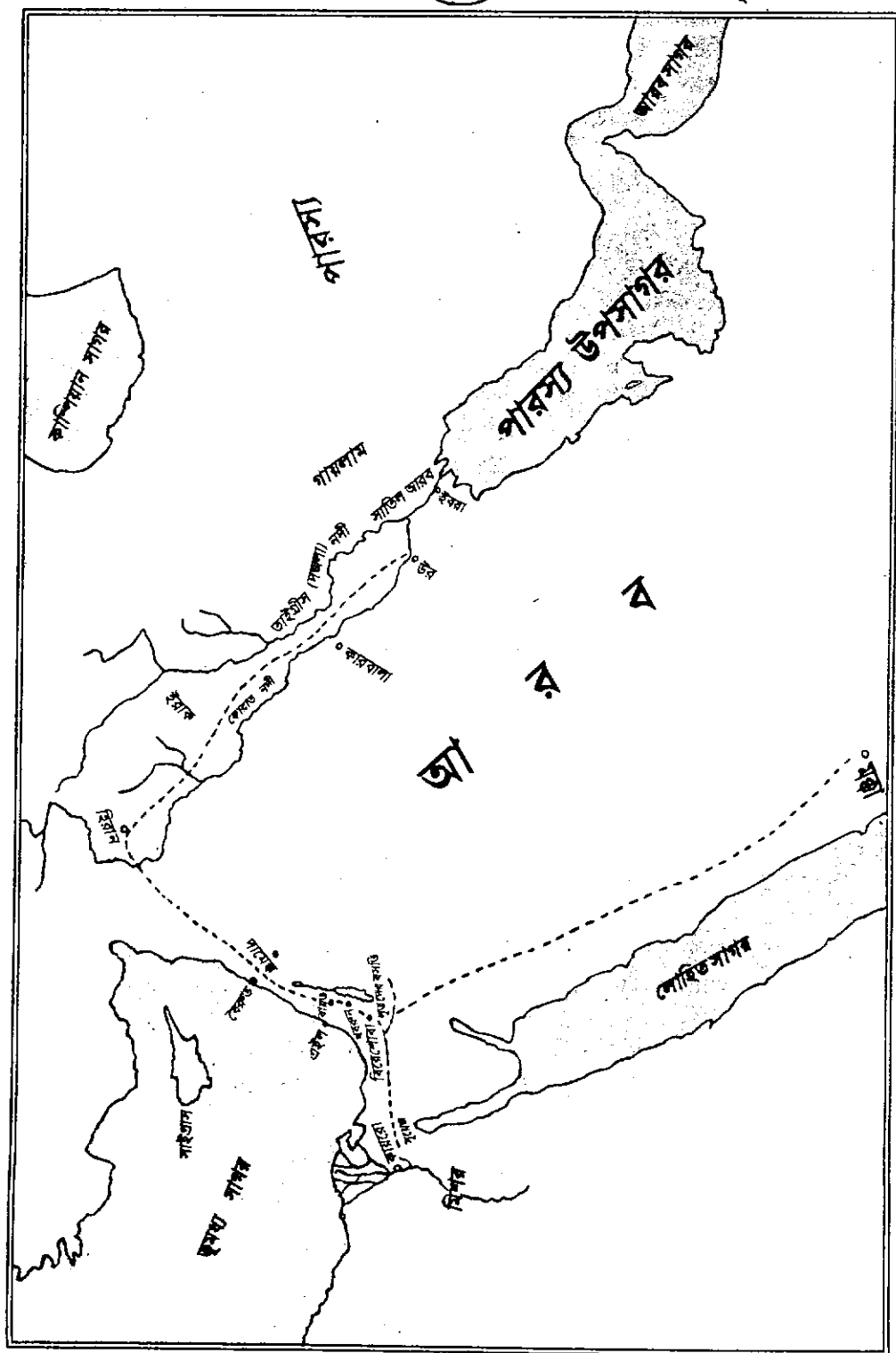
হযরত ইবরাহীম (আ)–এর হিজরতের পথ

তোমাদের একটি ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠী ছাড়া তোমাদের সমগ্র দলের মধ্যে আর কোন যোগ্যতা অবশিষ্ট নেই।

পাঁচ ঃ অতপর এখন তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, বিশ্বমানবতার নেতৃত্ব ইবরাহীমের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার নয়। বরং নবী ইবরাহীম নিজে যে নিষ্কলুষ আনুগত্যের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিয়েছিলেন এটি হচ্ছে তারই ফসল। যারা ইবরাহীমের পথে নিজেরা চলে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীকে চালাবার দায়িত্ব পালন করে একমাত্র তারাই এই নেতৃত্বের যোগ্যতা লাভ করতে পারে। যেহেতু তোমরা এ পথ থেকে সরে গেছো এবং এ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছো তাই নেতৃত্বের পদ থেকে তোমাদের অপসারিত করা হচ্ছে।

ছয় ঃ সংগে সংগে ইশারা–ইংগিতে একথাও বলে দেয়া হচ্ছে, যেসব অইসরাঈলী জাতি মূসা ও ঈসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে নিজেদের সম্পর্ক জুড়েছিল তারাও ইবরাহীমের পথ থেকে সরে গেছে। এই সংগে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আরবের মুশরিকরাও ইবরাহীম ও ইসমাঈলের সাথে নিজেদের সম্পর্ক রয়েছে বলে গর্ব করে বেড়ায় কিন্তু তারা আসলে নিজেদের বংশ ও গোত্রের অহংকারে মত্ত হয়ে পড়েছে। ইবরাহীম ও ইসমাঈলের পথের সাথে এখন তাদের দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। কাজেই তাদের কেউই বিশ্বনেতৃত্বের যোগ্যতা ও অধিকার রাখে না।

সাত ঃ আবার একথাও বলা হচ্ছে, এখন আমরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশের দ্বিতীয় শাখা বনী ইসমাঈলের মধ্যে এমন এক নবীর জন্ম দিয়েছি যার জন্য ইবরাহীম ও ইসমাঈল উভয়েই দোয়া করেছিলেন। ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও অন্যান্য সকল নবী যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তিনিও সেই একই পথ অবলম্বন করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় যত নবী ও রসূল এসেছেন তিনি ও তাঁর অনুসারীরা তাদের সবাইকে সত্যনবী বলে স্বীকার করেন। সকল নবী বিশ্ববাসীকে যে পথের দিকে আহবান জানিয়েছেন তিনি ও তাঁর অনুসারীগণও মানুষকে সেদিকে আহবান জানান। কাজেই যারা এ নবীর অনুসরণ করে এখন একমাত্র তারাই বিশ্বমানবতার নেতৃত্বের যোগ্যতা ও অধিকার রাখে।

আট ঃ নেতৃত্ব পরিবর্তনের ঘোষণার সাথে সাথেই স্বাভাবিকভাবেই কিব্‌লাহ পরিবর্তনের ঘোষণা হওয়াও জরুরী ছিল। যতদিন বনী ইসরাঈলদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন বাইতুল মাকদিস ছিল ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্র এবং সেটিই ছিল সত্যপন্থীদের কিব্‌লাহ। শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসরীগণও ততদিন বাইতুল মাকদিসকেই তাঁদের কিব্‌লাহ বানিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বনী ইসরাঈলকে এ পদ থেকে যথারীতি অপসারিত করার পর বাইতুল মাকদিসের কেন্দ্রীয় গুরত্ব আপনা–আপনি খতম হয়ে গেল। কাজেই ঘোষণা করে দেয়া হলো, যেখান থেকে এ শেষ নবীর দাওয়াতের সূচনা হয়েছে সেই স্থানটিই হবে এখন আল্লাহর দীনের কেন্দ্র। আর যেহেতু শুরুতে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াতের কেন্দ্রও এখানে ছিল তাই আহ্‌লি কিতাব ও মুশরিকদের জন্যও এ স্থানটির অর্থাৎ কা'বার কেন্দ্র হবার সর্বাধিক অধিকারের দাবী স্বীকার করে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অবশ্যি

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾

আর সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কারোর থেকে ফিদিয়া (বিনিময়) গ্রহণ করা হবে না, কোন সুপারিশ মানুষের জন্য লাভজনক হবে না এবং অপরাধীরা কোথাও কোন সাহায্য পাবে না।

স্মরণ করো যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন[১২৪] *এবং সেসব পরীক্ষায় সে পুরোপুরি উত্‌রে গেলো, তখন তিনি বললেন ঃ "আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতার পদে অধিষ্ঠিত করবো।" ইবরাহীম বললো ঃ "আর আমার সন্তানদের সাথেও কি এই অংগীকার?" জবাব দিলেন ঃ "আমার এ অংগীকার যালেমদের ব্যাপারে নয়।"*[১২৫]

হঠধর্মীদের কথা আলাদা। তারা সত্যকে সত্য জেনেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ আনতে থাকে।

নয় ঃ উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার নেতৃত্ব ও কা'বার কেন্দ্র হবার কথা ঘোষণা করার পরই মহান আল্লাহ ১৯ রুকূ' থেকে সূরা বাকারার শেষ পর্যন্ত আলোচনায় ধারাবাহিক হেদায়াতের মাধ্যমে এ উম্মাতের জীনব গঠন ও জীবন পরিচালনার জন্য বিধান দান করেছেন।

১২৪. যেসব কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁকে বিশ্বমানবতার নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত করার যোগ্য প্রমাণ করেছিলেন কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সত্যের আলো তাঁর সামনে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর থেকে নিয়ে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সমগ্র জীবন ছিল কুরবানী ও ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। দুনিয়ার যেসব বস্তুকে মানুষ ভালোবাসতে পারে এমন প্রতিটি বস্তুকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সত্যের জন্য কুরবানী করেছিলেন। দুনিয়ার যে সমস্ত বিপদকে মানুষ ভয় করে সত্যের খাতিরে তার প্রত্যেকটিকে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন।

১২৫. অর্থাৎ এই অংগীকারটি তোমার সন্তানদের কেবলমাত্র সেই অংশটির সাথে সম্পর্কিত যারা সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ ও সৎকর্মশীল। তাদের মধ্য থেকে যারা যালেম তাদের জন্য এ অংগীকার নয়। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায়, পথভ্রষ্ট ইহুদিরা ও মুশরিক বনী ইসরাঈলরা এ অংগীকারের সাথে সম্পর্কিত নয়।

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۖ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ
إِبْرٰهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْعٰكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ
اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُم
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ
عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

আর স্মরণ করো তখনকার কথা যখন আমি এই গৃহকে (কা'বা) লোকদের জন্য কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল গণ্য করেছিলাম এবং ইবরাহীম যেখানে ইবাদাত করার জন্য দাঁড়ায় সে স্থানটিকে স্থায়ীভাবে নামাযের স্থানে পরিণত করার হুকুম দিয়েছিলাম। আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাকীদ করে বলেছিলাম, আমার এই গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকূ'–সিজদাকারীদের জন্য পাক–পবিত্র রাখো।[১২৬]

আর এও স্মরণ করো যে, ইবরাহীম দোয়া করেছিল ঃ "হে আমার রব! এই শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও। আর এর অধিবাসীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে মানবে তাদেরকে সব রকমের ফলের আহার্য দান করো।" জবাবে তার রব বললেন ঃ "আর যে মানবে না, দুনিয়ার গুটিকয় দিনের জীবনের সামগ্রী আমি তাকেও দেবো।[১২৭] *কিন্তু সব শেষে তাকে জাহান্নামের আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করবো এবং সেটি নিকৃষ্টতম আবাস।"*

১২৬. পাক–পবিত্র রাখার অর্থ কেবলমাত্র ময়লা–আবর্জনা থেকে পাক–পবিত্র রাখা নয়। আল্লাহর ঘরের আসল পবিত্রতা হচ্ছে এই যে, সেখানে আল্লাহর ছাড়া আর কারোর নাম উচ্চারিত হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরে বসে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মালিক, প্রভু, মাবুদ, অভাব পূরণকারী ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী হিসেবে ডাকে, সে আসলে তাকে নাপাক ও অপবিত্র করে দিয়েছে। এ আয়াতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে কুরাইশ মুশরিকদের অপরাধসমূহের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ এ যালেমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলের উত্তরাধিকারী হবার জন্য গর্ব করে বেড়ায় কিন্তু উত্তারাধিকারের হক আদায় করার পরিবর্তে এরা উল্টো সেই হককে পদদলিত করে যাচ্ছে। কাজেই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে যে অংগীকার করা হয়েছিল তা থেকে বনী ইসরাঈলরা যেমন বাদ পড়েছে তেমনি এই ইসমাঈলী মুশরিকরাও বাদ পড়ে গেছে।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

আর স্মরণ করো, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এই গৃহের প্রাচীর নির্মাণ করছিল, তারা দোয়া করে বলছিল ঃ "হে আমাদের রব! আমাদের এই খিদমত কবুল করে নাও। তুমি সবকিছু শ্রবণকারী ও সবকিছু জ্ঞাত। হে আমাদের রব! আমাদের দু'জনকে তোমার মুসলিম (নির্দেশের অনুগত) বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতির সৃষ্টি করো যে হবে তোমার মুসলিম। তোমার ইবাদাতের পদ্ধতি আমাদের বলে দাও এবং আমাদের ভুলচুক মাফ করে দাও। তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। হে আমাদের রব! এদের মধ্যে স্বয়ং এদের জাতি পরিসর থেকে এমন একজন রসূল পাঠাও যিনি এদেরকে তোমার আয়াত পাঠ করে শুনাবেন, এদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং এদের জীবন পরিশুদ্ধ করে সুসজ্জিত করবেন।[১২৮] অবশ্যি তুমি বড়ই প্রতিপত্তিশালী ও জ্ঞানবান।[১২৯]

১২৭. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন মানব জাতির নেতৃত্ব সম্পর্কে আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন জবাবে তাঁকে বলা হয়েছিল, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে একমাত্র মু'মিন ও সত্যনিষ্ঠরাই এ পদের অধিকারী হবে। জালেমদেরকে এর অধিকারী করা হবে না। অতপর হযরত ইবরাহীম যখন রিযিকের জন্য দোয়া করতে লাগলেন তখন আগের ফরমানটিকে সামনে রেখে তিনি কেবলমাত্র নিজের মু'মিন সন্তান ও বংশধরদের জন্য দোয়া করলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ জবাবে সংগে সংগেই তার ভুল ধারণা দূর করে দিলেন এবং তাঁকে জানিয়ে দিলেন, সত্যনিষ্ঠ নেতৃত্ব এক কথা আর রিযিক ও আহার্য দান করা অন্য কথা। সত্যনিষ্ঠ ও সৎকর্মশীল মু'মিনরাই একমাত্র সত্যনিষ্ঠ নেতৃত্বের অধিকারী হবে। কিন্তু দুনিয়ার রিযিক ও আহার্য মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাইকে দেয়া হবে। এ থেকে একথা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রতিভাত হয় যে, কারোর অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য দেখে যেন কেউ এ ধারণা না করে বসেন যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সে-ই নেতৃত্ব-যোগ্যতারও অধিকারী।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ۭ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾ وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ۭ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৬ রুকূ'

এখন কে ইবরাহীমের পদ্ধতিকে ঘৃণা করবে? হ্যাঁ, যে নিজেকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতায় আচ্ছন্ন করেছে সে ছাড়া আর কে এ কাজ করতে পারে? ইবরাহীমকে তো আমি দুনিয়ায় নিজের জন্য নির্বাচিত করেছিলাম আর আখেরাতে সে সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে। তার অবস্থা এই ছিল যে, যখন তার রব তাকে বললো, "মুসলিম হয়ে যাও।"[১৩০] তখনই সে বলে উঠলো, "আমি বিশ্ব-জাহানের প্রভুর 'মুসলিম' হয়ে গেলাম।" ঐ একই পথে চলার জন্য সে তার সন্তানদের উপদেশ দিয়েছিল এবং এরি উপদেশ দিয়েছিল ইয়াকুবও তার সন্তানদেরকে।[১৩১] সে বলেছিল, "আমার সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দীনটিই পছন্দ করেছেন।[১৩২] কাজেই আমৃত্যু তোমরা মুসলিম থেকো।"

১২৮. জীবন পরিশুদ্ধ করে সুসজ্জিত করা বলতে চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ, চরিত্র-নৈতিকতা, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যাকার সবকিছুকেই সুসজ্জিত করা বুঝাচ্ছে।

১২৯. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব আসলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়ার জওয়াব—একথাই এখানে বলা হয়েছে।

১৩০. মুসলিম কাকে বলে? যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত হয়, আল্লাহকে নিজের মালিক, প্রভু ও মাবুদ হিসেবে মেনে নেয়, নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেয় এবং দুনিয়ায় আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে সে-ই মুসলিম। এ আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির নাম 'ইসলাম' মানব জাতির সৃষ্টিলগ্ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেসব নবী এসেছেন এটিই ছিল তাঁদের সবার দীন ও জীবন বিধান।

১৩১. বনী ইসরাঈল সরাসরি হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালামের বংশধর হবার কারণেই সরাসরি তাঁর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ؕ قَالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ آبَآئِكَ إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ إِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুব এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছিল? মৃত্যুকালে সে তার সন্তানদের জিজ্ঞেস করলো ঃ "আমার পর তোমরা কার বন্দেগী করবে?" তারা সবাই জবাব দিল ঃ "আমরা সেই এক আল্লাহর বন্দেগী করবো, যাকে আপনি এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক ইলাহ হিসেবে মেনে এসেছেন আর আমরা তাঁরই অনুগত—মুসলিম।"[১৩৩]

এরা ছিল কিছু লোক। এরা তো অতীত হয়ে গেছে। তারা যা কিছু উপার্জন করেছে, তা তাদের নিজেদের জন্যই আর তোমরা যা উপার্জন করবে, তা তোমাদের জন্য। তারা কি করতো সে কথা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।[১৩৪]

১৩২. 'দীন' অর্থাৎ জীবন পদ্ধতি ও জীবন বিধান। মানুষ দুনিয়ায় যে আইন ও নীতিমালার ভিত্তিতে তার সমগ্র চিন্তা, দর্শন ও কর্মনীতি গড়ে তোলে তাকেই বলা হয় 'দীন'।

১৩৩. বাইবেলে হযরত ইয়াকূবের (আ) মৃত্যুকালীন অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেখানে এই উপদেশের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে তালমূদে যে বিস্তারিত উপদেশ লিপিবদ্ধ হয়েছে তার বিষয়বস্তু কুরআনের এ বর্ণনার সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যশীল। সেখানে আমরা হযরত ইয়াকূবের (আ) একথাগুলো পাই ঃ

> "সদাপ্রভু আল্লাহর বন্দেগী করতে থাকো। তিনি তোমাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে বিপদ থেকে বাঁচাবেন যেমন বাঁচিয়েছেন তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে।..............তোমাদের সন্তানদের আল্লাহকে ভালোবাসতে এবং তাঁর হুকুম পালন করতে শেখাও। এতে তাদের জীবনের অবকাশ দীর্ঘ হবে। কারণ আল্লাহ তাদেরকে হেফাযত করেন যারা সত্যনিষ্ঠ হয়ে কাজ করে এবং তাঁর পথে ঠিকমতো চলে।" জবাবে তাঁর ছেলেরা বলেন ঃ "আপনার উপদেশ মতো আমরা কাজ করবো। আল্লাহ আমাদের সাথে থাকুন।" একথা শুনে হযরত ইয়াকূব (আ) বলেন ঃ "যদি তোমরা আল্লাহর পথ থেকে ডাইনে বাঁয়ে না ঘুরে যাও, তাহলে আল্লাহ অবশ্যি তোমাদের সাথে থাকবেন।"

১৩৪. অর্থাৎ যদিও তোমরা তাদেরই সন্তান তবুও প্রকৃতপক্ষে তাদের সাথে তোমাদের কোন যোগাযোগ নেই। তোমরা তাদের পথ থেকেই যখন সরে গিয়েছো তখন তাদের নাম

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰهٖمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلٰى إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

ইহুদিরা বলে, "ইহুদি হয়ে যাও, তাহলে সঠিক পথ পেয়ে যাবে।" খৃষ্টানরা বলে, "খৃষ্টান হয়ে যাও, তা হলে হিদায়াত লাভ করতে পারবে।" ওদেরকে বলে দাও, "না, তা নয়; বরং এ সবকিছু ছেড়ে একমাত্র ইবরাহীমের পদ্ধতি অবলম্বন করো। আর ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তরভুক্ত ছিল না।"[১৩৫] হে মুসলমানরা! তোমরা বলো, "আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, যে হিদায়াত আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও ইয়াকূবের সন্তানদের প্রতি নাযিল হয়েছিল তার প্রতি, আর যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য সকল নবীদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল তার প্রতি। তাদের কারোর মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না।[১৩৬] আমরা সবাই আল্লাহর অনুগত মুসলিম।"

নেয়ার তোমাদের কি অধিকার আছে? আল্লাহর ওখানে একথা জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তোমাদের বাপ-দাদারা কি করতো? বরং জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি করেছো?

আর "তারা যা কিছু উপার্জন করেছে, তা তাদের নিজেদের জন্যই আর তোমরা যা উপার্জন করবে তা তোমাদের জন্য"—এ বর্ণনাভংগীটি কুরআনের একান্ত নিজস্ব। আমরা যে জিনিসটিকে কাজ বা আমল বলি কুরআন নিজের ভাষায় তাকে বলে উপার্জন বা রোজগার। আমাদের প্রত্যেকটি আমলের একটি ভালো বা মন্দ ফলাফল আছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির আকারে এর প্রকাশ ঘটবে। এ ফলাফলই হচ্ছে আমাদের উপার্জন। যেহেতু কুরআনের দৃষ্টিতে ঐ ফলাফলই মূল গুরুত্বের অধিকারী তাই সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের কাজকে 'আমল' ও 'কাজ' শব্দ দ্বারা চিহ্নিত না করে তাকে 'উপার্জন' শব্দ দিয়ে সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

১৩৫. এ জবাবটির রসাস্বাদন করতে হলে দু'টি বিষয় সামনে রাখতে হবে ঃ

এক ঃ ইহুদিবাদ ও খৃষ্টবাদ উভয়ই পরবর্তীকালের ফসল। ইহুদিবাদের সৃষ্টি খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে। তখনই 'ইহুদিবাদ' তার এ নাম, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও রীতি-পদ্ধতি সহকারে আত্মপ্রকাশ করে। আর যেসব বিশেষ আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾

তোমরা যেমনি ঈমান এনেছো তারাও যদি ঠিক তেমনিভাবে ঈমান আনে, তাহলে তারা হিদয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলতে হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে সোজা কথায় বলা যায়, তারা হঠধর্মিতার পথ অবলম্বন করেছে। কাজেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাও, তাদের মোকাবিলায় তোমাদের সহায়তার জন্য আল্লাহ–ই যথেষ্ট। তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

বলো ঃ "আল্লাহর রঙ ধারণ করো।[১৩৭] আর কার রঙ তার চেয়ে ভালো? আমরা তো তাঁরই ইবাদাতকারী।"

হে নবী! এদেরকে বলে দাও ঃ "তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমাদের সাথে ঝগড়া করছো? অথচ তিনিই আমাদের রব এবং তোমাদেরও।[১৩৮] আমাদের কাজ আমাদের জন্য, তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আর আমরা নিজেদের ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করেছি।[১৩৯]

সমষ্টি খৃস্টবাদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে তার অভ্যুদয় ঘটেছে হযরত ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামেরও বেশ কিছুকাল পরে। এখানে স্বতস্ফূর্তভাবে একটি প্রশ্ন জেগে ওঠে। যদি ইহুদিবাদ ও খৃস্টবাদ গ্রহণ করাই হিদায়াত লাভের ভিত্তি হয়ে থাকে, তাহলে এ ধর্মগুলোর উদ্ভবের শত শত বছর আগে জন্মগ্রহণকারী হযরত ইবরাহীম (আ), অন্যান্য নবীগণ ও সৎব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে ইহুদি ও খৃস্টানরা নিজেরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত বলে স্বীকার করে, তারা কোথায় থেকে হিদায়াত পেতেন? নিসন্দেহে বলা যায়, তাদের হিদায়াতের উৎস 'ইহুদিবাদ' ও 'খৃস্টবাদ' ছিল না। কাজেই একথা সুস্পষ্ট, যেসব ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে এই ইহুদি, খৃস্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়গুলোর উদ্ভব হয়েছে মানুষের হিদায়াত লাভ এদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং যে বিশ্বব্যাপী চিরন্তন সহজ–সত্য পথ গ্রহণ করে মানুষ যুগে যুগে হিদায়াত লাভ করে এসেছে তারই ওপর এটি নির্ভরশীল।

দুই ঃ ইহুদি ও খৃস্টানদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থগুলোই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত–বন্দেগী, উপাসনা–আরাধনা, প্রশংসা–কীর্তন ও আনুগত্য না করার সাক্ষ প্রদান করে। আল্লাহর গুণ–বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আর কাউকে শরীক না করাই ছিল তাঁর মিশন। কাজেই নিসন্দেহে বলা যায়, হযরত

ইবরাহীম (আ) যে চিরন্তন সত্য–সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ইহুদিবাদ ও খৃষ্টবাদ তা থেকে সরে গিয়েছিল। কারণ এদের উভয়ের মধ্যেই শিরকের মিশ্রণ ঘটেছিল।

১৩৬. নবীদের মধ্যে পার্থক্য না করার অর্থ হচ্ছে, কেউ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং কেউ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না অথবা কাউকে মানি এবং কাউকে মানি না—আমরা তাদের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করি না। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সকল নবীই একই চিরন্তন সত্য ও একই সরল–সোজা পথের দিকে আহবান জানিয়েছেন। কাজেই যথার্থ সত্যপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সকল নবীকে সত্যপন্থী ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে ব্যক্তি এক নবীকে মানে এবং অন্য নবীকে অস্বীকার করে, সে আসলে যে নবীকে মানে তারও অনুগামী নয়। কারণ হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) ও অন্যান্য নবীগণ যে বিশ্বব্যাপী চিরন্তর সহজ–সত্য পথ দেখিয়েছিলেন সে আসলে তার সন্ধান পায়নি বরং সে নিছক বাপ–দাদার অনুসরণ করে একজন নবীকে মানছে। তার আসল ধর্ম হচ্ছে, বর্ণবাদ, বংশবাদ ও বাপ–দাদার অন্ধ অনুসরণ। কোন নবীর অনুসরণ তার ধর্ম নয়।

১৩৭. এ আয়াতটির দু'টি অনুবাদ হতে পারে। এক ঃ আমরা আল্লাহর রং ধারণ করেছি। দুই ঃ আল্লাহর রং ধারণ করো। খৃষ্ট ধর্মের আত্মপ্রকাশের পূর্বে ইহুদিদের মধ্যে একটি বিশেষ রীতির প্রচলন ছিল। কেউ তাদের ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে গোসল করানো হতো। আর তাদের ওখানে গোসলের অর্থ ছিল, তার সমস্ত গোনাহ যেন ধুয়ে গেলো এবং তার জীবন নতুন রং ধারণ করলো। পরবর্তীকালে খৃষ্টানদের মধ্যেও এ রীতির প্রচলন হয়। তাদের ওখানে এর পারিভাষিক নাম হচ্ছে ইসতিবাগ বা রঙীন করা (ব্যাপটিজম)। তাদের ধর্মে যারা প্রবেশ করে কেবল তাদেরকেই ব্যাপটাইজড বা খৃষ্ট ধর্মে রঞ্জিত করা হয় না বরং খৃষ্টান শিশুদেরকেও ব্যাপটাইজড করা হয়। এ ব্যাপারেই কুরআন বলছে, এ লোকাচারমূলক 'রঞ্জিত' হবার যৌক্তিকতা কোথায়? বরং আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও। যা কোন পানির দ্বারা হওয়া যায় না। বরং তাঁর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে এ রঙে রঞ্জিত হওয়া যায়।

১৩৮. অর্থাৎ আমরাও তো এই একই কথাই বলি, আল্লাহ আমাদের সবার রব এবং তাঁরই আনুগত্য করতে হবে। এটা কি এমন একটা বিষয়, যা নিয়ে তোমরা আমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারো? ঝগড়া যদি করতে হয় তাহলে তা আমরা করতে পারি, তোমরা নও। কারণ তোমরাই আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করছো এবং তার বন্দেগী করছো। আমরা এ কাজ করছি না।

اتحاجوننا فى الله বাক্যটির আর একটি অনুবাদ হতে পারে ঃ "আমাদের সাথে তোমাদের ঝগড়াটি কি আল্লাহর পথে?" এর অর্থ এই হবে, যদি তোমরা সত্যিই লালসার বশবর্তী না হয়ে বরং আল্লাহর জন্য ঝগড়া করে থাকো, তাহলে অতি সহজেই এর মীমাংসা করা যেতে পারে।

১৩৯. তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী আর আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী। তোমরা যদি তোমাদের বন্দেগীকে বিভক্ত করে থাকো এবং অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করে তার পূজা–উপাসনা ও আনুগত্য করো, তাহলে তোমাদের তা করার ক্ষমতা

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

অথবা তোমরা কি একথা বলতে চাও যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও ইয়াকূব–সন্তানরা সবাই ইহুদি বা খৃষ্টান ছিল?" বলো, "তোমরা বেশী জানো, না আল্লাহ বেশী জানেন?[১৪০] তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সাক্ষ রয়েছে এবং সে তা গোপন করে চলে? তোমাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আল্লাহ গাফেল নন।[১৪১]

তারা ছিল কিছু লোক। তারা আজ আর নেই। তারা যা কিছু উপার্জন করেছিল তা ছিল তাদের নিজেদের জন্য। আর তোমরা যা উপার্জন করবে তা তোমাদের জন্য তাদের কাজের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।"

দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর পরিণাম তোমাদের ভোগ করতে হবে। আমরা বলপূর্বক তোমাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে চাই না। কিন্তু আমরা নিজেদের বন্দেগী, আনুগত্য ও উপাসনা–আরাধনা সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। যদি তোমরা একথা স্বীকার করে নাও যে, আমাদেরও এ কাজ করার ক্ষমতা ও অধিকার আছে তাহলে তো ঝগড়াই মিটে যায়।

১৪০. যেসব মূর্খ ইহুদি ও খৃষ্টান জনতা যথার্থই মনে করতো, এ বড় বড় মহান নবীদের সকলেই ইহুদি বা খৃষ্টান ছিলেন, তাদেরকে সম্বোধন করে এখানে একথা বলা হয়েছে।

১৪১. এখানে ইহুদি ও খৃষ্টান আলেমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা নিজেরাও এ সত্যটি জানতো যে, ইহুদিবাদ ও খৃষ্টবাদ সে সময় যে বৈশিষ্ট ও চেহারাসহ বিরাজ করছিল তা অনেক পরবর্তীকালের সৃষ্টি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সত্যকে একমাত্র তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করছিল। তারা জনগণকে ভুল ধারণা দিয়ে আসছিল যে, নবীদের অতিক্রান্ত হয়ে যাবার দীর্ঘকাল পর তাদের ফকীহ, ন্যায়শাস্ত্রবিদ ও সুফীরা যে সমস্ত আকীদা–বিশ্বাস, পদ্ধতি, রীতি–নীতি ও ইজতিহাদী নিয়ম–কানুন রচনা করেছে, সেগুলোর আনুগত্যের মধ্যেই মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো, তোমাদের একথাই যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব ইত্যাদি নবীগণ তোমাদের এই সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۚ

১৭ রুকূ'

অবশ্যি নির্বোধ লোকেরা বলবে, "এদের কি হয়েছে, প্রথমে এরা যে কিব্‌লার দিকে মুখ করে নামায পড়তো, তা থেকে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে?[১৪২] *হে নবী! ওদেরকে বলে দাও, "পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। আল্লাহ যাকে চান তাকে সোজা পথ দেখান।"*[১৪৩] *আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি 'মধ্যপন্থী' উম্মাতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের ওপর সাক্ষী হতে পারো এবং রসূল হতে পারেন তোমাদের ওপর সাক্ষী।*[১৪৪]

কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তরভুক্ত ছিলেন? তারা এর জবাব এড়িয়ে যেতো। কারণ ঐ নবীগণ তাদের সম্প্রদায়ের অন্তরভুক্ত ছিলেন, নিজেদের জ্ঞান অনুযায়ী তারা একথা দাবী করতে পারতো না। কিন্তু নবীগণ ইহুদিও ছিলেন না এবং খৃষ্টানও ছিলেন না, একথা যদি তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতো তাহলে তো তাদের সব যুক্তিই শেষ হয়ে যেতো।

১৪২. হিজরাতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তাইয়েবায় ষোল সতের মাস পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়তে থাকেন। অতপর কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ আসে। এর বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে আসবে।

১৪৩. এটি হচ্ছে নির্বোধদের অভিযোগের প্রথম জবাব। তাদের চিন্তার পরিসর ছিল সংকীর্ণ। তাদের দৃষ্টি ছিল সীমাবদ্ধ। স্থান ও দিক তাদের কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। তাদের ধারণা ছিল আল্লাহ কোন বিশেষ দিকে সীমাবদ্ধ। তাই সর্বপ্রথম তাদের এই মূর্খতাপ্রসূত অভিযোগের জবাবে বলা হয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর দিক। কোন বিশেষ দিককে কিব্‌লায় পরিণত করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ সেই দিকে আছেন। আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন তারা এ ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টির ও সংকীর্ণ মতবাদের উর্ধ্বে অবস্থান করে এবং তাদের জন্য বিশ্বজনীন সত্য উপলব্ধির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। (এ সম্পর্কে আরো জানার জন্য ১১৫ ও ১১৬ নম্বর টীকা দু'টিও দেখে নিন।)

১৪৪. এটি হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের নেতৃত্বের ঘোষণাবাণী। 'এভাবেই' শব্দটির সাহায্যে দু'দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এক ঃ আল্লাহর

পথপ্রদর্শনের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। যার ফলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যকারীরা সত্য–সরল পথের সন্ধান পেয়েছে এবং তারা উন্নতি করতে করতে এমন একটি মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে যেখানে তাদেরকে 'মধ্যপন্থী উম্মাত' গণ্য করা হয়েছে। দুই ঃ এ সাথে কিব্‌লাহ পরিবর্তনের দিকেও ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বোধরা একদিক থেকে আর একদিকে মুখ ফিরানো মনে করছে। অথচ বাইতুল মাকদিস থেকে কা'বার দিকে মুখ ফিরানোর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব পদ থেকে যথানিয়মে হটিয়ে উম্মাতে মুহাম্মাদীয়াকে সে পদে বসিয়ে দিলেন।

'মধ্যপন্থী উম্মাত' শব্দটি অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্যের অধিকারী। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি উৎকৃষ্ট ও উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন দল, যারা নিজেরা ইনসাফ, ন্যায়–নিষ্ঠা ও ভারসাম্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, দুনিয়ার জাতিদের মধ্যে যারা কেন্দ্রীয় আসন লাভের যোগ্যতা রাখে, সত্য ও সততার ভিত্তিতে সবার সাথে যাদের সম্পর্ক সমান এবং কারোর সাথে যাদের কোন অবৈধ ও অন্যায় সম্পর্ক নেই।

বলা হয়েছে, তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাতে পরিণত করার কারণ হচ্ছে এই যে, "তোমরা লোকদের ওপর সাক্ষী হবে এবং রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হবেন।" এ বক্তব্যের অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে, আখেরাতে যখন সমগ্র মানবজাতিকে একত্র করে তাদের হিসেব নেয়া হবে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে রসূল তোমাদের ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য দেবেন যে, সুস্থ ও সঠিক চিন্তা এবং সৎকাজ ও সুবিচারের যে শিক্ষা দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল তা তিনি তোমাদের কাছে হুবহু এবং পুরোপুরি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন আর বাস্তবে সেই অনুযায়ী নিজে কাজ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এরপর রসূলের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সাধারণ মানুষদের ব্যাপারে তোমাদের এই মর্মে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রসূল তোমাদের কাছে যা কিছু পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন তা তোমরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছো। আর তিনি যা কিছু কার্যকর করে দেখিয়ে ছিলেন তা তাদের কাছে কার্যকর করে দেখাবার ব্যাপারে তোমরা মোটেই গড়িমসি করোনি।

এভাবে কোন ব্যক্তি বা দলের এ দুনিয়ায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দানের দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়াটাই মূলত তাকে নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করার নামান্তর। এর মধ্যে যেমন একদিকে মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির প্রশ্ন রয়েছে তেমনি অন্যদিকে রয়েছে দায়িত্বের বিরাট বোঝা। এর সোজা অর্থ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে এ উম্মাতের জন্য আল্লাহভীতি, সত্য–সঠিক পথ অবলম্বন, সুবিচার, ন্যায়–নিষ্ঠা ও সত্যপ্রীতির জীবন্ত সাক্ষী হয়েছেন তেমনিভাবে এ উম্মাতকেও সারা দুনিয়াবাসীদের জন্য জীবন্ত সাক্ষীতে পরিণত হতে হবে। এমন কি তাদের কথা, কর্ম, আচরণ ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয় দেখে দুনিয়াবাসী আল্লাহভীতি, সততা, ন্যায়–নিষ্ঠা ও সত্যপ্রীতির শিক্ষা গ্রহণ করবে। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর হিদায়াত আমাদের কাছে পৌঁছাবার ব্যাপারে যেমন রসূলের দায়িত্ব ছিল বড়ই সুকঠিন, এমনকি এ ব্যাপারে সামান্য ত্রুটি বা

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۚ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٣﴾

প্রথমে যে দিকে মুখ করে তুমি নামায পড়তে, তাকে তো কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে উল্টো দিকে ফিরে যায়, আমি শুধু তা দেখার জন্য কিব্‌লাহ নির্দিষ্ট করেছিলাম।[১৪৫] এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন বিষয়, তবে তাদের জন্য মোটেই কঠিন প্রমাণিত হয়নি যারা আল্লাহর হিদায়াত লাভ করেছিল। আল্লাহ তোমাদের এই ঈমানকে কখনো নষ্ট করবেন না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তিনি মানুষের জন্য অত্যন্ত স্নেহশীল ও করুণাময়।

গাফলতি হলে আল্লাহর দরবারে তিনি পাকড়াও হতেন, অনুরূপভাবে এ হিদায়াতকে দুনিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবার ব্যাপারেও আমাদের ওপর কঠিন দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। যদি আমরা আল্লাহর আদালতে যথার্থই এ মর্মে সাক্ষ্য দিতে ব্যর্থ হই যে, "তোমার রসূলের মাধ্যমে তোমার যে হিদায়াত আমরা পেয়েছিলাম তা তোমার বান্দাদের কাছে পৌঁছাবার ব্যাপারে আমরা কোন প্রকার ত্রুটি করিনি", তাহলে আমরা সেদিন মারাত্মকভাবে পাকড়াও হয়ে যাবো। সেদিন এ নেতৃত্বের অহংকার সেখানে আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের নেতৃত্বের যুগে আমাদের যথার্থ ত্রুটির কারণে মানুষের চিন্তায় ও কর্মে যে সমস্ত গলদ দেখা দেবে, তার ফলে দুনিয়ায় যেসব গোমরাহী ছড়িয়ে পড়বে এবং যত বিপর্যয় ও বিশৃংখলার রাজত্ব বিস্তৃত হবে—সে সবের জন্য অসৎ নেতৃবর্গ এবং মানুষ ও জিন শয়তানদের সাথে সাথে আমরাও পাকড়াও হবো। আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে, পৃথিবীতে যখন জুলুম, নির্যাতন, অন্যায়, অত্যাচার, পাপ ও ভ্রষ্টতার রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল তখন তোমরা কোথায় ছিলে?

১৪৫. অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখা যে, কে জাহেলী বিদ্বেষ এবং মাটি ও রক্তের গোলামিতে লিপ্ত আর কে এসব বাঁধন মুক্ত হয়ে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করেছে। একদিকে আরবরা তাদের দেশ, বংশ ও গোত্রের অহংকারে ডুবে ছিল। আরবের কা'বাকে বাদ দিয়ে বাইরের বাইতুল মাকদিসকে কিব্‌লায় পরিণত করা ছিল তাদের জাতীয়তাবাদের মূর্তির ওপর প্রচণ্ড আঘাতের শামিল। অন্যদিকে বনী ইসরাঈলরা ছিল তাদের বংশপূজার অহংকারে মত্ত। নিজেদের পৈতৃক কিব্‌লাহ ছাড়া অন্য কোন কিব্‌লাহকে বরদাসত করার ক্ষমতাই তাদের ছিল না। কাজেই একথা সুস্পষ্ট, এ ধরনের মূর্তি যাদের মনের কোণে ঠাঁই পেয়েছে, তারা কেমন করে আল্লাহর রসূল যে পথের দিকে আহবান জানাচ্ছিলেন সে

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۚ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾

আমরা তোমাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখছি। নাও, এবার তাহলে সেই কিব্‌লার দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি, যাকে তুমি পছন্দ করো। মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। এখন তোমরা যেখানেই হও না কেন এদিকেই মুখ করে নামায পড়তে থাকো।[১৪৬]

এসব লোক, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, খুব ভালো করেই জানে, (কিব্‌লাহ পরিবর্তনের) এ হুকুমটি এদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে এবং এটি একটি যথার্থ সত্য হুকুম। কিন্তু এ সত্ত্বেও এরা যা কিছু করছে আল্লাহ তা থেকে গাফেল নন।

পথে চলতে পারতো। তাই মহান আল্লাহ এ মূর্তিপূজারীদের যতার্থ সত্যপন্থীদের থেকে ছেঁটে বাদ দেয়ার পরিকল্পনা নিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে বাইতুল মাকদিসকে কিব্‌লাহ নির্দিষ্ট করলেন। এর ফলে আরব জাতীয়তাবাদের দেবতার পূজারীরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। অতপর তিনি এ কিব্‌লাহ বাদ দিয়ে কা'বাকে কিব্‌লাহ নির্দিষ্ট করেন। ফলে ইসরাঈলী জাতীয়তাবাদের পূজারীরাও তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেল। এভাবে যারা কোন মূর্তির নয় বরং নিছক আল্লাহর পূজারী ছিলেন একমাত্র তারাই রসূলের সাথে রয়ে গেলেন।

১৪৬. কিব্‌লাহ পরিবর্তন সম্পর্কিত এটি ছিল মূল নির্দেশ। এ নির্দেশটি ২য় হিজরীর রজব বা শাবান মাসে নাযিল হয়। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দাওয়াত উপলক্ষে বিশর ইবনে বারাআ ইবনে মা'রুর–এর গৃহে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের সময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেখানে নামাযে লোকদের ইমামতি করতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুই রাকাত পড়া হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় রাকাতে হঠাৎ অহীর মাধ্যমে এ আয়াতটি নাযিল হলো। সংগে সংগেই তিনি ও তাঁর সংগে জামায়াতে শামিল সমস্ত লোক বাইতুল মাকদিসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কা'বার দিকে ঘুরে গেলেন। এরপর মদীনায় ও মদীনার আশেপাশে এ নির্দেশটি সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়া হলো। বারাআ ইবনে আযিব বলেন, এক জায়গায় ঘোষকের কথা লোকদের কানে এমন অবস্থায় পৌঁছলো যখন তারা রুকূ' করছিল। নির্দেশ শোনার সাথে সাথে সবাই সেই

অবস্থাতেই কা'বার দিকে মুখ ফিরালো। আনাস ইবনে মালিক বলেন, এ খবরটি বনী সালমায় পৌঁছলো পরের দিন ফজরের নামাযের সময়। লোকেরা এক রাকায়াত নামায শেষ করেছিল এমন সময় তাদের কানে আওয়াজ পৌঁছলো ঃ "সাবধান, কিব্‌লাহ বদলে গেছে। এখন কা'বার দিকে কিব্‌লাহ নির্দিষ্ট হয়েছে।" একথা শোনার সাথে সাথেই সমগ্র জামায়াত কা'বার দিকে মুখ ফিরালো।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বাইতুল মাকদিস মদীনা থেকে সোজা উত্তর দিকে। আর কা'বা হচ্ছে দক্ষিণ দিকে। আর নামাযের মধ্যে কিব্‌লাহ পরিবর্তন করার জন্য ইমামকে অবশ্যি মুকতাদিদের পেছন থেকে সামনের দিকে আসতে হয়েছে। অন্যদিকে মুকতাদিদের কেবলমাত্র দিক পরিবর্তন করতে হয়নি বরং তাদেরও কিছু কিছু চলাফেরা করে লাইন ঠিকঠাক করতে হয়েছে। কাজেই কোন কোন রেওয়ায়াতে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনাও এসেছে।

আর আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'আমরা তোমাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখছি' এবং 'সেই কিব্‌লার দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি যাকে তুমি পছন্দ করো' এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, কিব্‌লাহ পরিবর্তনের নির্দেশ আসার আগে থেকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি নিজেই অনুভব করছিলেন, বনী ইসরাঈলের নেতৃত্বের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং তার সাথে সাথে বাইতুল মাকদিসের কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভেরও অবসান ঘটেছে। এখন আসল ইবরাহীমী কেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাবার সময় এসে গেছে।

'মসজিদে হারাম' অর্থ সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন মসজিদ। এর অর্থ হচ্ছে, এমন ইবাদত গৃহ যার মধ্যস্থলে কা'বাগৃহ অবস্থিত।

কা'বার দিকে মুখ করার অর্থ এ নয় যে, দুনিয়ার যে কোন জায়গা থেকে সোজা নাক বরাবর কা'বার দিকে ফিরে দাঁড়াতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক জায়গায় সবসময় এটা করা কঠিন। তাই কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সোজা কা'বা বরাবর মুখ করে দাঁড়াবার নির্দেশ দেয়া হয়নি। কুরআনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যথাসম্ভব কা'বার নির্ভুল দিকনির্দেশ করার জন্য অনুসন্ধান আমাদের অবশ্যি চালাতে হবে। কিন্তু একেবারেই যথার্থ ও নির্ভুল দিক জেনে নেয়ার দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পণ করা হয়নি। সম্ভাব্য সকল উপায়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যে দিকটিতে কা'বার অবস্থিতি হওয়া সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশী নিশ্চিত হতে পারি সেদিকে ফিরে নামায পড়াই নিসন্দেহে সঠিক পদ্ধতি। যদি কোথাও কিব্‌লার দিকনির্দেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে অথবা এমন অবস্থায় থাকা হয় যার ফলে কিব্‌লার দিকে মুখ করে থাকা সম্ভব না হয় (যেমন নৌকা বা রেলগাড়ীতে ভ্রমণকালে) তাহলে এ অবস্থায় যে দিকটার কিব্‌লাহ হওয়া সম্পর্কে ধারণা হয় অথবা যেদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকা সম্ভব হয়, সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়া যেতে পারে। তবে, হাঁ, নামাযের মধ্যেই যদি কিব্‌লার সঠিক দিকনির্দেশনা জানা যায় অথবা সঠিক দিকে নামায পড়া সম্ভব হয়, তাহলে নামায পড়া অবস্থায়ই সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়া উচিত।

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿১৪৫﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿১৪৬﴾ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿১৪৭﴾

তুমি এই আহ্‌লি কিতাবদের কাছে যে কোন নিশানীই আনো না কেন, এরা তোমার কিব্‌লার অনুসারী কখনোই হবে না। তোমাদের পক্ষেও তাদের কিব্‌লার অনুগামী হওয়া সম্ভব নয় আর এদের কোন একটি দলও অন্য দলের কিব্‌লার অনুসারী হতে প্রস্তুত নয়। তোমাদের কাছে যে জ্ঞান এসেছে তা লাভ করার পর যদি তোমরা তাদের ইচ্ছা ও বাসনার অনুসারী হও, তাহলে নিসন্দেহে তোমরা জালেমদের অন্তরভুক্ত হবে।[১৪৭] *যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এই স্থানটিকে (যাকে কিব্‌লাহ বানানো হয়েছে) এমনভাবে চেনে যেমন নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে।*[১৪৮] *কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একটি দল সত্যকে জেনে বুঝে গোপন করছে। এটি নির্দ্বিধায় তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আগত একটি চূড়ান্ত সত্য, কাজেই এ ব্যাপারে তোমরা কখনোই কোন প্রকার সন্দেহের শিকার হয়ো না।*

১৪৭. এর অর্থ হচ্ছে, কিব্‌লাহ সম্পর্কে এরা যত প্রকার বিতর্ক ও যুক্তি–প্রমাণ পেশ করে, যুক্তির মাধ্যমে এদেরকে নিশ্চিত করে এর মীমাংসা করা সম্ভব নয়। কারণ এরা বিদ্বেষ পোষণ ও হঠধর্মিতায় লিপ্ত। কোন প্রকার যুক্তি–প্রমাণের মাধ্যমে এদেরকে এদের কিব্‌লাহ থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব নয়। নিজেদের দল প্রীতি ও গোত্রীয় বিদ্বেষের কারণে এরা এই কিব্‌লার সাথে সংযুক্ত রয়েছে। আর তোমরা এদের কিব্‌লাহ গ্রহণ করেও এই ঝগড়ার মীমাংসা করতে পারবে না। কারণ এদের কিব্‌লাহ একটি নয়। এদের সমস্ত দল একমত হয়ে কোন একটি কিব্‌লাহ গ্রহণ করেনি, যেটি গ্রহণ করে নিলে সব ঝগড়া চুকে যেতে পারে। এদের বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কিব্‌লাহ। একটি দলের কিব্‌লাহ গ্রহণ করে কেবলমাত্র তাদেরকেই সন্তুষ্ট করা যেতে পারে। অন্যদের সাথে ঝগড়া তখনো থেকে যাবে। আর সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে এই যে, নবী হিসেবে লোকদেরকে সন্তুষ্ট করতে থাকা

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

১৮ রুকূ

প্রত্যেকের জন্য একটি দিক আছে, সে দিকেই সে ফেরে। কাজেই তোমরা ভালোর দিকে এগিয়ে যাও।[১৪৯] যেখানেই তোমরা থাকো না কেন আল্লাহ তোমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তাঁর ক্ষমতার বাইরে কিছুই নেই।

তুমি যেখান থেকেই যাওনা কেন, সেখানেই তোমার মুখ (নামাযের সময়) মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও। কারণ এটা তোমার রবের সম্পূর্ণ সত্য ভিত্তিক ফায়সালা। আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে বেখবর নন।

এবং দেয়া নেয়ার নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে আপোয করা তোমাদের দায়িত্ব নয়। তোমাদের কাজ হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছি, সবকিছু থেকে বেপরোয়া হয়ে একমাত্র তারই ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। তা থেকে সরে গিয়ে কাউকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হলে নিজের নবুওয়াতের মর্যাদার প্রতি জুলুম করা হবে এবং দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে তোমাকে আমি যে নিয়ামত দান করেছি তার প্রতি হবে অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

১৪৮. এটি আরবের একটি প্রচলিত প্রবাদ। যে জিনিসটিকে মনুষ নিশ্চিতভাবে জানে এবং যে সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধার অবকাশ থাকে না তাকে এভাবে বলা হয়ে থাকে যথা ঃ সে এ জিনিসটিকে এমনভাবে চেনে যেমন চেনে নিজের সন্তানদেরকে। অর্থাৎ নিজের ছেলে-মেয়েদেরকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে যেমন তার মধ্যে কোন প্রকার জড়তা ও সংশয়ের অবকাশ থাকে না, ঠিক তেমনি সব রকম সন্দেহের উর্ধে উঠে নিশ্চিতভাবেই সে এই জিনিসটিকে জানে ও চেনে। ইহুদি ও খৃষ্টান আলেমরা ভালোভাবেই এ সত্যটি জানতো যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বা নির্মাণ করেছিলেন এবং বিপরীত পক্ষে এর ১৩ শত বছর পরে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের হাতে বাইতুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং তাঁর আমলে এটি কিব্‌লাহ হিসেবে গণ্য হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাপারে তাদের মধ্যে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

১৪৯. প্রথম বাক্য ও দ্বিতীয় বাক্যটির মাঝখানে একটু সূক্ষ্ম ফাঁক রয়েছে। শ্রোতা নিজে সামান্য একটু চিন্তা-ভাবনা করলে এই ফাঁক ভরে ফেলতে পারেন। ব্যাপার হচ্ছে এই যে,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ
حُجَّةٌ ۖ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ
وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ
رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُونِي
أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

আর যেখান থেকেই তুমি চল না কেন তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও এবং যেখানেই তোমরা থাকো না কেন সে দিকেই মুখ করে নামায পড়ো, যাতে লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ খাড়া করতে না পারে—[১৫০] তবে যারা যালেম, তাদের মুখ কোন অবস্থায়ই বন্ধ হবে না। কাজেই তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো—আর এ জন্য যে, আমি তোমাদের ওপর নিজের অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেবো[১৫১] এবং এই আশায়[১৫২] যে, আমার এই নির্দেশের আনুগত্যের ফলে তোমরা ঠিক তেমনিভাবে সাফল্যের পথ লাভ করবে যেমনিভাবে (তোমরা এই জিনিসটি থেকেও সাফল্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছো যে,) আমি তোমাদের মধ্যে স্বয়ং তোমাদের থেকেই একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে সুসজ্জিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং এমন সব কথা তোমাদের শেখায়, যা তোমরা জানতে না। কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ রাখো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার নিয়ামত অস্বীকার করো না।

যাকে নামায পড়তে হবে তাকে অবশ্যি কোন না কোন দিকে মুখ ফেরাতে হবে। কিন্তু যেদিকে মুখ ফেরানো হয় সেটা আসল জিনিস নয়, আসল জিনিস হচ্ছে সেই নেকী ও কল্যাণগুলো যেগুলো অর্জন করার জন্য নামায পড়া হয়। কাজেই দিক ও স্থানের বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ে নেকী ও কল্যাণ অর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۭ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾

১৯ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ![১৫৩] সবর ও নামাযের দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করো, আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।[১৫৪] আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। এই ধরনের লোকেরা আসলে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা থাকে না।[১৫৫] আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানী হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো। এ অবস্থায় যারা সবর করে এবং যখনই কোন বিপদ আসে বলে ঃ "আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে,[১৫৬]—তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।

১৫০. অর্থাৎ আমাদের এই নির্দেশটি পুরোপুরি মেনে চলো। কখনো যেন তোমাদের ভিন্নরকম আচরণ না দেখা যায়। তোমাদের কাউকে যেন নির্দিষ্ট দিকের পরিবর্তে কখনো অন্য দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখা না যায়। অন্যথায় শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করার সুযোগ পাবে ঃ আহা, কী চমৎকার 'মধ্যপন্থী উম্মাত'! এরাই হয়েছে আবার সত্যের সাক্ষী! এরা মুখে বলে, এই নির্দেশটি আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে কিন্তু কাজের সময় এর বিরুদ্ধাচরণ করছে।

১৫১. এখানে অনুগ্রহ বলতে নেতৃত্ব বুঝানো হয়েছে। বনী ইসরাঈলদের থেকে কেড়ে নিয়ে এই নেতৃত্ব উম্মাতে মুসলিমাকে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ প্রণীত বিধান অনুযায়ী একটি উম্মাতকে দুনিয়ার জাতিসমূহের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করা এবং মানবজাতিকে সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহর ইবাদাতের পথে পরিচালিত করার দায়িত্বে তাকে নিয়োজিত করা ছিল তার সত্যানুসারিতার চরম পুরস্কার। এই নেতৃত্বের দায়িত্ব যে উম্মাতকে দেয়া হয়েছে তার ওপর আসলে আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামত পরিপূর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ

এখানে বলছেন, কিব্‌লাহ পরিবর্তনের এ নির্দেশটি আসলে এই পদে তোমাদের সমাসীন করার নিশানী। কাজেই অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানীর প্রকাশ ঘটলে যাতে এ পদটি তোমাদের থেকে ছিনিয়ে না নেয়া হয় সে জন্যও তোমাদের আমার এই নির্দেশ মেনে চলা দরকার। এটা মেনে চললে তোমাদের প্রতি এই নিয়ামত ও অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে।

১৫২. অর্থাৎ এই নির্দেশ মেনে চলার সময় মনে মনে এই আশা পোষণ করতে থাকো। এটা একটা রাজকীয় বর্ণনাভংগী মাত্র। বিপুল ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহর পক্ষ থেকে যখন তাঁর কোন চাকরকে বলে দেয়া হয়, বাদশাহর পক্ষ থেকে অমুক অমুক অনুগ্রহ ও দানের আশা করতে পারো, তখন কেবলমাত্র এতটুকু ঘোষণা শুনেই সংশ্লিষ্ট চাকর বা রাজকর্মচারী তার গৃহে আনন্দ-উল্লাস করতে পারে এবং লোকেরাও তাকে মোবারকবাদ দিতে পারে।

১৫৩. নেতৃত্ব পদে আসীন করার পর এবার এই উম্মাতকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও বিধান দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সবার আগে যে কথাটির প্রতি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই যে, তোমাদের জন্য যে বিছানা পেতে দেয়া হয়েছে সেটা কোন ফুলের বিছানা নয়। একটি বিরাট, মহান ও বিপদ সংকুল কাজের বোঝা তোমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এই বোঝা মাথায় ওঠাবার সাথে সাথেই তোমাদের ওপর চতুর্দিক থেকে বিপদ-আপদ ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকবে। কঠিন পরীক্ষার মধ্যে তোমাদের ঠেলে দেয়া হবে। অগণিত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সবর, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও দ্বিধাহীন সংকল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিপদ-আপদের মোকাবিলা করে যখন তোমরা আল্লাহর পথে এগিয়ে যেতে থাকবে তখনই তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে তাঁর অনুগ্রহরাশি।

১৫৪. অর্থাৎ এই কঠিন দায়িত্বের বোঝা বহন করার জন্য তোমাদের দু'টো আভ্যন্তরীন শক্তির প্রয়োজন। একটি হচ্ছে, নিজের মধ্যে সবর, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার শক্তির লালন করতে হবে। আর দ্বিতীয়ত নামায পড়ার মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে আরো বিভিন্ন আলোচনায় সবরের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। সেখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণাবলীর সামগ্রিক রূপ হিসেবে সবরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর আসলে এটিই হচ্ছে সমস্ত সাফল্যের চাবিকাঠি। এর সহায়তা ছাড়া মানুষের পক্ষে কোন লক্ষ অর্জনে সফলতা লাভ সম্ভব নয়। এভাবে সামনের দিকে নামায সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। সেখানে দেখানো হয়েছে নামায কিভাবে মু'মিন ব্যক্তি ও সমাজকে এই মহান কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলে।

১৫৫. মৃত্যু শব্দটি এবং এর ধারণা মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে। মৃত্যুর কথা শুনে সে সাহস ও শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাই আল্লাহর পথে শহীদদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তাদেরকে মৃত বললে ইসলামী দলের লোকদের জিহাদ, সংঘর্ষ ও প্রাণ উৎসর্গ করার প্রেরণা স্তব্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। এর পরিবর্তে ঈমানদারদের মনে এই চিন্তা বদ্ধমূল করতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি প্রাণ দেয় সে আসলে চিরন্তন জীবন লাভ করে। এই চিন্তাটি প্রকৃত ব্যাপারের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীলও। এ চিন্তা পোষণের ফলে সাহস ও হিম্মত তরতাজা থাকে এবং উত্তরোত্তর বেড়ে যেতেও থাকে।

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের ওপর বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, তাঁর রহমত তাদেরকে ছায়াদান করবে এবং এই ধরনের লোকরাই হয় সত্যানুসারী।

নিসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিশানীসমূহের অন্তরভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর হজ্জ বা উমরাহ করে[১৫৭] তার জন্য ঐ দুই পাহাড়ের মাঝখানে 'সাঈ' করায় কোন গোনাহ নেই।[১৫৮] আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে কোন সৎ ও কল্যাণের কাজ করে,[১৫৯] আল্লাহ তা জানেন এবং তার যথার্থ মর্যাদা ও মূল্য দান করবেন।

১৫৬. বলার অর্থ কেবল মুখে বলা নয় বরং মনে মনে একথা স্বীকার করে নেয়া যে, "আমরা আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন।" তাই আল্লাহর পথে আমাদের যে কোন জিনিস কুরবানী করা হয়, তা ঠিক তার সঠিক ক্ষেত্রেই ব্যয়িত হয়। যার জিনিস ছিল তার কাজেই ব্যয়িত হয়েছে। আর "আল্লাহরই দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে"—এর অর্থ হচ্ছে, চিরকাল আমাদের এ দুনিয়ায় থাকতে হবে না। অবশেষে একদিন আল্লাহরই কাছে যেতে হবে। কাজেই তাঁর পথে লড়াই করে প্রাণ দান করে তাঁর কাছে চলে যাওয়াটাই তো ভালো। এভাবে মৃতুবরণ করে তাঁর কাছে চলে যাওয়াটা আমাদের স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করে কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বা রোগে ভুগে মৃত্যুবরণ করে তাঁর কাছে চলে যাওয়ার চাইতে লাখো গুণে শ্রেয়।

১৫৭. যিলহজ্জ মাসের নির্ধারিত তারিখে কা'বা শরীফ যিয়ারত করাকে হজ্জ বলে। এই তারিখগুলো ছাড়া অন্য সময় কা'বা যিয়ারত করাকে উমরাহ বলে।

১৫৮. সাফা ও মারওয়া মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়। আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে হজ্জের যে সমস্ত অনুষ্ঠান শিখিয়েছিলেন তার মধ্যে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ' করা বা দৌড়ানো ছিল অন্যতম। পরে মক্কায় ও তার আশপাশের এলাকায় মুশরিকী জাহেলীয়াত তথা পৌত্তলিক ধর্ম ছড়িয়ে পড়লে সাফার ওপর 'আসাফ' ও মারওয়ার ওপর 'নায়েলা'র পূজাবেদী নির্মাণ করা হয়। এর চারদিকে তাওয়াফ করা হতো। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আরববাসীদের কাছে ইসলামের আলো পৌঁছবার পর মুসলমানদের মনে প্রশ্ন দেখা দিল যে, সাফা ও মারওয়ার 'সাঈ' কি হজ্জের অনুষ্ঠানাদির অন্তরভুক্ত অথবা এটা নিছক জাহেলী যুগের মুশরিকদের উদ্ভূত কোন অনুষ্ঠান? কাজেই এই ধরনের একটি কর্মকে হজ্জের অনুষ্ঠানের অন্তরভুক্ত করে তারা কোন মুশরিকী কাজ করে যাচ্ছে কি না এ ব্যাপারে

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ
مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ
عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

যারা আমার অবতীর্ণ উজ্জল শিক্ষাবলী ও বিধানসমূহ গোপন করে, অথচ সমগ্র মানবতাকে পথের সন্ধান দেবার জন্য আমি সেগুলো আমার কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরাও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।[১৬০] তবে যারা এই নীতি পরিহার করে, নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেয় এবং যা কিছু গোপন করে যাচ্ছিল সেগুলো বিবৃত করতে থাকে, তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দেবো আর আসলে আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

তাদের মনে দ্বিধার সঞ্চার হয়। তাছাড়া হযরত আয়েশার (রা) রেওয়ায়াত থেকেও জানা যায়, মদীনাবাসীদের মনে আগে থেকেই সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ের ব্যাপারে অপছন্দ ও বিরক্তির ভাব ছিল। কারণ তারা ছিল 'মানাত'-এর ভক্ত। 'আসাফ' ও 'নায়েলা'কে তারা মানতো না। এসব কারণে মসজিদুল হারামকে কিব্‌লাহ নির্ধারিত করার সময় সাফা ও মারওয়া সম্পর্কিত প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করা এবং এই পাহাড় দু'টির মাঝখানে দৌড়ানো হজ্জের মূল অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ বলে লোকদেরকে জানিয়ে দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। আর এই সংগে লোকদেরকে একথা জানিয়ে দেয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল যে, এই দু'টি স্থানের পবিত্রতা জাহেলী যুগের মুশরিকদের মনগড়া নয় বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে।

১৫৯. অর্থাৎ নির্দেশ মানার জন্য তোমাদের কাজ তো করতেই হবে, তবে ভালো হয় যদি মানসিক আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে তা করো।

১৬০. ইহুদি আলেমদের বৃহত্তম অপরাধ এই ছিল যে, তারা আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান সর্বসাধারণ্যে প্রচার করার পরিবর্তে তাকে রাব্বী ও একটি সীমিত ধর্মীয় পেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ জনমানুষ তো দূরের কথা ইহুদি জনতাকেও এই জ্ঞানের স্পর্শ থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। সাধারণ অজ্ঞতার কারণে জনগণ যখন ব্যাপকভাবে ভ্রষ্টতার শিকার হলো তখন ইহুদি আলেমসমাজ জনগণের চিন্তা ও কর্মের সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়নি। বরং উল্টো জনগণের মধ্যে নিজেদের জনপ্রিয়তা অব্যাহত রাখার জন্য যে ভ্রষ্টতা ও শরীয়াত বিরোধী কর্ম জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তো তাকে তারা নিজেদের কথা ও কাজের সাহায্যে অথবা নীরব সমর্থনের মাধ্যমে বৈধতার ছাড়পত্র দান করতো। এই ধরনের প্রবণতা ও কর্মনীতি অবলম্বন না করার জন্য

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

যারা কুফরীর নীতি[১৬১] অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের ওপর আল্লাহর ফেরেশতাদের ও সমগ্র মানবতার লানত। এই লানত বিদ্ধ অবস্থায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে, তাদের শাস্তি হ্রাস পাবে না এবং তাদের অন্য কোন অবকাশও দেয়া হবে না।

তোমাদের আল্লাহ এক ও একক। সেই দয়াবান ও করুণাময় আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

মুসলমানদেরকে তাকীদ করা হচ্ছে। সমগ্র বিশ্ববাসীকে হিদায়াত করার গুরুদায়িত্ব যে উম্মাতের ওপর সোপর্দ করা হয়েছে, সেই হিদায়াতকে কৃপণের ধনের মতো আগলে না রেখে বেশী করে সম্প্রসারিত করাই হচ্ছে তার কর্তব্য।

১৬১. কুফরের আসল মানে হচ্ছে গোপন করা, লুকানো। এ থেকেই অস্বীকারের অর্থ বের হয়েছে। ঈমানের বিপরীত পক্ষে এ শব্দটি বলা হয়। ঈমান অর্থ মেনে নেয়া, কবুল করা, স্বীকার করা। এর বিপরীতে 'কুফর'–এর অর্থ না মানা, প্রত্যাখ্যান করা, অস্বীকার করা। কুরআনের বর্ণনার প্রেক্ষিতে কুফরীর মনোভাব ও আচরণ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

এক ঃ আল্লাহকে একেবারেই না মানা। অথবা তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্বীকার না করা এবং তাঁকে নিজের ও সমগ্র বিশ্ব–জাহানের মালিক, প্রভু, উপাস্য ও মাবুদ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করা। অথবা তাঁকে একমাত্র মালিক ও মাবুদ বলে না মানা।

দুই ঃ আল্লাহকে মেনে নেয়া কিন্তু তাঁর বিধান ও হিদায়াতসমূহকে জ্ঞান ও আইনের একমাত্র উৎস হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করা।

তিন ঃ নীতিগতভাবে একথা মেনে নেয়া যে, তাকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলতে হবে কিন্তু আল্লাহ তাঁর বিধান ও বাণীসমূহ যেসব নবী–রসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তাদেরকে অস্বীকার করা।

চার ঃ নবীদের মধ্যে পার্থক্য করা এবং নিজের পছন্দ ও মানসিক প্রবণতা বা গোত্রীয় ও দলীয়প্রীতির কারণে তাদের মধ্য থেকে কাউকে মেনে নেয়া এবং কাউকে না মানা।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

২০ রুকূ'

(এই সত্যটি চিহ্নিত করার জন্য যদি কোন নিদর্শন বা আলামতের প্রয়োজন হয় তাহলে) যারা বুদ্ধি-বিবেক ব্যবহার করে তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর ঘটনাকৃতিতে, রাত্রদিনের অনবরত আবর্তনে, মানুষের প্রয়োজনীয় ও উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগর দরিয়ার চলমান জলযানসমূহে, বৃষ্টিধারার মধ্যে, যা আল্লাহ বর্ষণ করেন ওপর থেকে তারপর তার মাধ্যমে মৃত ভূমিকে জীবন দান করেন এবং নিজের এই ব্যবস্থাপনার বদৌলতে পৃথিবীতে সব রকমের প্রাণী ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন, আর বায়ু প্রবাহে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।[১৬২]

পাঁচ ঃ নবী ও রসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও জীবন যাপনের বিধান সম্বলিত যেসব শিক্ষা বিবৃত করেছেন সেগুলো অথবা সেগুলোর কোন কোনটি গ্রহণ করা।

ছয় ঃ এসব কিছুকে মতবাদ হিসেবে মেনে নেয়ার পর কার্যত জেনে বুঝে আল্লাহর বিধানের নাফরমানী করা এবং এই নাফরমানীর ওপর জোর দিতে থাকা। আর এই সঙ্গে দুনিয়ার জীবনে আনুগত্যের পরিবর্তে নাফরমানীর ওপর নিজের কর্মনীতির ভিত্তি স্থাপন করা।

আল্লাহর মোকাবিলায় এসব বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ও কাজ মূলত বিদ্রোহাত্মক। এর মধ্য থেকে প্রতিটি চিন্তা ও কর্মকে কুরআন কুফরী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ ছাড়াও কুরআনের কোন কোন জায়গায় 'কুফর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহর দান, অনুগ্রহ ও নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার অর্থে। সেখানে শোকর বা কৃতজ্ঞতার বিপরীতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'শোকর'-এর অর্থ হচ্ছে, যিনি অনুগ্রহ করেছেন তাঁর প্রতি অনুগৃহীত থাকা, তাঁর অনুগ্রহকে যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দান করা, তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহকে তাঁর সন্তুষ্টি ও নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করা এবং অনুগৃহীত ব্যক্তির মন অনুগ্রহকারীর প্রতি বিশ্বস্ততার আবেগে পরিপূর্ণ থাকা। এর বিপরীত পক্ষে কুফর বা অনুগ্রহের প্রতি

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿۱۶۵﴾

কিন্তু (আল্লাহর একত্বের প্রমাণ নির্দেশক এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও) কিছু লোক আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ দাঁড় করায়[১৬৩] এবং তাদেরকে এমন ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত—অথচ ঈমানদাররা সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভালোবাসে।[১৬৪] হায়! আযাব সামনে দেখে এই যালেমরা যা কিছু অনুধাবন করার তা যদি আজই অনুধাবন করতো যে, সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর অধীন এবং শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর।

অকৃজ্ঞতা হচ্ছে ঃ অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার না করা এবং এই অনুগ্রহকে নিজের যোগ্যতা বা অন্য কারোর দান বা সুপারিশের ফল মনে করা অথবা অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ প্রদান করা সত্ত্বেও তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ করা। এই ধরনের কুফরীকে আমরা নিজেদের ভাষায় সাধারণত কৃতঘ্নতা, অকৃতজ্ঞতা, নিমকহারামী ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি।

১৬২. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের এই যে বিশাল কারখানা মানুষের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত সক্রিয়, মানুষ যদি তাকে নিছক নির্বোধ জন্তু-জানোয়ারের দৃষ্টিতে না দেখে বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে বিচার বিশ্লেষণ করে তার সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সকল প্রকার হঠধর্মিতা পরিহার করে পক্ষপাতহীনভাবে মুক্ত মনে চিন্তা করে তাহলে চতুর্দিকে যেসব নিদর্শন সে প্রত্যক্ষ করছে সেগুলো তাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়ার জন্য যথেষ্ট যে, বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা একজন অসীম ক্ষমতাধর জ্ঞানবান সত্তার বিধানের অনুগত। সমস্ত ক্ষমতা-কর্তৃত্ব সেই একক সত্তার হাতে কেন্দ্রীভূত। এই ব্যবস্থাপনায় অন্য কারোর স্বাধীন হস্তক্ষেপের বা অংশীদারীত্বের সামান্যতম অবকাশই নেই। কাজেই প্রকৃতপক্ষে সমগ্র সৃষ্টিজগতের তিনিই একমাত্র প্রভু, ইলাহ ও আল্লাহ। তাঁর ছাড়া আর কোন সত্তার কোন বিষয়ে সামান্যতম ক্ষমতাও নেই। কাজেই খোদায়ী কর্তৃত্ব ও উপাস্য হবার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে আর কারোর কোন অংশ নেই।

১৬৩. অর্থাৎ সার্বভৌম কর্তৃত্বের যে বিশেষ গুণাবলী একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত তার মধ্য থেকে কোন কোনটাকে অন্যদের সাথে সম্পর্কিত করে। আর আল্লাহ হিসেবে বান্দার ওপর তাঁর যে অধিকার রয়েছে তার মধ্য থেকে কোন কোনটা তারা তাদের এসব বানোয়াট মাবুদদের জন্যও আদায় করে। যেমন বিশ্ব-জগতের যাবতীয় কার্যকারণ পরম্পরার ওপর কর্তৃত্ব, অভাব দূর করা ও প্রয়োজন পূর্ণ করা, সংকট মোচন, অভিযোগ ও প্রার্থনা শ্রবণ, দৃশ্য-অদৃশ্য নির্বিশেষে সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়ার—এ গুণগুলো একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। বান্দা একমাত্র আল্লাহকেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

যখন তিনি শাস্তি দেবেন তখন এই সমস্ত নেতা ও প্রধান ব্যক্তিরা, দুনিয়ায় যাদের অনুসরণ করা হতো, তাদের অনুগামীদের সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করতে থাকবে। কিন্তু শাস্তি তারা পাবেই এবং তাদের সমস্ত উপায়–উপকরণের ধারা ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যেসব লোক দুনিয়ায় তাদের অনুসারী ছিল তারা বলতে থাকবে, হায়! যদি আমাদের আর একবার সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আজ এরা যেমন আমাদের সাথে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছে তেমনি আমরাও এদের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে দেখিয়ে দিতাম।[১৬৫] এভাবেই দুনিয়ায় এরা যে সমস্ত কাজ করছে সেগুলো আল্লাহ তাদের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করবেন যাতে তারা কেবল দুঃখ ও আক্ষেপই করতে থাকবে কিন্তু জাহান্নামের আগুন থেকে বের হবার কোন পথই খুঁজে পাবে না।

বলে মানবে, একমাত্র তাঁরই সামনে বন্দেগীর স্বীকৃতি সহকারে মাথা নোয়াবে, নিজের অভাব–অভিযোগ–প্রয়োজন পূরণের জন্য তাঁরই দিকে এগিয়ে যাবে, তাঁরই কাছে সাহায্যের আবেদন জানাবে, তাঁরই ওপর ভরসা ও নির্ভর করবে, তাঁরই কাছে আশা করবে এবং একমাত্র তাঁকেই ভয় করবে বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবেও—এগুলো হচ্ছে বান্দার ওপর আল্লাহর হক। অনুরূপভাবে সমগ্র বিশ্ব–জগতের একচ্ছত্র মালিক হবার কারণে মানুষের জন্য হালাল–হারামের সীমা নির্ধারণ করার, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপণের, তাদের আদেশ নিষেধের বিধান দান করার এবং তিনি মানুষকে যেসব শক্তি ও উপায় উপকরণ দান করেছেন সেগুলো তারা কিভাবে, কোন কাজে এবং কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে তা জানিয়ে দেয়ার ও নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর আছে। এ ছাড়া বান্দার ওপর আল্লাহর যে অধিকার সেই অনুযায়ী বান্দা একমাত্র আল্লাহকেই সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী বলে স্বীকার করে নেবে। তাঁর নির্দেশকে আইনের উৎস হিসেবে মেনে নেবে। তাঁকেই যে কোন কাজের আদেশ করার ও তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দান করার একচ্ছত্র অধিকারী মনে করবে। নিজের জীবনের সকল ব্যাপারেই তাঁর নির্দেশকে চূড়ান্ত গণ্য করবে। দুনিয়ায় জীবন যাপন করার জন্য বিধান ও পথনির্দেশনা লাভের ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর এই গুণাবলীর মধ্য থেকে কোন একটি গুণকেও অন্যের সাথে সম্পর্কিত করে এবং তাঁর এই অধিকারগুলোর

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۶۸﴾ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ
وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶۹﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا
مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ
اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۷۰﴾ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّ بُكْمٌ
عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷۱﴾

২১ রুকূ’

হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যে সমস্ত হালাল ও পাক জিনিস রয়েছে সেগুলো খাও এবং শয়তানের দেখানো পথে চলো না।[১৬৬] সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তোমাদের অসৎকাজ ও অনাচারের নির্দেশ দেয় আর একথাও শেখায় যে, তোমরা আল্লাহর নামে এমন সব কথা বলো যেগুলো আল্লাহ বলেছেন বলে তোমাদের জানা নেই।[১৬৭]

তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তা মেনে চলো, জবাবে তারা বলে, আমাদের বাপ–দাদাদের যে পথের অনুসারী পেয়েছি আমরা তো সে পথে চলবো।[১৬৮] আচ্ছা, তাদের বাপ–দাদারা যদি একটুও বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ না করে থেকে থাকে এবং সত্য–সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে থাকে তাহলেও কি তারা তাদের অনুসরণ করে যেতে থাকবে? আল্লাহ প্রদর্শিত পথে চলতে যারা অস্বীকার করেছে তাদের অবস্থা ঠিক তেমনি যেমন রাখাল তার পশুদের ডাকতে থাকে কিন্তু হাঁক ডাকের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই তাদের কানে পৌঁছে না।[১৬৯] তারা কালা, বোবা ও অন্ধ, তাই কিছুই বুঝতে পারে না।

মধ্য থেকে কোন একটি অধিকারও অন্যকে দান করে, সে আসলে নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বা যে সংস্থা এই গুণাবলীর মধ্য থেকে কোন একটি গুণেরও দাবীদার সাজে এবং মানুষের কাজ ঐ অধিকারগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি অধিকার দাবী করে সেও মুখে খোদায়ী কর্তৃত্বের দাবী না করলেও আসলে আল্লাহর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ সাজে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর ইবাদাতকারী হয়ে থাকো, তাহলে যে সমস্ত পাক–পবিত্র জিনিস আমি তোমাদের দিয়েছি সেগুলো নিশ্চিন্তে খাও এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[১৭০] *আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর যদি কোন নিষেধাজ্ঞা থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই যে, মৃতদেহ খেয়ো না, রক্ত ও শূকরের গোশত থেকে দূরে থাকো। আর এমন কোন জিনিস খেয়ো না যার ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়া হয়েছে।*[১৭১] *তবে যে ব্যক্তি অক্ষমতার মধ্যে অবস্থান করে এবং এ অবস্থায় আইন ভংগ করার কোন প্রেরণা ছাড়াই বা প্রয়োজনের সীমা না পেরিয়ে এর মধ্য থেকে কোনটা খায়, সে জন্য তার কোন গোনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।*[১৭২]

১৬৪. অর্থাৎ এটা ঈমানের দাবী। একজন ঈমানদারের কাছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্য সবার সন্তুষ্টির ওপর অগ্রাধিকার লাভ করবে এবং কোন জিনিসের প্রতি ভালোবাসা তার মনে এমন প্রভাব বিস্তার করবে না এবং এমন মর্যাদার আসনে সমাসীন হবে না যার ফলে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার মোকাবিলায় তাকে পরিহার করতে সে কখনো কুণ্ঠিত হবে না।

১৬৫. এখানে পথভ্রষ্টকারী নেতৃবর্গ ও তাদের নির্বোধ অনুসারীদের পরিণতির উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী নবীদের উম্মাতরা যে সমস্ত ভুলের শিকার হয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছিল মুসলমানরা যেন সে সম্পর্কে সতর্ক হয় এবং ভুল ও নির্ভুল নেতৃত্ব এবং সঠিক ও বেঠিক নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে। ভুল ও বেঠিক নেতৃত্বের পেছনে চলা থেকে যেন তারা নিজেদেরকে বিরত রাখতে পারে।

১৬৬. অর্থাৎ পানাহারের ক্ষেত্রে কুসংস্কার ও জাহেলী রীতিনীতির ভিত্তিতে যেসব বিধি–নিষেধের প্রচলন রয়েছে সেগুলো ভেঙে ফেলো।

১৬৭. অর্থাৎ এই সমস্ত কুসংস্কার ও তথাকথিত বিধি–নিষেধকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ধর্মীয় বিষয়াবলী মনে করা আসলে শয়তানী প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ এগুলো যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে, এ ধারণার পেছনে কোন প্রমাণ নেই।

১৬৮. অর্থাৎ বাপ–দাদাদের থেকে এভাবেই চলে আসছে এ ধরনের খোঁড়া যুক্তি পেশ করা ছাড়া তাদের কাছে এসব বিধি–নিষেধের পক্ষে পেশ করার মতো আর কোন সবল যুক্তি–প্রমাণ নেই। বোকারা মনে করে কোন পদ্ধতির অনুসরণ করার জন্য এই ধরনের যুক্তি যথেষ্ট।

১৬৯. এই উপমাটির দু'টি দিক রয়েছে। এক, তাদের অবস্থা সেই নির্বোধ প্রাণীদের মতো, যারা এক একটি পালে বিভক্ত হয়ে নিজেদের রাখালদের পেছনে চলতে থাকে এবং না জেনে বুঝেই তাদের হাঁক–ডাকের ওপর চলতে ফিরতে থাকে। দুই, এর দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে, তাদেরকে আহবান করার ও তাদের কাছে দীনের দাওয়াত প্রচারের সময় মনে হতে থাকে যেন নির্বোধ জন্তু–জানোয়ারদেরকে আহবান জানানো হচ্ছে, তারা কেবল আওয়াজ শুনতে পারে কিন্তু কি বলা হচ্ছে তা কিছুই বুঝতে পারে না। আল্লাহ এখানে এমন দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার ফলে এই দু'টি দিকই এখানে একই সাথে ফুটে উঠেছে।

১৭০. অর্থাৎ যদি তোমরা ঈমান এনে কেবলমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুসারী হয়ে থাকো, যেমন তোমরা দাবী করছো, তাহলে জাহেলী যুগে তোমাদের ধর্মীয় পণ্ডিত, পুরোহিত, পাদরী, যাজক, যোগী ও সন্যাসীরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব অবাঞ্ছিত আচার–আচরণ ও বিধি–নিষেধের বেড়াজাল সৃষ্টি করেছিল সেগুলো ছিন্ন ভিন্ন করে দাও। আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন তা থেকে অবশ্যি দূরে থাকো। কিন্তু যেগুলো আল্লাহ হালাল করেছেন কোন প্রকার ঘৃণা–সংকোচ ছাড়াই সেগুলো পানাহার করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিম্নোক্ত হাদীসে এদিকেই ইংগিত করেছেন।

مَنْ صَلَّى صَلَوٰتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَالِكَ الْمُسْلِمُ الخ।

"যে ব্যক্তি আমাদের মতো করে নামায পড়ে, আমরা যে কিব্‌লাহর দিকে মুখ করে নামায পড়ি তার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এবং আমাদের যবেহ করা প্রাণীর গোশত খায় সে মুসলমান।"

এর অর্থ হচ্ছে, নামায পড়া ও কিব্‌লাহর দিকে মুখ করা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি ততক্ষণ ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করতে পারে না যতক্ষণ না সে পানাহারের ব্যাপারে অতীতের জাহেলী যুগের বিধি–নিষেধগুলো ভেঙ্গে ফেলে এবং জাহেলিয়াত পন্থীরা এ ব্যাপারে যে সমস্ত কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল সেগুলো থেকে মুক্ত হয়। কারণ এই জাহেলী বিধি–নিষেধগুলো মেনে চলাটাই একথা প্রমাণ করবে যে, জাহেলিয়াতের বিষ এখনো তার শিরা উপশিরায় গতিশীল।

১৭১. এই নিষেধাজ্ঞাটি এমন সব প্রাণীর গোশতের ওপর আরোপিত হয় যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নামে যবেহ করা হয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে নজরানা হিসেবে যে খাদ্য তৈরি করা হয় তার ওপরও আরোপিত হয়। আসলে প্রাণী, শস্য, ফলমূল বা অন্য যে কোন খাদ্যের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তিনিই ঐ জিনিসগুলো আমাদের

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

মূলত আল্লাহ তাঁর কিতাবে যে সমস্ত বিধান অবতীর্ণ করেছেন সেগুলো যারা গোপন করে এবং সামান্য পার্থিব স্বার্থের বেদীমূলে সেগুলো বিসর্জন দেয় তারা আসলে আগুন দিয়ে নিজেদের পেট ভর্তি করছে।[১৭৩] কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথাই বলবেন না, তাদের পবিত্রতার ঘোষণাও দেবেন না[১৭৪] এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এরাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা কিনে নিয়েছে এবং ক্ষমার বিনিময়ে কিনেছে শাস্তি। এদের কী অদ্ভুত সাহস দেখো। জাহান্নামের আযাব বরদাস্ত করার জন্যে এরা প্রস্তুত হয়ে গেছে। এসব কিছুই ঘটার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তো যথার্থ সত্য অনুযায়ী কিতাব নাযিল করেছিলেন কিন্তু যারা কিতাবে মতবিরোধ উদ্ভাবন করেছে তারা নিজেদের বিরোধের ক্ষেত্রে সত্য থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

দান করেছেন। কাজেই সেগুলোর ওপর অনুগ্রহের স্বীকৃতি, সাদকাহ বা নজরানা হিসেবে একমাত্র আল্লাহরই নাম নেয়া যেতে পারে। আর কারোর নয়। এগুলোর ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়ার অর্থ হবে, আল্লাহর পরিবর্তে অথবা আল্লাহর সাথে সাথে তার প্রাধান্যও স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে এবং তাকেও অনুগ্রহকারী ও নিয়ামত দানকারী মনে করা হচ্ছে।

১৭২. এই আয়াতে তিনটি শর্ত সাপেক্ষে হারাম জিনিসের ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এক, যথার্থ অক্ষমতার মুখোমুখি হলে, যেমন ক্ষুধা বা পিপাসা প্রাণ সংহারক প্রমাণিত হতে থাকলে, অথবা রোগের কারণে প্রাণনাশের আশংকা থাকলে এবং এ অবস্থায় হারাম জিনিস ছাড়া আর কিছু না পাওয়া গেলে। দুই, মনের মধ্যে আল্লাহর আইন ভংগ করার ইচ্ছা পোষণ না করলে। তিন, প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করলে যেমন

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

২২ রুকূ'

তোমাদের মুখ পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরাবার মধ্যে কোন পুণ্য নেই।[১৭৫] বরং সৎকাজ হচ্ছে এই যে, মানুষ আল্লাহ, কিয়ামতের দিন, ফেরেশতা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও নবীদেরকে মনে প্রাণে মেনে নেবে এবং আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রাণপ্রিয় ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করবে। আর নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দান করবে। যারা অংগীকার করে তা পূর্ণ করবে এবং বিপদে-অনটনে ও হক-বাতিলের সংগ্রামে সবর করবে তারাই সৎ ও সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী।

কোন হারাম পানীয়ের কয়েক ফোঁটা বা কয়েক ঢোক পান করলে অথবা হারাম খাদ্যের কয়েক মুঠো খেলে যদি প্রাণ বাঁচে তাহলে তার বেশী ব্যবহার না করা।

১৭৩. এর অর্থ হচ্ছে, সাধারণ লোকদের মধ্যে যত প্রকার বিভ্রান্তিকর কুসংস্কার প্রচলিত আছে এবং বাতিল রীতিনীতি ও অর্থহীন বিধি-নিষেধের যেসব নতুন নতুন শরীয়াত তৈরি হয়ে গেছে—এসবগুলোর জন্য দায়ী হচ্ছে সেই আলেম সমাজ, যাদের কাছে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান ছিল কিন্তু তারা সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌঁছায়নি। তারপর অজ্ঞতার কারণে লোকদের মধ্যে যখন ভুল পদ্ধতির প্রচলন হতে থাকে তখনো ঐ জালেম গোষ্ঠী মুখ বন্ধ করে বসে থেকেছে। বরং আল্লাহর কিতাবের বিধানের ওপর আবরণ পড়ে থাকাটাই নিজেদের জন্য লাভজনক বলে তাদের অনেকেই মনে করেছে।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হত্যার ব্যাপারে কিসাসের বিধান লিখে দেয়া হয়েছে।[১৭৬] স্বাধীন ব্যক্তি হত্যা করে থাকলে তার বদলায় ঐ স্বাধীন ব্যক্তিকেই হত্যা করা হবে, দাস হত্যাকারী হলে ঐ দাসকেই হত্যা করা হবে, আর নারী এই অপরাধ সংঘটিত করলে সেই নারীকে হত্যা করেই এর কিসাস নেয়া হবে।[১৭৭] তবে কোন হত্যাকারীর সাথে তার ভাই যদি কিছু কোমল ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়,[১৭৮] তাহলে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী[১৭৯] রক্তপণ দানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং সততার সঙ্গে রক্তপণ আদায় করা হত্যাকারীর জন্য অপরিহার্য। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে দণ্ড হ্রাস ও অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে[১৮০] তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৭৪. যেসব ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মিথ্যা দাবী করে এবং জনগণের মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে মিথ্যা ও বানোয়াট প্রচারণা চালায় এখানে আসলে তাদের সমস্ত দাবী ও প্রচারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিজেদের পূত–পবিত্র সত্তার অধিকারী হবার এবং যে ব্যক্তি তাদের পেছনে চলবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তার সুপারিশ করে তার গোনাহখাতা মাফ করিয়ে নেয়ার ধারণা জনগণের মনে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করে এবং জনগণও তাদের একথায় বিশ্বাস করে। জবাবে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলছেন, আমি তাদের সাথে কথাই বলবো না এবং তাদের পবিত্রতার ঘোষণাও দেবো না।

১৭৫. পূর্ব ও পশ্চিমের দিকে মুখ করার বিষয়টিকে নিছক উপমা হিসেবে আনা হয়েছে। আসলে এখানে যে কথাটি বুঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে, ধর্মের কতিপয় বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন করা, শুধুমাত্র নিয়ম পালনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত কয়েকটা ধর্মীয় কাজ করা এবং তাকওয়ার কয়েকটা পরিচিত রূপের প্রদর্শনী করা আসল সৎকাজ নয় এবং আল্লাহর কাছে এর কোন গুরুত্ব ও মূল্য নেই।

১৭৬. 'কিসাস' হচ্ছে রক্তপাতের বদলা বা প্রতিশোধ। অর্থাৎ হত্যাকারীর সাথে এমন ব্যবহার করা যেমন সে নিহত ব্যক্তির সাথে করেছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, হত্যাকারী যেভাবে নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে ঠিক সেভাবেই তাকেও হত্যা করতে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সে একজনকে হত্যা করেছে, তাকেও হত্যা করা হবে।

১৭৭. জাহেলী যুগে হত্যার বদলা নেয়ার ব্যাপারে একটি পদ্ধতি প্রচলন ছিল। কোন জাতি বা গোত্রের লোকেরা তাদের নিহত ব্যক্তির রক্তকে যে পর্যায়ের মূল্যবান মনে করতো হত্যাকারীর পরিবার, গোত্র বা জাতির কাছ থেকে ঠিক সেই পরিমাণ মূল্যের রক্ত আদায় করতে চাইতো। নিহত ব্যক্তির বদলায় কেবলমাত্র হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করেই তাদের কলিজা ঠাণ্ডা হতো না। বরং নিজেদের একজন লোক হত্যা করার প্রতিশোধ নিতে চাইতো তারা প্রতিপক্ষের শত শত লোককে হত্যা করে। তাদের কোন অভিজাত ও সম্মানী ব্যক্তি যদি অন্য গোত্রের একজন সাধারণ ও নীচু স্তরের লোকের হাতে মারা যেতো, তাহলে এ ক্ষেত্রে তারা নিছক হত্যাকারীকে হত্যা করাই যথেষ্ট মনে করতো না। বরং হত্যাকারীর গোত্রের ঠিক সমপরিমাণ অভিজাত ও মর্যাদাশীল কোন ব্যক্তির প্রাণ সংহার করতে অথবা তাদের কয়েকজনকে হত্যা করতে চাইতো। বিপরীত পক্ষে নিহত ব্যক্তি তাদের দৃষ্টিতে যদি কোন সামান্য ব্যক্তি হতো আর অন্যদিকে হত্যাকারী হতো বেশী মর্যাদাশীল ও অভিজাত, তাহলে এ ক্ষেত্রে তারা নিহত ব্যক্তির প্রাণের বদলায় হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করতে দিতে চাইতো না। এটা কেবল প্রাচীন জাহেলী যুগের রেওয়াজ ছিল না। বর্তমান যুগেও যাদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুসভ্য জাতি মনে করা হয় তাদের সরকারী ঘোষণাবলীতেও অনেক সময় নির্লজ্জের মতো দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে দেয়া হয় ঃ আমাদের একজন নিহত হলে আমরা হত্যাকারীর জাতির পঞ্চাশজনকে হত্যা করবো। প্রায়ই আমরা শুনতে পাই, এক ব্যক্তিকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য পরাজিত ও অধীনস্থ জাতির আটককৃত বহু ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। এই বিশ শতকের একটি 'সুসভ্য' জাতি নিজেদের এক ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে সমগ্র মিসরীয় জাতির ওপর। অন্যদিকে এই তথাকথিত সুসভ্য জাতিগুলোর বিধিবদ্ধ আদালতসমূহেও দেখা যায়, হত্যাকারী যদি শাসক জাতির এবং নিহত ব্যক্তি পরাজিত ও অধীনস্থ জাতির অন্তরভুক্ত হয়, তাহলে তাদের বিচারকরা প্রাণদণ্ডের সিদ্ধান্ত দিতে চায় না। এসব অন্যায় ও অবিচারের পথ বন্ধ করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নিহত ব্যক্তি ও হত্যকারীর কোন প্রকার মর্যাদার বাছ–বিচার না করে নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শুধুমাত্র হত্যাকারীরই প্রাণ সংহার করা হবে।

১৭৮. "ভাই" শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কোমল ব্যবহার করার সুপারিশও করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের ও তার মধ্যে চরম শত্রুতার সম্পর্ক থাকলেও আসলে সে তোমাদের মানবিক ভ্রাতৃসমাজেরই একজন সদস্য। কাজেই তোমাদের একজন অপরাধী ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে নিজেদের প্রতিশোধ স্পৃহাকে যদি দমন করতে পারো তাহলে এটাই হবে তোমাদের মানবিক ব্যবহারের যথার্থ উপযোগী। এ আয়াত থেকে একথাও জানা গেলো যে, ইসলামী দণ্ডবিধিতে নরহত্যার মতো মারাত্মক বিষয়টিও উভয় পক্ষের মর্জীর ওপর নির্ভরশীল। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে মাফ করে দেয়ার অধিকার রাখে এবং এ অবস্থায় হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের ওপর জোর দেয়া আদালতের জন্য বৈধ নয়। তবে পরবর্তী আয়াতগুলোর বর্ণনা অনুযায়ী হত্যাকারীকে মাফ করে দেয়া হলে তাকে অবশ্যি রক্তপণ আদায় করতে হবে।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾
كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۚ الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ
بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ
فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨٢﴾

হে বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন লোকেরা! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে জীবন রয়েছে।[১৮১] আশা করা যায়, তোমরা এই আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে সতর্ক হবে।

তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি ত্যাগ করে যেতে থাকলে পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনদের জন্য প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী অসিয়ত করে যাওয়াকে তার জন্য ফরয করা হয়েছে, মুত্তাকীদের জন্য এটা একটা অধিকার।[১৮২] তারপর যদি কেউ এই অসিয়ত শুনার পর তার মধ্যে পরিবর্তন করে ফেলে তাহলে ঐ পরিবর্তনকারীরাই এর সমস্ত গোনাহের ভাগী হবে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। তবে যদি কেউ অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে পক্ষপাতিত্ব বা হক নষ্ট হবার আশংকা করে এবং সে বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তাহলে তার কোন গোনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১৭৯. এখানে কুরআনে "মা'রুফ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি যার সাথে সাধারণত সবাই সুপরিচিত। প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ ব্যক্তি যার কোন স্বার্থ এর সাথে জড়িত নেই, সে প্রথম দৃষ্টিতেই যেন এর সম্পর্কে বলে ওঠে হাঁ এটিই ভারসাম্যপূর্ণ ও উপযোগী কর্মপদ্ধতি। প্রচলিত রীতিকেও (Common Law) ইসলামী পরিভাষায় "উরুফ" ও "মা'রুফ" বলা হয়। যেসব ব্যাপারে শরীয়াত কোন বিশেষ নিয়ম নির্ধারণ করেনি এমন সব ব্যাপারেই একে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

১৮০. যেমন হত্যাকারীর উত্তরাধিকারীরা রক্তপণ আদায় করার পরও আবার প্রতিশোধ নেয়ার প্রচেষ্টা চালায় অথবা হত্যাকারী রক্তপণ আদায় করার ব্যাপারে টালবাহানা করে

এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা তার প্রতি যে উদারতা প্রদর্শন করে নিজের অকৃতজ্ঞ ব্যবহারের মাধ্যমে তার জবাব দেয়। এসবগুলোকেই বাড়াবাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৮১. এটি দ্বিতীয় একটি জাহেলী চিন্তা ও কর্মের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। আগের মতো আজো বহু মস্তিষ্কে এই চিন্তা দানা বেঁধে আছে। জাহেলিয়াত পন্থীদের একটি দল যেমন প্রতিশোধ গ্রহণের প্রশ্নে এক প্রান্তিকতায় চলে গেছে তেমনি আর একটি দল ক্ষমার প্রশ্নে আর এক প্রান্তিকতায় চলে গেছে এবং প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে তারা এমন জবরদস্ত প্রচারণা চালিয়েছে যার ফলে অনেক লোক একে একটি ঘৃণ্য ব্যাপার মনে করতে শুরু করেছে এবং দুনিয়ার বহু দেশ প্রাণদণ্ড রহিত করে দিয়েছে। কুরআন এ প্রসংগে বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্বোধন করে তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, কিসাস বা 'প্রাণ হত্যার শাস্তি স্বরূপ প্রাণদণ্ডাদেশের' ওপর সমাজের জীবন নির্ভর করছে। মানুষের প্রাণের প্রতি যারা মর্যাদা প্রদর্শন করে না তাদের প্রাণের প্রতি যে সমাজ মর্যাদা প্রদর্শন করে সে আসলে তার জামার আস্তিনে সাপের লালন করছে। তোমরা একজন হত্যাকারীর প্রাণ রক্ষা করে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের প্রাণ সংকটাপন্ন করে তুলছো।

১৮২. এ বিধানটি এমন এক যুগে দেয়া হয়েছিল, যখন উত্তরাধিকার বন্টন সম্পর্কিত কোন আইন ছিলো না। সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তিকে অসিয়তের মাধ্যমে তার উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এভাবে মৃত্যুর পরে পরিবারের মধ্যে কোন বিরোধ এবং কোন হকদারের হক নষ্ট হবারও ভয় থাকে না। পরে উত্তরাধিকার বন্টনের জন্য আল্লাহ নিজেই যখন একটি বিধান দিলেন (সূরা আন নিসায় এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওসীয়ত ও মীরাসের বিধান ব্যাখ্যা প্রসংগে নিম্নোক্ত নিয়ম দু'টি ব্যক্ত করলেন ঃ

এক ঃ এখন থেকে ওয়ারিসের জন্য কোন ব্যক্তি আর কোন অসিয়ত করতে পারবে না। অর্থাৎ যেসব আত্মীয়ের অংশ কুরআন নির্ধারিত করে দিয়েছে, অসিয়তের মাধ্যমে তাদের অংশ কম-বেশী করা যাবে না এবং কোন ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারীকে মীরাস থেকে বঞ্চিতও করা যাবে না। আর কোন ওয়ারিস আইনগতভাবে যা পায় অসিয়তের সাহায্যে তার চেয়ে বেশী কিছু তাকে দেয়াও যাবে না।

দুই ঃ সমগ্র সম্পদ ও সম্পত্তির মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ অসিয়ত করা যেতে পারে।

এ দু'টি ব্যাখ্যামূলক নির্দেশের পর এখন এই আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ ওয়ারিসদের জন্য রেখে যেতে হবে। মৃত্যুর পর এগুলো মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে কুরআন নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী বন্টিত হবে। আর এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুর আগে অসিয়ত করে যেতে পারে তার এমন সব আত্মীয়ের জন্য যারা তার উত্তরাধিকারী নয়। তার নিজের গৃহে বা পরিবারে যারা সাহায্য লাভের মুখাপেক্ষী অথবা পরিবারের বাইরে যাদেরকে সে সাহায্য লাভের যোগ্য মনে করে বা যেসব জনকল্যাণমূলক কাজে সাহায্য দান করা প্রয়োজনীয় বলে সে মনে করে—এমন সব ক্ষেত্রে সে ঐ এক-তৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত করে যেতে পারে। পরবর্তীকালে লোকেরা এ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

২৩ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। এ থেকে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলী সৃষ্টি হয়ে যাবে।[১৮৩] এ কতিপয় নির্দিষ্ট দিনের রোযা। যদি তোমাদের কেউ হয়ে থাকে রোগগ্রস্ত অথবা মুসাফির তাহলে সে যেন অন্য দিনগুলোয় এই সংখ্যা পূর্ণ করে। আর যাদের রোযা রাখার সামর্থ আছে (এরপরও রাখে না) তারা যেন ফিদিয়া দেয়। একটি রোযার ফিদিয়া একজন মিসকিনকে খাওয়ানো। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কিছু বেশী সৎকাজ করে, তা তার জন্য ভালো। তবে যদি তোমরা সঠিক বিষয় অনুধাবন করে থাকো[১৮৪] তাহলে তোমাদের জন্য রোযা রাখাই ভালো।[১৮৫]

অসিয়তের নির্দেশটিকে নিছক একটি সুপারিশমূলক বিধান গণ্য করে। এমনকি সাধারণভাবে অসিয়ত একটি 'মানসুখ' বা রহিত পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদে এটিকে একটি 'হক'—অধিকার গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে মুত্তাকীদের ওপর এই হক বর্তেছে। এই হকটি যথাযথভাবে আদায় করা হতে থাকলে মীরাসের ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এবং যেগুলো আজকের সমাজ মানসকে অনেক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে তার মীমাংসা অতি সহজেই হয়ে যেতে পারে। যেমন দাদা ও নানার জীবদ্দশায় যেসব নাতি–নাতনীর বাপ বা মা মারা যায় তাদেরকে এই এক–তৃতীয়াংশ অসিয়ত থেকে সহজেই অংশ দান করা যায়।

১৮৩. ইসলামের অন্যান্য বিধানের মতো রোযাও পর্যায়ক্রমে ফরয হয়। শুরুতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে মাত্র প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ রোযা ফরয ছিল না। তারপর দ্বিতীয় হিজরীতে রমযান মাসের রোযার এই বিধান কুরআনে নাযিল হয়। তবে এতে এতটুকুন সুযোগ দেয়া হয়, রোযার কষ্ট বরদাশত করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যারা রোযা রাখবেন না তারা প্রত্যেক রোযার

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

রমযানের মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য পুরোপুরি হিদায়াত এবং এমন দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা সম্বলিত, যা সত্য–সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। কাজেই এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাসের সাক্ষাত পাবে তার জন্য এই সম্পূর্ণ মাসটিতে রোযা রাখা অপরিহার্য এবং যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয় বা সফরে থাকে, সে যেন অন্য দিনগুলোয় রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে।[১৮৬] আল্লাহ তোমাদের সাথে নরম নীতি অবলম্বন করতে চান, কঠোর নীতি অবলম্বন করতে চান না। তাই তোমাদেরকে এই পদ্ধতি জানানো হচ্ছে, যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদের যে হিদায়াত দান করেছেন সে জন্য যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে ও তার স্বীকৃতি দিতে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।[১৮৭]

বদলে একজন মিসকিনকে আহার করাবে। পরে দ্বিতীয় বিধানটি নাযিল হয়। এতে পূর্ব প্রদত্ত সাধারণ সুযোগ বাতিল করে দেয়া হয়। কিন্তু রোগী মুসাফির, গর্ভবতী মহিলা বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতা এবং রোযা রাখার ক্ষমতা নেই এমন সব বৃদ্ধদের জন্য এ সুযোগটি আগের মতোই বহাল রাখা হয়। পরে ওদের অক্ষমতা দূর হয়ে গেলে রমযানের যে ক'টি রোযা তাদের বাদ গেছে সে ক'টি পূরণ করে দেয়ার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়।

১৮৪. অর্থাৎ একাধিক মিসকিনকে আহার করায় অথবা রোযাও রাখে আবার মিসকিনকেও আহার করায়।

১৮৫. দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের আগে রমযানের রোযা সম্পর্কে যে বিধান নাযিল হয়েছিল এ পর্যন্ত সেই প্রাথমিক বিধানই বর্ণিত হয়েছে। এর পরবর্তী আয়াত এর এক বছর পরে নাযিল হয় এবং বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়।

১৮৬. সফররত অবস্থায় রোযা না রাখা ব্যক্তির ইচ্ছা ও পছন্দের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফরে যেতেন। তাঁদের কেউ রোযা রাখতেন আবার কেউ রাখতেন না। উভয় দলের কেউ পরস্পরের বিরুদ্ধে

আপত্তি উঠাতেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও সফরে কখনো রোযা রেখেছেন, কখনো রাখেননি। এক সফরে এক ব্যক্তি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলো। তার চারদিকে লোক জড়ো হয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলেন। বলা হলো, এই ব্যক্তি রোযা রেখেছে। জবাব দিলেন ঃ এটা সৎকাজ নয়। যুদ্ধের সময় তিনি রোযা না রাখার নির্দেশ জারী করতেন, যাতে দুশমনের সাথে পাঞ্জা লড়বার ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্বলতা দেখা না দেয়। হযরত উমর (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, "দু'বার আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রমযান মাসে যুদ্ধে যাই। প্রথমবার বদরে এবং শেষবার মক্কা বিজয়ের সময়। এই দু'বারই আমরা রোযা রাখিনি।" ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ انه يوم قتال فافطروا "এটা কাফেরদের সাথে লড়াইয়ের দিন, কাজেই রোযা রেখো না।" অন্য হাদীসে নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ انكم قد دنوتم عدوكم فافطروا اقوى لكم অর্থাৎ "শত্রুর সাথে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কাজেই রোযা রেখো না। এর ফলে তোমরা যুদ্ধ করার শক্তি অর্জন করতে পারবে।"

সাধারণ সফরের ব্যাপারে কতটুকুন দূরত্ব অতিক্রম করলে রোযা ভাঙা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট হয় না। সাহাবায়ে কেরামের কাজও এ ব্যাপারে বিভিন্ন। এ ব্যাপারে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যে পরিমাণ দূরত্ব সাধারণ্যে সফর হিসেবে পরিগণিত এবং যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করলে মুসাফিরী অবস্থা অনুভূত হয়, তাই রোযা ভাঙার জন্য যথেষ্ট।

যেদিন সফর শুরু করা হয় সেদিনের রোযা না রাখা ব্যক্তির নিজের ইচ্ছাধীন, এটি একটি সর্বসম্মত বিষয়। মুসাফির চাইলে ঘর থেকে খেয়ে বের হতে পারে আর চাইলে ঘর থেকে বের হয়েই খেয়ে নিতে পারে। সাহাবীদের থেকে উভয় প্রকারের কাজের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোন শহর শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে সেই শহরের অধিবাসীরা নিজেদের শহরে অবস্থান করা সত্ত্বেও জিহাদের কারণে রোযা ভাঙতে পারে কিনা এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কোন কোন আলেম এর অনুমতি দেননি। কিন্তু আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণের ভিত্তিতে এ অবস্থায় রোযা ভাঙাকে পুরোপুরি জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন।

১৮৭. অর্থাৎ আল্লাহ রোযা রাখার জন্য কেবল রমযান মাসের দিনগুলোকে নির্দিষ্ট করে দেননি। বরং কোন শরীয়াত সমর্থিত ওজরের কারণে যারা রমযানে রোযা রাখতে অপারগ হয় তারা অন্য দিনগুলোয় এই রোযা রাখতে পারে, এর পথও উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। মানুষকে কুরআনের যে নিয়ামত দান করা হয়েছে তার শুকরিয়া আদায় করার মূল্যবান সুযোগ থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা।

এ প্রসংগে একথাটি অবশ্যি অনুধাবন করতে হবে যে, রমযানের রোযাকে কেবলমাত্র তাকওয়ার অনুশীলনই গণ্য করা হয়নি বরং কুরআনের আকারে আল্লাহ যে বিরাট ও মহান নিয়ামত মানুষকে দান করেছেন রোযাকে তার শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যম হিসেবেও

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

আর হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই, কাজেই তাদের আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার ওপর ঈমান আনা উচিত,[১৮৮] একথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, হয়তো সত্য–সরল পথের সন্ধান পাবে।[১৮৯]

গণ্য করা হয়েছে। আসলে একজন বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সুবিবেচক ব্যক্তির জন্য কোন নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের এবং কোন অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি একটিই হতে পারে। আর তা হচ্ছে, যে উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সেই নিয়ামতটি দান করা হয়েছিল তাকে পূর্ণ করার জন্য নিজেকে সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুত করা। কুরআন আমাদের এই উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছে যে, আমরা এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ জেনে নিয়ে নিজেরা সে পথে চলবো এবং অন্যদেরকেও সে পথে চালাবো। এই উদ্দেশ্যে আমাদের তৈরি করার সর্বোত্মক মাধ্যম হচ্ছে রোযা। কাজেই কুরআন নাযিলের মাসে আমাদের রোযা রাখা কেবল ইবাদাত ও নৈতিক অনুশীলনই নয় বরং এই সংগে কুরআন রূপ নিয়ামতের যথার্থ শুকরিয়া আদায়ও এর মাধ্যমে সম্ভব হয়।

১৮৮. অর্থাৎ যদিও তোমরা আমাকে দেখতে পাও না এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভবও করতে পারো না তবুও আমাকে তোমাদের থেকে দূরে মনে করো না। আমি আমার প্রত্যেক বান্দার অতি নিকটেই অবস্থান করছি। যখনই তারা চায় আমার কাছে আর্জি পেশ করতে পারে। এমনকি মনে মনে আমার কাছে তারা যা কিছু আবেদন করে তাও আমি শুনতে পাই। আর কেবল শুনতেই পাই না বরং সে সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করি। নিজেদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে যে সমস্ত অলীক, কাল্পনিক ও অক্ষম সত্তাদেরকে তোমরা উপাস্য ও প্রভু গণ্য করেছো তাদের কাছে তোমাদের নিজেদের দৌড়িয়ে যেতে হয় এবং তারপরও তারা তোমাদের কোন আবেদন নিবেদন শুনতে পায় না। তোমাদের আবেদনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতাও তাদের নেই। অন্যদিকে আমি হচ্ছি এই বিশাল বিস্তৃত বিশ্ব–জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি। সমস্ত সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমারই হাতে কেন্দ্রীভূত। তোমাদের এতো কাছে আমি অবস্থান করি যে, কোন প্রকার মাধ্যম ও সুপারিশ ছাড়াই তোমরা নিজেরাই সরাসরি সর্বত্র ও সবসময় আমার কাছে নিজেদের আবেদন নিবেদন পেশ করতে পারো। কাজেই একের পর এক অক্ষম ও বানোয়াট খোদার দ্বারে দ্বারে মাথা ঠুকে মরার অজ্ঞতা ও মূর্খতার বেড়াজাল তোমরা ছিঁড়ে ফেলো। আমি তোমাদের যে আহবান জানাচ্ছি সে আহবানে সাড়া দাও। আমার আদর্শকে আঁকড়ে ধরো। আমার দিকে ফিরে এসো। আমার ওপর নির্ভর করো। আমার বন্দেগী ও আনুগত্য করো।

১৯০. অর্থাৎ পোশাক ও শরীরের মাঝখানে যেমন কোন পরদা বা আবরণ থাকতে পারে না এবং উভয়ের সম্পর্ক ও সম্মিলন হয় অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য, ঠিক তেমনি তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীদের সম্পর্কও।

১৯১. শুরুতে রমযান মাসের রাত্রিকালে স্ত্রীর সাথে রাত্রিবাস করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকলেও লোকেরা এমনটি করা অবৈধ মনে করতো। তারপর এই অবৈধ বা অপছন্দনীয় হবার ধারণা মনে মনে পোষণ করে অনেক সময় তারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে চলে যেতো। এটা যেন নিজের বিবেকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হতো। এর ফলে তাদের মধ্যে একটি অপরাধ ও পাপ মনোবৃত্তির লালনের আশংকা দেখা দিয়েছিল। তাই মহান আল্লাহ প্রথমে তাদেরকে বিবেকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন অতপর বলেছেন, এটি তোমাদের জন্য বৈধ। কাজেই এখন তোমরা খারাপ কাজ মনে করে একে করো না বরং আল্লাহ প্রদত্ত অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করে মন ও বিবেকের পূর্ণ পবিত্রতা সহকারে করো।

১৯২. এ ব্যাপারেও শুরুতে লোকদের ভুল ধারণা ছিল। কারোর ধারণা ছিল, এশার নামায পড়ার পর থেকে পানাহার হারাম হয়ে যায়। আবার কেউ মনে করতো, রাতে যতক্ষণ জেগে থাকা হয় ততক্ষণ পানাহার করা যেতে পারে, ঘুমিয়ে পড়ার পর আবার উঠে কিছু খাওয়া যেতে পারে না। লোকেরা মনে মনে এই বিধান কল্পনা করে রেখেছিল এর ফলে অনেক সময় তাদের বড়ই ভোগান্তি হতো। এই আয়াতে ঐ ভুল ধারণাগুলো দূর করা হয়েছে। এখানে রোযার সীমানা বর্ণনা করা হয়েছে প্রভাতের শ্বেত আভার উদয় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অন্যদিকে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর থেকে নিয়ে প্রভাতের সাদা রেখা জেগে না ওঠা পর্যন্ত সারা রাত পানাহার ও স্ত্রীসম্ভোগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেহরী খাওয়ার নিয়মের প্রচলন করেছেন, যাতে প্রভাতের উদয়ের ঠিক পূর্বেই লোকেরা ভালোভাবে পানাহার করে নিতে পারে।

১৯৩. ইসলাম তার ইবাদাত–বন্দেগীর জন্য সময়ের এমন একটি মান নির্ণয় করে দিয়েছে যার ফলে দুনিয়ায় সর্বকালে সকল তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে লালীত লোকেরা সব দেশে ও সব জায়গায় ইবাদাতের সময় নির্ধারণ করে নিতে সক্ষম হয়। ঘড়ির সাহায্যে সময় নির্ধারণ করার পরিবর্তে আকাশে ও দিগন্তে উদ্ভাসিত সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের প্রেক্ষিতে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু অজ্ঞ ও আনাড়ী লোকেরা এই সময় নির্ধারণ পদ্ধতির বিরুদ্ধে সাধারণত এই মর্মে আপত্তি উথাপন করেছে যে, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর সন্নিকটে, যেখানে রাত ও দিন হয় কয়েক মাসের, সেখানে এই সময় নির্ধারণ পদ্ধতি কিভাবে কাজে লাগবে? অথচ অগভীর ভূগোল জ্ঞানের কারণে তাদের মনে এ প্রশ্নের উদয় হয়েছে। আসলে আমরা বিষুব রেখার আশেপাশের এলাকার লোকেরা যে অর্থে দিন ও রাত শব্দ দু'টি বলে থাকি উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু এলাকায় ঠিক সেই অর্থে ছ'মাস রাত ও ছ'মাস দিন হয় না। রাত্রির পালা বা দিনের পালা যাই হোক না কেন, মোট কথা সকাল ও সন্ধ্যার আলামত সেখানে যথারীতি দিগন্তে ফুটে ওঠে এবং তারই প্রেক্ষিতে সেখানকার লোকেরা আমাদেরই মতো নিজেদের ঘুমোবার, জাগবার, কাজকর্ম করার ও বেড়াবার আয়োজন করে থাকে। যে যুগে ঘড়ির ব্যাপক প্রচলন ছিল না সে যুগেও ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে, গ্রীণল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের লোকেরা নিজেদের সময় অবশ্যি জেনে নিতো।

সে আমলে তাদের সময় জানার উপায় ছিল এই দিগন্তের আলামত। কাজেই দুনিয়ার আর সব ব্যাপারে এই আলামতগুলো যেমন তাদের সময় নির্ধারণে সাহায্য করতো তেমনিভাবে নামায, রোযা, সেহরী ও ইফতারের ব্যাপারেও তাদের সময় নির্ধারণ করতে সক্ষম।

১৯৪. রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করার অর্থ হচ্ছে, যেখানে রাতের সীমানা শুরু হচ্ছে সেখানে তোমাদের রোযার সীমানা শেষ হয়ে যাচ্ছে। সবাই জানেন, রাতের সীমানা শুরু হয় সূর্যাস্ত থেকে। কাজেই সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করা উচিত। সেহরী ও ইফতারের সঠিক আলামত হচ্ছে, রাতের শেষ ভাগে যখন পূর্ব দিগন্তে প্রভাতের শুভ্রতার সরু রেখা ভেসে উঠে ওপরের দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তখন সেহরীর সময় শেষ হয়ে যায়। আবার যখন দিনের শেষ ভাগে পূর্ব দিগন্ত থেকে রাতের আঁধার ওপরের দিকে উঠতে থাকে তখন ইফতারের সময় হয়। আজকাল লোকেরা সেহরী ও ইফতারে উভয় ব্যাপারে অত্যধিক সতর্কতার কারণে কিছু অযথা কড়াকড়ি শুরু করেছে। কিন্তু শরীয়াত ঐ দু'টি সময়ের এমন কোন সীমানা নির্ধারণ করে দেয়নি যে তা থেকে কয়েক সেকেণ্ড বা কয়েক মিনিট এদিক ওদিক হয়ে গেলে রোযা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রভাত কালে রাত্রির কালো বুক চিরে প্রভাতের সাদা রেখা ফুটে ওঠার মধ্যে যথেষ্ট সময়ের অবকাশ রয়েছে। ঠিক প্রভাতের উদয় মুহূর্তে যদি কোন ব্যক্তির ঘুম ভেঙে যায় তাহলে সংগতভাবেই সে তাড়াতাড়ি উঠে কিছু পানাহার করে নিতে পারে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ সেহরী খাচ্ছে এমন সময় আযানের আওয়াজ কানে এসে গিয়ে থাকে তাহলে সংগে সংগেই সে যেন আহার ছেড়ে না দেয় বরং পেট ভরে পানাহর করে নেয়। অনুরূপভাবে ইফতারের সময়ও সূর্য অস্ত যাওয়ার পর অযথা দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়ার প্রতীক্ষায় বসে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য ডোবার সাথে সাথেই বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বলতেন, আমার শরবত আনো। বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, হে আল্লাহর রসূল! এখনো তো দিনের আলো ফুটে আছে। তিনি জবাব দিতেন, যখন রাতের আঁধার পূর্বাকাশ থেকে উঠতে শুরু করে তখনই রোযার সময় শেষ হয়ে যায়।

১৯৫. ইতিকাফে বসার মানে হচ্ছে, রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান করা এবং এই দিনগুলোকে আল্লাহর যিকিরের জন্য নির্দিষ্ট করা। এই ইতিকাফে থাকা অবস্থায় নিজের মানবিক ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া যায় কিন্তু যৌন স্বাদ আস্বাদন করা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা একান্ত অপরিহার্য।

১৯৬. এই সীমারেখাগুলো অতিক্রম করার কথা বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে, এগুলোর ধারে কাছেও যেয়ো না। এর অর্থ হচ্ছে, যেখান থেকে গোনাহের সীমানা শুরু হচ্ছে ঠিক সেই শেষ প্রান্তে সীমানা লাইন বরাবর ঘোরাফেরা করা বিপজ্জনক। সীমান্ত থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ ব্যবস্থা। কারণ সীমান্ত বরাবর ঘোরাফেরা করলে ভুলেও কখনো সীমান্তের ওপারে পা চলে যেতে পারে। তাই এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمٰى يُوشِكُ اَنْ يَّقَعَ فِيهِ

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অবৈধ পদ্ধতিতে খেয়ো না এবং শাসকদের সামনেও এগুলোকে এমন কোন উদ্দেশ্যে পেশ করো না যার ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে তোমরা অন্যের সম্পদের কিছু অংশ খাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাও।[১৯৭]

"প্রত্যেক বাদশাহর একটি 'হিমা' থাকে। আর আল্লাহর হিমা হচ্ছে তাঁর নির্ধারিত হারাম বিষয়গুলো। কাজেই যে ব্যক্তি হিমার চারদিকে ঘুরে বেড়ায় তার হিমার মধ্যে পড়ে যাবার আশংকাও রয়েছে।"

আরবী ভাষায় 'হিমা' বলা হয় এমন একটি চারণক্ষেত্রকে যাকে কোন নেতা বা বাদশাহ সাধারণ মানুষের মধ্যে নিষিদ্ধ করে দেন। এই উপমাটি ব্যবহার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, প্রত্যেক বাদশাহর একটি হিমা আছে আর আল্লাহর হিমা হচ্ছে তাঁর সেই সীমানাগুলো যার মাধ্যমে তিনি হালাল ও হারাম এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। যে পশু 'হিমার' (বেড়া) চারপাশে চরতে থাকে একদিন সে হয়তো হিমার মধ্যেও ঢুকে পড়তে পারে। দুঃখের বিষয় শরীয়াতের মৌল প্রাণসত্তা সম্পর্কে অনবহিত লোকেরা সবসময় অনুমতির শেষ সীমায় চলে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে থাকে। আবার অনেক আলেম ও মাশায়েখ এই বিপজ্জনক সীমানায় তাদের ঘোরাফেরা করতে দেয়ার উদ্দেশ্যে দলীল প্রমাণ সংগ্রহ করে অনুমতির শেষ সীমা তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার কাজ করে যেতে থাকেন। অথচ অনুমতির এই শেষ সীমায় আনুগত্য ও অবাধ্যতার মধ্যে মাত্র চুল পরিমাণ ব্যবধান থেকে যায়। এরই ফলে আজ অসংখ্য লোক গোনাহ এবং তার থেকে অগ্রসর হয়ে গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে চলেছে। কারণ ঐ সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সীমান্ত রেখার মধ্যে পার্থক্য করা এবং তাদের কিনারে পৌঁছে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ কথা নয়।

১৯৭. এই আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, শাসকদেরকে উৎকোচ দিয়ে অবৈধভাবে লাভবান হবার চেষ্টা করো না। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেরাই যখন জানো এগুলো অন্যের সম্পদ তখন শুধুমাত্র তার কাছে তার সম্পদের মালিকানার কোন প্রমাণ না থাকার কারণে অথবা একটু এদিক সেদিক করে কোন প্রকারে প্যাঁচে ফেলে তার সম্পদ তোমরা গ্রাস করতে পারো বলে তার মামলা আদালতে নিয়ে যেয়ো না। মামলার ধারা বিবরণী শোনার পর হয়তো তারই ভিত্তিতে আদালত তোমাকে ঐ সম্পদ দান করতে পারে। কিন্তু বিচারকের এ ধরনের ফায়সালা হবে আসলে সাজানো মামলার নকল দলিলপত্র দ্বারা প্রতারিত হবার ফলশ্রুতি। তাই আদালত থেকে ঐ সম্পদ বা সম্পত্তির

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۖ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٨٩﴾

২৪ রুকূ

লোকেরা তোমাকে চাঁদ ছোট বড়ো হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে। বলে দাও ঃ এটা হচ্ছে লোকদের জন্য তারিখ নির্ণয় ও হজ্জের আলামত।[১৯৮] তাদেরকে আরো বলে দাও ঃ তোমাদের পেছন দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ করার মধ্যে কোন নেকী নেই। আসলে নেকী রয়েছে আল্লাহর অসন্তুটি থেকে বাঁচার মধ্যেই, কাজেই তোমরা দরজা পথেই নিজেদের গৃহে প্রবেশ করো। তবে আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, হয়তো তোমরা সাফল্য লাভে সক্ষম হবে।[১৯৯]

বৈধ মালিকানা অধিকার লাভ করার পরও প্রকৃতপক্ষে তুমি তার বৈধ মালিক হতে পারবে না। আল্লাহর কাছে তা তোমার জন্য হারামই থাকবে। হাদীসে বিবৃত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

انما انا بشر وانتم تختصمون الى ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاقضى له على نحو ما اسمع منه - فمن قضيت له بشىء من حق اخيه ، فانما اقضى له قطعة من النار

"আমি তো একজন মানুষ। হতে পারে, তোমরা একটি মামলা আমার কাছে আনলে। এ ক্ষেত্রে দেখা গেলো তোমাদের একপক্ষ অন্য পক্ষের তুলনায় বেশী বাকপটু এবং তাদের যুক্তি–আলোচনা শুনে আমি তাদের পক্ষে রায় দিতে পারি। কিন্তু জেনে রাখো, তোমার ভাইয়ের অধিকারভুক্ত কোন জিনিস যদি তুমি এভাবে আমার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লাভ করো, তাহলে আসলে তুমি দোজখের একটি টুকরা লাভ করলে।"

১৯৮. চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়ার দৃশ্যটি প্রতি যুগের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অতীতে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে এ সম্পর্কে নানা ধরনের রহস্যময়তা, কাল্পনিকতা ও কুসংস্কারের প্রচলন ছিল এবং আজো রয়েছে। আরবের লোকদের মধ্যেও এ ধরনের কুসংস্কার ও অমূলক ধারণা–কল্পনার প্রচলন ছিল। চাঁদ থেকে ভালো মন্দ 'লক্ষণ' গ্রহণ করা হতো। কোন তারিখকে সৌভাগ্যের ও কোন তারিখকে দুর্ভাগ্যের প্রতীক মনে করা

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে,[২০০] কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না। কারণ যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।[২০১] তাদের সাথে যেখানেই তোমাদের মোকাবিলা হয় তোমরা যুদ্ধ করো এবং তাদের উৎখাত করো সেখান থেকে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে উৎখাত করেছে। কারণ হত্যা যদিও খারাপ, ফিতনা তার চেয়েও বেশী খারাপ।[২০২] আর মসজিদে হারামের কাছে যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, তোমরাও যুদ্ধ করো না। কিন্তু যদি তারা সেখানে যুদ্ধ করতে সংকোচবোধ না করে, তাহলে তোমরাও নিসংকোচে তাদেরকে হত্যা করো। কারণ এটাই এই ধরনের কাফেরদের যোগ্য শাস্তি। তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।[২০৩]

হতো। কোন তারিখকে বিদেশ-বিভুঁইয়ে যাত্রার জন্য, কোন তারিখকে কাজ শুরু করার জন্য এবং কোন তারিখকে বিয়ে-সাদীর জন্য অপয়া বা অকল্যাণকর মনে করা হতো। আবার একথাও মনে করা হতো যে, চাঁদের উদয়াস্ত, হ্রাস-বৃদ্ধি ও আবর্তন এবং চন্দ্রগ্রহণের প্রভাব মানুষের ভাগ্যের ওপর পড়ে। দুনিয়ার অন্যান্য অজ্ঞ ও মূর্খ জাতিদের মতো আরবদের মধ্যেও এ সমস্ত ধারণা-কল্পনার প্রচলন ছিল। এ সম্পর্কিত নানা ধরনের কুসংস্কার, রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানাদি তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসব বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে মহান আল্লাহ বলেন, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়ার তাৎপর্য এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, এটা একটা প্রাকৃতিক ক্যালেণ্ডার, যা আকাশের গায়ে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতি দিন আকাশ কিনারে উঁকি দিয়ে এ ক্যালেণ্ডারটি একই সাথে সারা দুনিয়ার মানুষকে তারিখের হিসেব জানিয়ে দিতে থাকে। এখানে হজ্জের উল্লেখ বিশেষ করে করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবের ধর্মীয় তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এর গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। বছরের

এক-তৃতীয়াংশ সময় অর্থাৎ চারটি মাসই ছিল হজ্জ ও উমরাহর সাথে সম্পর্কিত। এ মাসগুলোয় যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকতো, পথঘাট সংরক্ষিত ও নিরাপদ থাকতো এবং শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ বজায় থাকার কারণে ব্যবসা বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটতো।

১৯৯. আরবে যে সমস্ত কুসংস্কারমূলক প্রথার প্রচলন ছিল তার মধ্যে একটি ছিল হজ্জ সম্পর্কিত। কোন ব্যক্তি হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধার পর নিজের গৃহের দরজা দিয়ে আর ভেতরে প্রবেশ করতো না। বরং গৃহে প্রবেশ করার জন্য পেছন থেকে দেয়াল টপকাতো বা দেয়াল কেটে জানালা বানিয়ে তার মধ্য দিয়ে গৃহে প্রবেশ করতো। তাছাড়া সফর থেকে ফিরে এসেও পেছন থেকে গৃহে প্রবেশ করতো। এই আয়াতে কেবলমাত্র এই প্রথাটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদই জানানো হয়নি বরং এই বলে সকল প্রকার কুসংস্কার ও কুপ্রথার মূলে আঘাত হানা হয়েছে যে, নেকী ও সৎকর্মশীলতা হচ্ছে আসলে আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকার নাম। নিছক বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণের বশবর্তী হয়ে যেসব অর্থহীন নিয়ম প্রথা পালন করা হচ্ছে এবং যেগুলোর সাথে মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কোন সম্পর্কই নেই, সেগুলো আসলে নেকী ও সৎকর্ম নয়।

২০০. আল্লাহর কাজে যারা তোমাদের পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী তোমরা জীবন ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধন করতে চাও বলে যারা তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তোমাদের সংশোধন ও সংস্কার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য জুলুম-অত্যাচার চালাচ্ছে ও শক্তি প্রয়োগ করছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করো। এর আগে মুসলমানরা যতদিন দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ছিল, তাদেরকে কেবলমাত্র ইসলাম প্রচারের হুকুম দেয়া হয়েছিল এবং বিপক্ষের জুলুম-নির্যাতনে সবর করার তাকীদ করা হচ্ছিল। এখন মদীনায় তাদের একটি ছোট্ট স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই প্রথমবার তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যারাই এই সংস্কারমূলক দাওয়াতের পথে সশস্ত্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে অস্ত্র দিয়েই তাদের অস্ত্রের জবাব দাও। এরপরই অনুষ্ঠিত হয় বদরের যুদ্ধ। তারপর একের পর এক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতেই থাকে।

২০১. অর্থাৎ বস্তুগত স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যুদ্ধ করবে না। আল্লাহ প্রদত্ত সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না তাদের ওপর তোমরা হস্তক্ষেপ করবে না। যুদ্ধের ব্যাপারে জাহেলী যুগের পদ্ধতি অবলম্বন করবে না। নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও আহতদের গায়ে হাত ওঠানো, শত্রু পক্ষের নিহতদের লাশের চেহারা বিকৃত করা, শস্যক্ষেত ও গবাদি পশু অযথা ধ্বংস করা এবং অন্যান্য যাবতীয় জুলুম ও বর্বরতামূলক কর্মকাণ্ড "বাড়াবাড়ি"-এর অন্তরভুক্ত। হাদীসে এসবগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, একমাত্র অপরিহার্য ক্ষেত্রেই শক্তির ব্যবহার করতে হবে এবং ঠিক ততটুকু পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে যতটুকু সেখানে প্রয়োজন।

২০২. এখানে ফিতনা শব্দটি ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যে অর্থে ইংরেজীতে Persecution শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা দল প্রচলিত চিন্তাধারা ও মতবাদের পরিবর্তে অন্য কোন চিন্তা ও মতবাদকে সত্য হিসেবে জানার কারণে তাকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং সমালোচনা ও প্রচারের মাধ্যমে সমাজে বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۖ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾ اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾ وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়ে যায় এবং দীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।[২০৪] *তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখো যালেমদের ছাড়া আর কারোর ওপর হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়।*[২০৫]

হারাম মাসের বিনিময় হারাম মাসই হতে পারে এবং সমস্ত মর্যাদা সমপর্যায়ের বিনিময়ের অধিকারী হবে।[২০৬] *কাজেই যে ব্যক্তি তোমার ওপর হস্তক্ষেপ করবে তুমিও তার ওপর ঠিক তেমনিভাবে হস্তক্ষেপ করো। তবে আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং একথা জেনে রাখো যে, আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না।*[২০৭] *অনুগ্রহ প্রদর্শনের পথ অবলম্বন করো, কেননা আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদর্শনকারীদেরকে ভালোবাসেন।*[২০৮]

সংশোধনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে, নিছক এ জন্য তার ওপর জুলুম-নির্যাতন চালানো। আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে ঃ নরহত্যা নিসন্দেহে একটি জঘণ্য কাজ কিন্তু কোন মানবিক গোষ্ঠী বা দল যখন জোরপূর্বক নিজের স্বৈরতান্ত্রিক ও জুলুমতান্ত্রিক চিন্তাধারা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়, সত্য গ্রহণ থেকে লোকদেরকে জোরপূর্বক বিরত রাখে এবং যুক্তির পরিবর্তে পাশবিক শক্তি প্রয়োগে জীবন গঠন ও সংশোধনের বৈধ ও ন্যায়সংগত প্রচেষ্টার মোকাবিলা করতে শুরু করে তখন সে নরহত্যার চাইতেও জঘণ্যতম অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। এই ধরনের গোষ্ঠী বা দলকে অস্ত্রের সাহায্যে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া যে সম্পূর্ণ বৈধ ও ন্যায়সংগত তাতে সন্দেহ নেই।

২০৩. অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছো তিনি নিকৃষ্টতম অপরাধী ও পাপীকেও মাফ করে দেন, যদি সে তার বিদ্রোহাত্মক আচরণ পরিহার করে, এটিই তাঁর

গুণ-বৈশিষ্ট। এই গুণ-বৈশিষ্ট তোমরা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করো। تخلقوا باخلاق الله আল্লাহর চারিত্রিক গুণ–বৈশিষ্টে নিজেদেরকে সজ্জিত করো, রসূলের এ বাণীর তাৎপর্যও এটিই। প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য তোমরা যুদ্ধ করবে না। তোমরা যুদ্ধ করবে আল্লাহর দীনের পথ পরিষ্কার ও সুগম করার জন্য। কোন দল যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ততক্ষণ তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কিন্তু যখনই সে নিজের প্রতিবন্ধকতার নীতি পরিহার করবে তখনই তোমরা তার ওপর থেকে হাত গুটিয়ে নেবে।

২০৪. ইতিপূর্বে 'ফিতনা' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে তার থেকে একটু স্বতন্ত্র অর্থে তার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পূর্বাপর আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে 'ফিতনা' বলতে এমন অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যখন 'দীন' আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্যই হয় ফিতনাকে নির্মূল করে দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া। আবার 'দীন' শব্দটির তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, আরবী ভাষায় দীন অর্থ হচ্ছে "আনুগত্য" এবং এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে জীবন ব্যবস্থা। এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যেখানে কোন সত্তাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মেনে নিয়ে তার প্রদত্ত বিধান ও আইনের আনুগত্য করা হয়। দীনের এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সমাজে যখন মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন সমাজের এই অবস্থাকে ফিতনা বলা হয়। এই ফিতনার জায়গায় এমন একটি ব্যবস্থার সৃষ্টি করা ইসলামী জিহাদের লক্ষ যেখানে মানুষ একমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুগত থাকবে।

২০৫. বিরত হওয়ার অর্থ কাফেরদের নিজেদের কুফরী ও শিরক থেকে বিরত হওয়া নয়। বরং ফিতনা সৃষ্টি করা থেকে বিরত হওয়া। কাফের, মুশরিক, নাস্তিক প্রত্যেকের নিজের ইচ্ছামতো আকীদা–বিশ্বাস পোষণ করার অধিকার আছে। তারা যার ইচ্ছে তার ইবাদাত-উপাসনা করতে পারে। অথবা চাইলে কারোরও ইবাদাত নাও করতে পারে। তাদেরকে এই গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা থেকে বের করে আনার জন্য উপদেশ দিতে হবে, অনুরোধ করতে হবে। কিন্তু এ জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না। তবে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন ছাড়া তাদের বাতিল আইন কানুন জারী করার এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর বান্দায় পরিণত করার অধিকার তাদের নেই। এই ফিতনা নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন ও সুযোগ মতো মৌখিক প্রচারণা ও অস্ত্র উভয়টিই ব্যবহার করা হবে। আর কাফের ও মুশরিকরা এই ফিতনা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত মু'মিন তার সংগ্রাম থেকে নিশ্চেষ্ট ও নিবৃত্ত হবে না।

আর "যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখো জালেমদের ছাড়া আর কারোর ওপর হস্তক্ষেপ বৈধ হবে না"—একথা থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, বাতিল জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে সত্য জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর সাধারণ লোকদের মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু নিজেদের শাসনামলে যারা সত্যের পথ রোধ করার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছিল সত্যপন্থীরা তাদেরকে অবশ্যি শাস্তিদান করতে পারবে। যদিও এ ব্যাপারে ক্ষমা করে দেয়া এবং বিজয় লাভ করার পর জালেমদের থেকে প্রতিশোধ না নেয়াই সৎকর্মশীল মু'মিনদের জন্য শোভনীয় তবুও যাদের অপরাধের

তালিকা অনেক বেশী কালিমালিপ্ত তাদেরকে শাস্তি দান করা একান্তই বৈধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এই সুযোগ গ্রহণ করেছেন। অথচ তাঁর চেয়ে বেশী ক্ষমা ও উদারতা আর কে প্রদর্শন করতে পারে? তাই দেখা যায়, বদরের যুদ্ধের বন্দীদের মধ্য থেকে উকবাহ ইবনে আবী মুঈত ও নযর ইবনে হারিসকে তিনি হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের পর সতের জন লোককে সাধারণ ক্ষমার বাইরে রেখেছেন এবং তাদের মধ্য থেকে চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। উপরোল্লিখিত অনুমতির ভিত্তিতে তিনি এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছেন।

২০৬. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকে আরবদের মধ্যে যিলকাদ', যিলহজ্জ ও মুহাররম এই তিনটি মাস হজ্জের জন্য নির্ধারিত থাকার নিয়ম প্রচলিত ছিল। আর রজব মাসকে উমরাহর জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল। এই চার মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ, হত্যা, লুণ্ঠন ও রাহাজানি নিষিদ্ধ ছিল। কা'বা যিয়ারতকারীদেরকে নিশ্চিন্তভাবে ও নিরাপদে আল্লাহর ঘরে যাওয়ার এবং সেখান থেকে আবার নিজেদের গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ জন্য এ মাসগুলোকে হারাম মাস বলা হতো। অর্থাৎ এ মাসগুলো হলো সম্মানিত। এখানে উল্লেখিত আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, হারাম মাসগুলোর মর্যাদা রক্ষায় যদি কাফেররা তৎপর হয় তাহলে মুসলমানদেরও তৎপর হতে হবে। আর যদি কাফেররা এই মাসগুলোর মর্যাদা পরোয়া না করে কোন হারাম মাসে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসে তাহলে মুসলমানরাও হারাম মাসে ন্যায়-সংগতভাবে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে।

আরবদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও লুটতরাজের ক্ষেত্রে 'নাসী' প্রথা প্রচলিত থাকার কারণে এই অনুমতির প্রয়োজন বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। এই প্রথা অনুযায়ী তারা কারোর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে অথবা লুটতরাজ করার জন্য কারোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে কোন একটি হারাম মাসে তার ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালাতো তারপর অন্য একটি হালাল মাসকে তার জায়গায় হারাম গণ্য করে পূর্বের হারাম মাসের মর্যাদাহানির বদলা দিতো। তাই মুসলমানদের সামনে এ প্রশ্ন দেখা দিল যে, কাফেররা যদি 'নাসী'র বাহানা বানিয়ে কোন হারাম মাসে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসে তখন তারা কি করবে? এই প্রশ্নের জবাব এই আয়াতে দেয়া হয়েছে।

২০৭. আল্লাহর পথে ব্যয় করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো হয় তাতে অর্থ ব্যয় করা। এখানে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহর দীনের শির উঁচু রাখার এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের অর্থ সম্পদ ব্যয় না করো এবং তার মোকাবিলায় নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে সবসময় প্রিয় বলে মনে করতে থাকো তাহলে এটা তোমাদের জন্য দুনিয়ায় ধ্বংসের কারণ হবে এবং আখেরাতেও। দুনিয়ায় তোমরা কাফেরদের হাতে পরাজিত ও পর্যুদস্ত এবং আখেরাতে আল্লাহর সামনে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হবে।

২০৮. এখানে মূলে 'ইহসান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'ইহসান' শব্দটি এসেছে 'হুসন' থেকে। এর মানে হচ্ছে, কাজ ভালোভাবে ও সূচারুরূপে সম্পন্ন করা। কাজ করার বিভিন্ন ধরন আছে। তার একটা ধরন হচ্ছে, যে কাজটা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে সেটি কেবল নিয়ম-মাফিক সম্পন্ন করা। দ্বিতীয় ধরন হচ্ছে, তাকে সূচারুরূপে সম্পন্ন

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِیْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًی مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْیَةٌ مِّنْ صِیَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ ٝ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ۚ فَمَنْ لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلٰثَةِ اَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ یَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ﴿۱۹۶﴾

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যখন হজ্জ ও উমরাহ করার নিয়ত করো তখন তা পূর্ণ করো। আর যদি কোথাও আটকা পড়ো তাহলে যে কুরবানী তোমাদের আয়ত্বাধীন হয় তাই আল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করো।[২০৯] *আর কুরবানী তার নিজের জায়গায় পৌঁছে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা নিজেদের মাথা মুণ্ডন করো না।*[২১০] *তবে যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয় অথবা যার মাথায় কোন কষ্ট থাকে এবং সেজন্য মাথা মুণ্ডন করে তাহলে তার 'ফিদিয়া' হিসেবে রোযা রাখা বা সাদকা দেয়া অথবা কুরবানী করা উচিত।*[২১১] *তারপর যদি তোমাদের নিরাপত্তা অর্জিত হয়*[২১২] *(এবং তোমরা হজ্জের আগে মক্কায় পৌঁছে যাও) তাহলে তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরাহর সুযোগ লাভ করে সে যেন সামর্থ অনুযায়ী কুরবানী করে। আর যদি কুরবানীর যোগাড় না হয়, তাহলে হজ্জের যামানায় তিনটি রোযা এবং সাতটি রোযা ঘরে ফিরে গিয়ে, এভাবে পুরো দশটি রোযা যেন রাখে। এই সুবিধে তাদের জন্য যাদের বাড়ী-ঘর মসজিদে হারামের কাছাকাছি নয়।*[২১৩] *আল্লাহর এ সমস্ত বিধানের বিরোধিতা করা থেকে দূরে থাকো এবং ভালোভাবে জেনে নাও আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রদানকারী।*

করা এবং নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও উপায় উপকরণ তার পেছনে নিয়োজিত করে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তাকে সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করা। প্রথম ধরনটি নিছক আনুগত্যের

পর্যায়ভুক্ত। এ জন্য তাকওয়া ও ভীতি যথেষ্ট। আর দ্বিতীয় ধরনটি হচ্ছে ইহসান। এ জন্য ভালোবাসা, প্রেম ও গভীর মনোসংযোগ প্রয়োজন হয়।

২০৯. অর্থাৎ পথে যদি এমন কোন কারণ দেখা দেয় যার ফলে সামনে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং বাধ্য হয়ে পথেই থেমে যেতে হয় তাহলে উট, গরু, ছাগলের মধ্য থেকে যে পশুটি পাওয়া সম্ভব হয় সেটি আল্লাহর জন্য কুরবানী করো।

২১০. কুরবানী তার নিজের জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার অর্থ কি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। হানাফী ফকীহদের মতে এর অর্থ হচ্ছে হারাম শরীফ। অর্থাৎ হজ্জযাত্রী যদি পথে থেমে যেতে বাধ্য হয় তাহলে নিজের কুরবানীর পশু বা তার মূল্য পাঠিয়ে দেবে এবং তার পক্ষ থেকে হারাম শরীফের সীমানার মধ্যে কুরবানী করতে হবে। ইমাম মালিক (র) ও ইমাম শাফেঈর (র) মতে হজ্জযাত্রী যেখানে আটক হয়ে যায় সেখানে কুরবানী করে দেয়াই হচ্ছে এর অর্থ। মাথা মুণ্ডন করার অর্থ হচ্ছে, মাথার চুল চেঁছে ফেলা। অর্থাৎ কুরবানী না হওয়া পর্যন্ত মাথার চুল চেঁছে ফেলতে পারবে না।

২১১. হাদীস থেকে জানা যায়, এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন দিন রোযা রাখা বা ছয়জন মিসকিনকে আহার করানো অথবা কমপক্ষে একটি ছাগল যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২১২. অর্থাৎ যে কারণে পথে তোমাদের বাধ্য হয়ে থেমে যেতে হয়েছিল সে কারণ যদি দূর হয়ে যায়। যেহেতু সে যুগে ইসলাম বৈরী গোত্রদের বাধা দেয়ার ফলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে হজ্জের পথ বন্ধ হয়ে যেতো এবং হাজীদের পথে থেমে যেতে হতো, তাই আল্লাহ ওপরের আয়াতে "আটকা পড়ো" এবং তার মোকাবিলায় "নিরাপত্তা অর্জিত হয়" শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু "আটকা পড়া"র মধ্যে যেমন শত্রুর বাধা দেয়া ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সাথে সাথে অন্যান্য যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অর্থও অন্তরভুক্ত হয় তেমনি "নিরাপত্তা অর্জিত হয়" শব্দের মধ্যেও যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যাবার অর্থ অন্তরভুক্ত হয়।

২১৩. জাহেলী যুদ্ধে আরবের লোকেরা ধারণা করতো, একই সফরে হজ্জ ও উমরাহ দু'টো সম্পন্ন করা মহাপাপ। তাদের মনগড়া শরীয়াতী বিধান অনুযায়ী হজ্জের জন্য একটি সফর এবং উমরাহর জন্য আর একটি সফর করা অপরিহার্য ছিল। মহান আল্লাহ তাদের আরোপিত এই বাধ্য-বাধকতা খতম করে দেন এবং বাইর থেকে আগমনকারীদেরকে একই সফরে হজ্জ ও উমরাহ করার সুবিধে দান করেন। তবে যারা মক্কার আশেপাশের মীকাতের (যে স্থান থেকে হজ্জযাত্রীকে ইহরাম বাঁধতে হয়) সীমার মধ্যে অবস্থান করে তাদেরকে এই সুযোগ দেয়া হয়নি। কারণ তাদের পক্ষে হজ্জ ও উমরাহর জন্য পৃথক পৃথক সফর করা মোটেই কঠিন কাজ নয়।

হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরাহর সুযোগ লাভ করার অর্থ হচ্ছে, উমরাহ সম্পন্ন করে ইহরাম খুলে ফেলতে হবে এবং ইহরাম থাকা অবস্থায় যেসব বিধিনিষেধ মেনে চলতে হচ্ছিল সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর হজ্জের সময় এলে আবার নতুন করে ইহরাম বেঁধে নেবে।

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

২৫ রুকু'

হজ্জের মাসগুলো সবার জানা। যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাসগুলোতে হজ্জ করার নিয়ত করে, তার জেনে রাখা উচিত, হজ্জের সময়ে সে যেন যৌন সম্ভোগ,[২১৪] দুষ্কর্ম[২১৫] ও ঝগড়া-বিবাদে[২১৬] লিপ্ত না হয়। আর যা কিছু সৎকাজ তোমরা করবে আল্লাহ তা জানেন। হজ্জ সফরের জন্য পাথেয় সংগে নিয়ে যাও আর সবচেয়ে ভালো পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। কাজেই হে বুদ্ধিমানেরা! আমার নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকো।[২১৭]

২১৪. ইহরাম বাঁধা অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবলমাত্র যৌন সম্পর্কই নিষিদ্ধ নয় বরং যৌন সম্ভোগের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে এমন কোন কথাবার্তাও তাদের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

২১৫. যদিও সাধারণ অবস্থায়ই যে কোন গোনাহের কাজ করা অবৈধ কিন্তু ইহরাম বাঁধা অবস্থায় এ কাজগুলো সংঘটিত হলে তার গোনাহের মাত্রা অনেক বেশী কঠিন হয়ে পড়ে।

২১৬. এমনকি চাকরকে ধমক দেয়াও জায়েয নয়।

২১৭. জাহেলী যুগে হজ্জের জন্য পাথেয় সংগে করে নিয়ে ঘর থেকে বের হওয়াকে দুনিয়াদারীর কাজ মনে করা হতো। একজন ধর্মীয় ব্যক্তি সম্পর্কে আশা করা হতো সে দুনিয়ার কোন সম্বল না নিয়ে আল্লাহর ঘরের দিকে রওয়ানা হবে। এ আয়াতে তাদের এ ভুল চিন্তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, পাথেয় না নিয়ে সফর করার মধ্যে মাহাত্ম নেই। আসল মাহাত্ম হচ্ছে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হওয়া, তাঁর বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকা এবং জীবনকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও কলুষ মুক্ত করা। যে ব্যক্তি সৎচারিত্রিক গুণাবলী নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে সে অনুযায়ী নিজের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেনি এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত না হয়ে অসৎকাজ করতে থাকে, সে যদি পাথেয় সংগে না নিয়ে নিছক বাহ্যিক ফকীরী ও দরবেশী প্রদর্শনী করে বেড়ায়, তাহলে তাতে তার কোন লাভ নেই। আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের দৃষ্টিতে সে লাঞ্ছিত হবে। যে ধর্মীয় কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সে সফর করছে তাকেও লাঞ্ছিত করবে। কিন্তু

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ
أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

আর হজ্জের সাথে সাথে তোমরা যদি তোমাদের রবের অনুগ্রহের সন্ধান করতে থাকো তাহলে তাতে কোন দোষ নেই।[২১৮] তারপর আরাফাত থেকে অগ্রসর হয়ে 'মাশআরুল হারাম' (মুয্দালিফা) এর কাছে থেমে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং এমনভাবে স্মরণ করো যেভাবে স্মরণ করার জন্য তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। নয়তো ইতিপূর্বে তোমরা তো ছিলে পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত।[২১৯] তারপর যেখান থেকে আর সবাই ফিরে আসে তোমরাও সেখান থেকে ফিরে এসো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।[২২০] নিসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

তার মনে যদি আল্লাহর প্রতি ভয় জাগরুক থাকে এবং তার চরিত্র নিষ্কলুষ হয় তাহলে আল্লাহর ওখানে সে মর্যাদার অধিকারী হবে এবং মানুষও তাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখবে। তার খাবারের থলিতে খাবার ভরা থাকলেও তার এ মর্যাদার কোন কম-বেশী হবে না।

২১৮. এটিও প্রাচীন আরবের একটি জাহেলী ধারণা ছিল। হজ্জ সফর কালে অর্থ উপার্জনের জন্য কোন কাজ করা তারা খারাপ মনে করতো। কারণ তাদের মতে, অর্থ উপার্জন করা একটি দুনিয়াদারীর কাজ। কাজেই হজ্জের মতো একটি ধর্মীয় কাজের মধ্যে এ দুনিয়াদারীর কাজটি করা তাদের চোখে নিন্দনীয়ই ছিল। কুরআন এ ধারণার প্রতিবাদ করছে এবং তাদের জানিয়ে দিচ্ছে, একজন আল্লাহ বিশ্বাসী ব্যক্তি যখন আল্লাহর আইনের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করে নিজের অর্থ উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালায় তখন আসলে সে আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করে। কাজেই এ ক্ষেত্রে সে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সফর করতে গিয়ে তার মাঝখানে তাঁর অনুগ্রহের সন্ধানও করে ফেরে, তাহলে তার কোন গোনাহ হবে না।

২১৯. অর্থাৎ জাহেলী যুগে আল্লাহর ইবাদাতের সাথে অন্য যে সমস্ত মুশরিকী ও জাহেলী ক্রিয়া কর্মের মিশ্রণ ঘটেছিল সেগুলো পরিহার করো এবং এখন আল্লাহ যে সমস্ত হিদায়াত তোমাদের দান করেছেন সে অনুযায়ী নির্ভেজাল আল্লাহর ইবাদাতের পথ অবলম্বন করো।

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

অতপর যখন তোমরা নিজেদের হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন ইতিপূর্বে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে স্মরণ করতে[২২১] বরং তার চেয়ে অনেক বেশী করে স্মরণ করবে। (তবে আল্লাহকে স্মরণকারী লোকদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে) তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে বলে, হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়ায় সবকিছু দিয়ে দাও। এই ধরনের লোকের জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। আবার কেউ বলে, হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও। এই ধরনের লোকেরা নিজেদের উপার্জন অনুযায়ী (উভয় স্থানে) অংশ পাবে। মূলত হিসেব সম্পন্ন করতে আল্লাহর একটুও বিলম্ব হয় না।

২২০. হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সময় আরবে হজ্জের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি ছিল এই যে, ৯ই যিলহজ্জ তারা মিনা থেকে আরাফাত যেতো এবং ১০ তারিখের সকালে সেখান থেকে ফিরে এসে মুযদালিফায় অবস্থান করতো। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন ধীরে ধীরে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের ন্যায় আরবে কুরাইশদের ধর্মীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো তখন তারা বললো, আমরা হারাম শরীফের অধিবাসী, সাধারণ আরবদের সাথে আমরা আরাফাত পর্যন্ত যাবো, এটা আমাদের জন্য মর্যাদাহানিকর। কাজেই তারা নিজেদের জন্য পৃথক মর্যাদাজনক ব্যবস্থার প্রচলন করলো। তারা মুযদালিফা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতো এবং সাধারণ লোকদের আরাফাত পর্যন্ত যাবার জন্য ছেড়ে দিতো। পরে বনী খুযাআ ও বনী কিনানা গোত্রদ্বয় এবং কুরাইশদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য গোত্রও এই পৃথক অভিজাতমূলক ব্যবস্থার অধিকারী হলো। অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে, কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলোর মর্যাদাও সাধারণ আরবদের তুলনায় অনেক উঁচু হয়ে গেলো। তারাও আরাফাতে যাওয়া বন্ধ করে

হজ্জের পবিত্র স্থানসমূহের চিত্র

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۭ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰي مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَھُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ۭ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

এই হাতেগোণা কয়েকটি দিন, এ দিন ক'টি তোমাদের আল্লাহর স্মরণে অতিবাহিত করতে হবে। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে ফিরে আসে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যদি কেউ একটু বেশীক্ষণ অবস্থান করে ফিরে আসে তবে তাতেও কোন ক্ষতি নেই।[২২২] তবে শর্ত হচ্ছে, এই দিনগুলো তাকে তাকওয়ার সাথে অতিবাহিত করতে হবে। আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকো এবং খুব ভালোভাবে জেনে রাখো, একদিন তাঁর দরবারে তোমাদের হাযির হতে হবে।

মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে পার্থিব জীবনে যার কথা তোমার কাছে বড়ই চমৎকার মনে হয় এবং নিজের সদিচ্ছার ব্যাপারে সে বারবার আল্লাহকে সাক্ষী মানে।[২২৩] কিন্তু আসলে সে সত্যের নিকৃষ্টতম শত্রু।[২২৪] যখন সে কর্তৃত্ব লাভ করে,[২২৫] পৃথিবীতে তার সমস্ত প্রচেষ্টা–সাধনা নিয়োজিত করে বিপর্যয় সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত ও মানব বংশ ধ্বংস করার কাজে। অথচ আল্লাহ (যাকে সে সাক্ষী মেনেছিল) বিপর্যয় মোটেই পছন্দ করেন না। আর যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় করো তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপের পথে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়, এই ধরনের লোকের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট এবং সেটি নিকৃষ্টতম আবাস।

দিল। এ গর্ব ও অহংকারের পুত্তলিটিকে এ আয়াতে ভেঙে চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে কুরাইশ, তাদের আত্মীয় ও চুক্তি বদ্ধ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ
رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ۠
وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾ فَاِنْ زَلَلْتُمْ
مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٠٩﴾
هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ
وَالْمَلٰۤئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٢١٠﴾

অন্যদিকে মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের অভিযানে যে নিজের প্রাণ সমর্পণ করে। এই ধরনের বান্দার ওপর আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল ও মেহেরবান। হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো[২২৬] এবং শয়তানের অনুসারী হয়ো না, কেননা সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন। তোমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হিদায়াত এসে গেছে তা লাভ করার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তাহলে ভালোভাবে জেনে রাখো আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।[২২৭] (এই সমস্ত উপদেশ ও হিদায়াতের পরও যদি লোকেরা সোজা পথে না চলে, তাহলে) তারা কি এখন এই অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ মেঘমালার ছায়া দিয়ে ফেরেশতাদের বিপুল জমায়েত সংগে নিয়ে নিজেই সামনে এসে যাবেন এবং তখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে?[২২৮] সমস্ত ব্যাপার তো শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই সামনে উপস্থাপিত হবে।

গোত্রগুলোকে এবং সাধারণভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এমন সব লোকদেরকে যারা আগামীতে কখনো নিজেদের জন্য এ ধরনের পৃথক ব্যবস্থা প্রচলনের আকাংখা মনে মনে পোষণ করে। তাদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, সবাই যতদূর পর্যন্ত যায় তোমরাও তাদের সাথে ততদূর যাও, তাদের সাথে অবস্থান করো, তাদের সাথে ফিরে এসো এবং এ পর্যন্ত জাহেলী অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণে, তোমরা সুন্নাতে ইবরাহিমীর যে বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছো সে জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।

২২১. ইতিপূর্বে আরবের লোকেরা হজ্জ শেষ করার পর পরই মিনায় সভা করতো। সেখানে প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা তাদের বাপ–দাদাদের কৃতিত্ব আলোচনা করতো। গর্ব ও অহংকারের সাথে এবং এভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করতো। তাদের এ কার্যকলাপের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে, এসব জাহেলী কথাবার্তা বন্ধ করো, ইতিপূর্বে

আজেবাজে কথা বলে যে সময় নষ্ট করতে এখন আল্লাহর স্মরণে ও তাঁর যিকিরে তা অতিবাহিত করো। এখানে যিকির বলতে মিনায় অবস্থানরত সময়ে যিকিরের কথা বলা হয়েছে।

২২২. অর্থাৎ 'আইয়ামে তাশরীকে' মিনা থেকে মক্কার দিকে ১২ই বা ১৩ই যিলহজ্জ যেদিনেই ফিরে আসা হোক না কেন তাতে কোন ক্ষতি নেই। কতদিন অবস্থান করা হয়েছিল, এটা কোন মৌলিক গুরুত্বের বিষয় নয়। বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, যতদিন অবস্থান করা হয়েছিল, সেই দিনগুলোয় আল্লাহর সাথে তোমাদের সম্পর্ক কেমন ছিল? সেই দিনগুলোয় তোমরা আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিলে, না মেলা দেখে আর উৎসব অনুষ্ঠানে ফূর্তি করে দিন কাটিয়ে দিয়েছো?

২২৩. অর্থাৎ সে বলে, আল্লাহ সাক্ষী, আমি কেবলমাত্র শুভ কামনা করি। আমার নিজের কোন স্বার্থ নেই। শুধুমাত্র সত্য ও ন্যায়ের জন্য এবং মানুষের ভালো ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আমি কাজ করে যাচ্ছি।

২২৪. এখানে কুরআনে 'আলাদ্দুল খিসাম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এমন শত্রু যে সকল শত্রুর বড়ো। অর্থাৎ সত্যের বিরোধিতার ক্ষেত্রে সে সম্ভাব্য সব রকমের অস্ত্র ব্যবহার করে। মিথ্যা, জালিয়াতি, বেঈমানি, বিশ্বাসঘাতকতা এবং যে কোন ধরনের কপটতার অস্ত্র ব্যবহার করতে সে একটুও ইতস্তত করে না।

২২৫. 'ইযা তাওয়াল্লা' শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ এখানে আয়াতের অনুবাদে অবলম্বন করা হয়েছে। এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, মজার মজার হৃদয় প্রলুব্ধকারী কথা বলে 'যখন সে ফিরে আসে' তখন এসব অপকর্ম করে।

২২৬. অর্থাৎ কোন প্রকার ব্যতিক্রম ও সংরক্ষণ ছাড়াই, কিছু অংশকে বাদ না দিয়ে এবং কিছু অংশকে সংরক্ষিত না রেখে জীবনের সমগ্র পরিসরটাই ইসলামের আওতাধীন করো। তোমাদের চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ, মতবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, আচরণ, ব্যবহারিক জীবন, লেনদেন এবং তোমাদের সমগ্র প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিসরকে পুরোপুরি ইসলামের কর্তৃত্বাধীনে আনো। তোমাদের জীবনের কিছু অংশে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলবে আর কিছু অংশকে ইসলামী অনুশাসনের বাইরে রাখবে, এমনটি যেন না হয়।

২২৭. অর্থাৎ তিনি প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী এবং তিনি জানেন কিভাবে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হয়।

২২৮. এখানে উল্লেখিত শব্দগুলো যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগায়। এর ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ দুনিয়ায় মানুষের পরীক্ষা কেবলমাত্র একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চলছে। সত্যকে না দেখে সে তাকে মানতে প্রস্তুত কি না? আর মেনে নেয়ার পরও তার মধ্যে সত্যকে অমান্য করার ক্ষমতা ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় তার আনুগত্য করার মতো নৈতিক শক্তি তার আছে কি না? কাজেই মহান আল্লাহ নবী প্রেরণ, আসমানী কিতাব অবতরণ এমন কি মুজিযাসমূহের ক্ষেত্রেও বুদ্ধি-বিবেকের পরীক্ষা ও নৈতিক শক্তি যাচাই করার ব্যবস্থা রেখেছেন। কখনো তিনি সত্যকে এমনভাবে আবরণমুক্ত করে দেননি যার ফলে মানুষের পক্ষে তাকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকেনি। কেননা এরপর তো আর পরীক্ষার কোন অর্থই থাকে না এবং পরীক্ষায়

سَلْ بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

২৬ রুকূ'

বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করো, কেমন সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো আমি তাদেরকে দেখিয়েছি। আবার তাদেরকে একথাও জিজ্ঞেস করো, আল্লাহর নিয়ামত লাভ করার পর যে জাতি তাকে দুর্ভাগ্যে পরিণত করে তাকে আল্লাহ কেমন কঠিন শাস্তিদান করেন।[২২৯]

যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবন বড়ই প্রিয় ও মনোমুগ্ধকর করে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের লোকেরা ঈমানের পথ অবলম্বনকারীদেরকে বিদ্রূপ করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকওয়া অবলম্বন–কারীরাই তাদের মোকাবিলায় উন্নত মর্যাদায় আসীন হবে। আর দুনিয়ার জীবিকার ক্ষেত্রে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত দান করে থাকেন।

সাফল্য ও ব্যর্থতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই এখানে বলা হচ্ছে, সেই সময়ের অপেক্ষায় থেকো না যখন আল্লাহ ও তাঁর রাজ্যের কর্মচারী ফেরেশতাগণ সামনে এসে যাবেন। কারণ তখন তো সমস্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। ঈমান আনার ও আনুগত্যের শির অবনত করার মূল্য ও মর্যাদা ততক্ষণই দেয়া হবে যতক্ষণ প্রকৃত সত্য মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে না কিন্তু মানুষ শুধুমাত্র যুক্তি–প্রমাণের মাধ্যমে তাকে গ্রহণ করে নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে এবং নিছক সত্য উপলব্ধির মাধ্যমে তার আনুগত্য করে নিজের নৈতিক শক্তির প্রমাণ দেবে। অন্যথায় যখন প্রকৃত সত্য সকল প্রকার আবরণ মুক্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে, মানুষ চর্মচক্ষে আল্লাহকে দেখবে, তাঁর মহাপ্রতাপ ও পরাক্রমের সিংহাসনে সমাসীন, সীমাহীন এ বিশ্ব সংসারের বিশাল রাজত্ব তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হতে দেখবে, ফেরেশতাদের দেখবে আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় এবং মানুষের এ সত্তাকে আল্লাহর প্রচণ্ড শক্তির বাঁধনে একান্ত অসহায় দেখতে পাবে—এসব কিছু চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর যদি কেউ ঈমান আনে ও সত্যকে মেনে চলতে উদ্যত হয় তাহলে তার এ ঈমান আনার ও সত্যকে মেনে চলার আকাংখার কোন

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۚ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

প্রথমে সব মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। (তারপর এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকেনি, তাদের মধ্যে মতভেদের সূচনা হয়) তখন আল্লাহ নবী পাঠান। তারা ছিলেন সত্য সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা এবং অসত্য ও বেঠিক পথ অবলম্বনের পরিণতির ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শনকারী। আর তাদের সাথে সত্য কিতাব পাঠান, যাতে সত্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল তার মীমাংসা করা যায়।—(এবং প্রথমে তাদেরকে সত্য সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়নি বলে এ মতভেদগুলো সৃষ্টি হয়েছিল, তা নয়) মতভেদ তারাই করেছিল যাদেরকে সত্যের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। তারা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ লাভ করার পরও কেবলমাত্র পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিল বলেই সত্য পরিহার করে বিভিন্ন পথ উদ্ভাবন করে।[২৩০]—কাজেই যারা নবীদের ওপর ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ নিজের ইচ্ছাক্রমে সেই সত্যের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যাপারে লোকেরা মতবিরোধ করেছিল। আল্লাহ যাকে চান সত্য সঠিক পথ দেখিয়ে দেন।

দামই নেই। সে সময় কোন পাক্কা কাফের ও নিকৃষ্টতম অপরাধীও অস্বীকার ও নাফরমানি করার সাহস করবে না। আবরণ উন্মোচন করার মুহূর্ত আসার আগে পর্যন্ত ঈমান আনার ও আনুগত্য করার সুযোগ রয়েছে। আর যখন সে মুহূর্তটি এসে যায় তখন আর পরীক্ষাও নেই, সুযোগও নেই। বরং তখন চূড়ান্ত মীমাংসা ও ফায়সালার সময়।

২২৯. দু'টি কারণে এ প্রশ্নের জন্য বনী ইসরাঈলকে নির্বাচন করা হয়েছে। এক ঃ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের নিষ্প্রাণ স্তূপের তুলনায় একটি জীবিত জাতি অনেক বেশী শিক্ষা ও উপদেশের বাহন হতে পারে। দুই ঃ বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও নবুওয়াতের আলোকবর্তিকা দিয়ে বিশ্ববাসীর নেতৃত্বদানের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু তারা বৈষয়িক প্রীতি, ভোগবাদ, মুনাফিকী এবং জ্ঞান ও কর্মের ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে এ নিয়ামত

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

তোমরা[২৩১] কি মনে করেছো, এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের আগে যারা ঈমান এনেছিল তাদের ওপর যা কিছু নেমে এসেছিল এখনও তোমাদের ওপর সেসব নেমে আসেনি। তাদের ওপর নেমে এসেছিল কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-মুসিবত, তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। এমনকি সমকালীন রসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চীৎকার করে বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদেরকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল, অবশ্যিই আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।

থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছিল। কাজেই তাদের পরে যে জাতিকে বিশ্ব-নেতৃত্বের আসনে বসানো হয়েছে, তারা এ ইসরাঈলী জাতির পরিণাম থেকেই সবচেয়ে বেশী কার্যকর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২৩০. অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ লোকেরা আন্দাজ ও অনুমানের ভিত্তিতে "ধর্মের" ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বলে ঃ মানুষের জীবনের সূচনা হয়েছে শিরকের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। তারপর ক্রমিক বিবর্তন ও ক্রম-উন্নতির মাধ্যমে অন্ধকার অপসৃত হতে ও আলোকমালা বাড়তে থেকেছে। এভাবে অবশেষে একদিন মানুষ তৌহীদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। বিপরীতপক্ষে কুরআন বলছে ঃ পরিপূর্ণ আলোর মধ্যেই দুনিয়ায় মানুষের জীবন কালের সূচনা হয়েছে। মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম যে মানুষটিকে সৃষ্টি করেছিলেন তাকে প্রকৃত সত্যের জ্ঞান দান করেছিলেন এবং তার জন্য সঠিক পথ কোন্‌টি তাও বলে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বনী আদম সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন তারা একটি উম্মাত ও একই দলভুক্ত ছিল। অতপর লোকেরা নতুন নতুন পথ ও বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে থাকে। তাদের প্রকৃত সত্যের জ্ঞান ছিল না বলে তারা এমনটি করেছিল তা নয় বরং প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত থাকার পরও তাদের কেউ কেউ নিজেদের বৈধ অধিকারের চাইতে বেশী মর্যাদা, স্বার্থ ও লাভ অর্জন করতে চাইতো। এ জন্য তারা পরস্পরের ওপর যুলুম, উৎপীড়ন ও বাড়াবাড়ি করার ইচ্ছা পোষণ করতো। এই গলদ ও অনিষ্টকারিতা দূর করার জন্য মহান আল্লাহ নবী পাঠাতে শুরু করেন। নবীদেরকে এ জন্য পাঠানো হয়নি যে, তাঁরা প্রত্যেকে একটি পৃথক ধর্মের ভিত গড়ে তুলবেন এবং প্রত্যেকের পৃথক উম্মাত গড়ে উঠবে। বরং মানুষের সামনে তদের হারানো সত্যপথ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে তাদেরকে পুনরায় একই উম্মাতের অন্তরভুক্ত করাই ছিল তাঁদের পাঠাবার উদ্দেশ্য।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۖ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾

লোকেরা জিজ্ঞেস করছে, আমরা কি ব্যয় করবো? জবাব দাও, যে অর্থই তোমরা ব্যয় কর না কেন তা নিজেদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করো। আর যে সৎকাজই তোমরা করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত হবেন।

তোমাদের যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে এবং তা তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর। হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর অথচ তা তোমাদের জন্য ভালো। আবার হতে পারে কোন জিনিস তোমরা পছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য খারাপ। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

২৩১. ওপরের আয়াত ও এ আয়াতের মাঝখান একটি পূর্ণাংগ কাহিনী অবর্ণিত রয়ে গেছে। আয়াতে এদিকে ইংগিত করা হচ্ছে এবং কুরআনের মক্কী সূরাগুলোয় (যেগুলো সূরা বাকারার পূর্বে নাযিল হয়েছে) এ কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়ার যে কোন দেশে যখনই নবীদের আবির্ভাব ঘটেছে তখনই তাঁরা ও তাঁদের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারী গোষ্ঠী আল্লাহদ্রোহী মানব সমাজের কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁরা কোন অবস্থায়ই নিজেদের প্রাণের পরোয়া করেননি। বাতিল পদ্ধতির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে তাঁরা আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এ দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ইসলামের প্রতি ঈমান আনার পর কেউ দু'দণ্ডের জন্য নিশ্চিন্তে আরামে বসে থাকতে পারেনি। প্রতি যুগে ইসলামের প্রতি ঈমান আনার স্বাভাবিক দাবী হিসেবে ঈমানদার গোষ্ঠীকে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। যে শয়তানী ও বিদ্রোহী শক্তি এ সংগ্রামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তার শক্তির দর্প চূর্ণ করার জন্য ঈমানদারদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছে।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۖ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۖ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾

২৭ রুকূ'

লোকেরা তোমাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে। বলে দাও ঃ ঐ মাসে যুদ্ধ করা অত্যন্ত খারাপ কাজ। কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখা, আল্লাহর সাথে কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথ আল্লাহ–বিশ্বাসীদের জন্য বন্ধ করে দেয়া এবং হারাম শরীফের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট তার চাইতেও বেশী খারাপ কাজ। আর ফিত্‌না হত্যাকাণ্ডের চাইতেও গুরুতর অপরাধ।[২৩২] *তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেই যাবে, এমন কি তাদের ক্ষমতায় কুলোলে তারা তোমাদেরকে এই দীন থেকেও ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। (আর একথা খুব ভালোভাবেই জেনে রাখো), তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এই দীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়ায় ও আখেরাতে উভয় স্থানে তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই ধরনের সমস্ত লোকই জাহান্নামের বাসিন্দা এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।*[২৩৩]

২৩২. এ বিষয়টি একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'নাখ্‌লা' নামক স্থানে আটজনের একটি বাহিনী পাঠান। কুরাইশদের গতিবিধি ও তাদের ভবিষ্যত সংকল্প সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করেন। যুদ্ধ করার কোন অনুমতি তাদেরকে দেননি। কিন্তু পথে তারা কুরাইশদের একটি ছোট বাণিজ্যিক কাফেলার মুখোমুখি হয়।

কাফেলার ওপর আক্রমণ চালিয়ে তারা একজনকে হত্যা করে এবং বাদবাকি সবাইকে গ্রেফতার করে অর্থ ও পণ্য সম্ভারসহ তাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসে। তাদের এ পদক্ষেপটি এমন এক সময় গৃহীত হয় যখন রজব শেষ হয়ে শাবান মাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাদের এ আক্রমণটি রজব মাসে (অর্থাৎ হারাম মাসে) সংঘটিত হয়েছিল কি না এ ব্যাপারটি সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। কিন্তু কুরাইশরাও পর্দান্তরালে তাদের সাথে যোগসাজশকারী ইহুদি ও মদীনার মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাবার জন্য এ ঘটনাটির কথা চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়াতে থাকে। তারা কঠিন আপত্তি জানিয়ে প্রচার করতে থাকে হাঁ, এরা বড়ই আল্লাওয়ালা হয়েছে। অথচ হারাম মাসেও রক্তপাত করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ আয়াতে তাদের এ আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। জবাবের সার নির্যাস হচ্ছে ঃ হারাম মাসে লড়াই করা নিসন্দেহে বড়ই গর্হিত কাজ। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা তাদের জন্য শোভা পায় না, যারা শুধুমাত্র এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার কারণে তেরো বছর ধরে তাদের অসংখ্য ভাইয়ের ওপর যুলুম নির্যাতন চালিয়ে এসেছে। তাদেরকে এমনভাবে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করেছে যে, তারা স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তারপর এখানেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। তাদের ঐ ভাইদের মসজিদে হারামে যাবার পথও বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ মসজিদে হারাম কারোর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। গত দু'হাজার বছর থেকে কোন দিন কাউকে এ ঘরের যিয়ারতে বাধা দেয়া হয়নি। কাজেই এ ধরনের কলংকিত চরিত্রের অধিকারী জালেমরা কোন্ মুখে সামান্য একটি সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে এত বড় হৈচৈ করে বেড়াচ্ছে এবং আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করে চলছে? অথচ এ সংঘর্ষে নবীর অনুমতি ছাড়াই সবকিছু ঘটেছে। এ ঘটনাটিকে বড় জোর এভাবে বলা যেতে পারে, একটি ইসলামী জামায়াতের কয়েকজন লোক একটি দায়িত্বহীন কাজ করে বসেছে।

এ প্রসংগে একথা মনে রাখা দরকার যে, এ তথ্য সংগ্রাহক বাহিনীটি বন্দী ও গনীমাতের মাল নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হবার সাথে সাথেই তিনি বলেন, আমি তো তোমাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেইনি। তাছাড়া তারা যে গনীমাতের মাল এনেছিল তা থেকে তিনি বাইতুল মালের অংশ নিতেও অস্বীকৃতি জানান। তাদের এ লুন্ঠন অবৈধ ছিল, এটি তারই প্রমাণ। সাধারণ মুসলমানরাও এ পদক্ষেপের কারণে এর সাথে সংশ্লিষ্ট নিজেদের লোকদেরকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে। মদীনার একটি লোকও তাদের এ কাজের প্রশংসা করেনি।

২৩৩. সততা ও সৎপ্রবণতার ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের কোন কোন সরলমনা ব্যক্তি মক্কার কাফের ও ইহুদিদের উপরোল্লিখিত অভিযোগে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। এই আয়াতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, তোমাদের এসব কথায় তোমাদের ও তাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে যাবে, একথা মনে করো না। তারা বোঝাপড়ার জন্য অভিযোগ করছে না। তারা তো আসলে কাঁদা ছুঁড়তে চায়। তোমরা কেন এই দীনের প্রতি ঈমান এনেছো এবং কেন দুনিয়াবাসীর সামনে এর দাওয়াত পেশ করে চলেছো—একথা তাদের মনে কাঁটার মতো বিঁধছে। কাজেই যতদিন তারা নিজেদের কুফরীর ওপর অটল রয়েছে এবং তোমরাও এই দীন ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছো

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

বিপরীত পক্ষে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে বাড়ি–ঘর ত্যাগ করেছে ও জিহাদ করেছে[২৩৪] তারা সংগতভাবেই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের প্রতি নিজের করুণাধারা বর্ষণ করবেন।

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে ঃ মদ ও জুয়ার ব্যাপারে নির্দেশ কি? বলে দাওঃ ঐ দু'টির মধ্যে বিরাট ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে যদিও লোকদের জন্য তাতে কিছুটা উপকারিতাও আছে, কিন্তু তাদের উপকারিতার চেয়ে গোনাহ অনেক বেশী।[২৩৫]

তোমাকে জিজ্ঞেস করছে ঃ আমরা আল্লাহর পথে কি ব্যয় করবো? বলে দাও ঃ যা কিছু তোমাদের প্রয়োজনের, অতিরিক্ত হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনা করেন, হয়তো তোমরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের জন্য চিন্তা করবে।

জিজ্ঞেস করছে ঃ এতিমদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে? বলে দাও ঃ যে কর্মপদ্ধতি তাদের জন্য কল্যাণকর তাই অবলম্বন করা ভালো।[২৩৬] তোমারা যদি তোমাদের নিজেদের ও তাদের খরচপাতি ও থাকা–খাওয়া যৌথ ব্যবস্থাপনায় রাখো তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। তারা তো তোমাদের ভাই। অনিষ্টকারী ও হীতকারী উভয়ের অবস্থা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। আল্লাহ চাইলে এ ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করতেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতা ও পরাক্রমের অধিকারী হবার সাথে সাথে জ্ঞান ও হিকমতের অধিকারী।

ততদিন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন প্রকার বোঝাপড়া ও সমঝোতা হতে পারে না। আর এই ধরনের শত্রুদেরকে তোমরা মামুলি শত্রু মনে করো না। যারা তোমাদের অর্থ–সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে চায় তারা অপেক্ষাকৃত ছোট পর্যায়ের শত্রু। কিন্তু যারা তোমাদেরকে আল্লাহর সত্য দীন থেকে ফিরিয়ে নিতে চায় তারাই তোমাদের নিকৃষ্টতম শত্রু। কারণ প্রথম শত্রুটি তোমাদের বৈষয়িক ক্ষতি করতে চায় কিন্তু দ্বিতীয় শত্রুটি চায় তোমাদেরকে আখেরাতের চিরন্তন আযাবের মধ্যে ঠেলে দিতে এবং এ জন্য সে তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২৩৪. জিহাদ অর্থ হচ্ছে, কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ অর্জনে নিজের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এটি নিছক যুদ্ধের সমার্থক কোন শব্দ নয়। যুদ্ধের জন্য আরবীতে 'কিতাল' (রক্তপাত) শব্দ ব্যবহার করা হয়। জিহাদের অর্থ তার চাইতে ব্যাপক। সব রকমের প্রচেষ্টা ও সাধনা এর অন্তরভুক্ত। মুজাহিদ এমন এক ব্যক্তিকে বলা হয়, যে সর্বক্ষণ নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনে নিমগ্ন, যার মস্তিষ্ক সবসময় ঐ উদ্দেশ্য সম্পাদনের উপায় ও কৌশল উদ্ভাবনে ব্যস্ত। যার কণ্ঠ ও লেখনী নিজের উদ্দেশ্যের প্রচারণায় নিয়োজিত। মুজাহিদের হাত, পা ও শরীরের প্রতিটি অংগ প্রত্যংগ জিহাদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য সারাক্ষণ প্রচেষ্টা, সাধনা ও পরিশ্রম করে চলছে। জিহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সে নিজের সম্ভাব্য সমস্ত উপায়–উপকরণ নিয়োগ করে, পূর্ণ শক্তি দিয়ে এই পথের সমস্ত বাধার মোকাবিলা করে, এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন প্রাণ উৎসর্গ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন নির্দ্বিধায় এগিয়ে যায়। এর নাম "জিহাদ।" আর আল্লাহর পথে জিহাদ হচ্ছে ঃ এ সবকিছু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে হবে। এই দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহর দীন তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আল্লাহর বাণী ও বিধান দুনিয়ার সমস্ত মতবাদ, চিন্তা ও বিধানের ওপর বিজয় লাভ করবে। মুজাহিদের সামনে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ থাকবে না।

২৩৫. এটি হচ্ছে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রথম নির্দেশ। এখানে শুধুমাত্র অপছন্দের কথা ব্যক্ত করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যাতে মন ও মস্তিষ্ক তার হারাম হবার বিষয়টি গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। পরে মদ পান করে নামায পড়া নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। তারপর সবশেষে মদ ও জুয়া এবং এই পর্যায়ের সমস্ত বস্তুকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করা হয়। (দেখুন সূরা নিসা, ৪৩ আয়াত এবং সূরা মা–য়েদাহ, ৯০ আয়াত)।

২৩৬. এই আয়াত নাযিল হবার আগে এতিমদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে কুরআনে বারবার কঠোর নির্দেশ এসে গিয়েছিল। সে নির্দেশগুলোয় এতদূর বলে দেয়া হয়েছিল যে, "এতিমদের সম্পদের ধারে কাছেও যেয়ো না" এবং "যারা যুলুম নির্যাতন চালিয়ে এতিমদের সম্পদ খায় তারা আগুনের সাহায্যে নিজেদের পেট ভরে।" এই কঠোর নির্দেশের ভিত্তিতে এতিম ছেলেমেয়েদের লালন পালনকারীরা এতদূর ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা এতিমদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা নিজেদের থেকে আলাদা করে দিয়েছিল। এই ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করার পরও তারা এতিমদের সম্পদের কিছু অংশ তাদের নিজেদের সাথে মিশে যাবার ভয় করছিল। তাই তারা এই এতিম ছেলেমেয়েদের সাথে লেনদেন ও আচরণের সঠিক পদ্ধতি কি হতে পারে সে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۭ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۭ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ښ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

মুশরিক নারীদেরকে কখনো বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একটি সম্ভ্রান্ত মুশরিক নারী তোমাদের মনহরণ করলেও একটি মু'মিন দাসী তার চেয়ে ভালো। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে নিজেদের নারীদের কখনো বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একজন সম্ভ্রান্ত মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করলেও একজন মুসলিম দাস তার চেয়ে ভালো। তারা তোমাদের আহবান জানাচ্ছে আগুনের দিকে[২৩৭] আর আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। তিনি নিজের বিধান সুস্পষ্ট ভাষায় লোকদের সামনে বিবৃত করেন। আশা করা যায়, তারা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে।

২৩৭. মুশরিকদের সাথে বিয়ে–শাদীর সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে ওপরে যে কথা বলা হয়েছে এটি হচ্ছে তার মূল কারণ ও যুক্তি। নারী ও পুরুষের মধ্যে বিয়েটা নিছক একটি যৌন সম্পর্ক মাত্র নয়। বরং এটি একটি গভীর তামাদ্দুনিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও মানসিক সম্পর্ক। মু'মিন ও মুশরিকের মধ্যে যদি মানসিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহলে যেখানে একদিকে মু'মিন স্বামী বা স্ত্রীর প্রভাবে মুশরিক স্ত্রী বা স্বামী এবং তার পরিবার ও পরবর্তী বংশধররা ইসলামী আকীদা–বিশ্বাস ও জীবন ধারায় গভীরভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়ে যেতে পারে, সেখানে অন্যদিকে মুশরিক স্বামী বা স্ত্রীর ধ্যান–ধারণা, চিন্তা–ভাবনা ও আচার–ব্যবহারে কেবলমাত্র মু'মিন স্বামীর বা স্ত্রীরই নয় বরং তার সমগ্র পরিবার ও পরবর্তী বংশধরদেরও প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ধরনের দাম্পত্য জীবনের ফলশ্রুতিতে ইসলাম কুফর ও শিরকের এমন একটি মিশ্রিত জীবন ধারা সেই গৃহে ও পরিবারে লালিত হবার সম্ভাবনাই বেশী, যাকে অমুসলিমরা যতই পছন্দ করুক না কেন ইসলাম তাকে পছন্দ করতে এক মুহূর্তের জন্যও প্রস্তুত নয়। কোন খাঁটি ও সাচ্চা মু'মিন নিছক নিজের যৌন লালসা পরিতৃপ্তির জন্য কখনো নিজ গৃহে ও পরিবারে কাফেরী ও মুশরিকী চিন্তা–আচার–আচরণ লালিত হবার এবং নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের জীবনের কোন ক্ষেত্রে কুফর ও শিরকে প্রভাবিত হয়ে যাবার বিপদ ডেকে আনতে পারে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোন মু'মিন কোন মুশরিকের প্রেমে পড়ে গেছে তাহলেও

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۖ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۠ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾

২৮ রুকূ'

তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, হায়েয সম্পর্কে নির্দেশ কি? বলে দাও : সেটি একটি অশুচিকর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থা।[২৩৮] এ সময় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পাক-সাফ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধারে কাছেও যেয়ো না।[২৩৯] তারপর যখন তারা পাক-পবিত্র হয়ে যায়, তাদের কাছে যাও যেভাবে যাবার জন্য আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।[২৪০] আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে। তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কৃষিক্ষেত। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের কৃষিক্ষেতে যাও।[২৪১] তবে নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা করো[২৪২] এবং আল্লাহর অসন্তোষ থেকে দূরে থাকো। একদিন তোমাদের অবশ্যি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে হবে, একথা ভালোভাবেই জেনে রাখো। আর হে নবী! যারা তোমার বিধান মেনে নেয় তাদেরকে সাফল্য ও সৌভাগ্যের সুখবর শুনিয়ে দাও।

তার ঈমানের দাবী হচ্ছে এই যে, সে নিজের পরিবার, বংশধর ও নিজের দীন, নৈতিকতা ও চরিত্রের স্বার্থে নিজের ব্যক্তিগত আবেগকে কুরবানী করে দেবে।

২৩৮. মূল আয়াতে 'আযা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হয় অশুচিতা, অপরিচ্ছন্নতা আবার রোগ-ব্যধিও। হায়েয কেবলমাত্র একটি অশুচিতা ও অপরিচ্ছন্নতাই নয় বরং চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই অবস্থাটি সুস্থতার তুলনায় অসুস্থতারই বেশী কাছাকাছি।

২৩৯. এ ধরনের বিষয়গুলোকে কুরআন মজীদ উপমা ও রূপকের মাধ্যমে পেশ করে। তাই এখানে দূরে থাকা ও ধারে কাছে না যাওয়া শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۴﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۲۵﴾

যে শপথের উদ্দেশ্য হয় সৎকাজ, তাকওয়া ও মানব কল্যাণমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা, তেমন ধরনের শপথবাক্য উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহর নাম ব্যবহার করো না।[২৪৩] *আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কথা শুনছেন এবং তিনি সবকিছু জানেন। তোমরা অনিচ্ছায় যেসব অর্থহীন শপথ করে ফেলো সেগুলোর জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না,*[২৪৪] *কিন্তু আন্তরিকতার সাথে তোমরা যেসব শপথ গ্রহণ করো সেগুলোর জন্য তিনি অবশ্যি পাকড়াও করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু।*

এই নয় যে, ঋতুবতী নারীর সাথে এক বিছানায় বসা বা এক সাথে খাওয়া–দাওয়া করা যাবে না। তাদেরকে অস্পৃশ্য–অশুচি মনে করে এক ধারে ঠেলে দিতে হবে, এমন কথা নয়। যদিও ইহুদি, হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিম জাতিদের মধ্যে ঋতুবতী স্ত্রীদের সাথে এ ব্যবহার কোথাও কোথাও প্রচলিত দেখা যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে বুঝা যায়, ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কেবলমাত্র সহবাস ছাড়া বাকি সকল প্রকার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।

২৪০. এখানে শরীয়াতের নির্দেশের কথা বলা হয়নি। বরং এমন নির্দেশের কথা বলা হয়েছে যা স্বভাব সিদ্ধ ও প্রকৃতিজাত। মানুষ ও জীবজন্তুর স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে যাকে নীরবে ও সংগোপনে ক্রিয়াশীল রাখা হয়েছে এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রতিটি প্রাণী যে সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই সচেতন।

২৪১. অর্থাৎ আল্লাহ সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম নারীকে পুরুষের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করেনি বরং তাদের উভয়ের মধ্যে জমি ও কৃষকের মতো একটা সম্পর্ক রয়েছে। জমিতে কৃষক নিছক বিচরণ ও ভ্রমণ করতে যায় না। জমি থেকে ফসল উৎপাদন করার জন্যই সে সেখানে যায়। মানব বংশ ধারার কৃষককেও মানবতার এই জমিতে সন্তান উৎপাদন ও বংশধারাকে সমুন্নত রাখার লক্ষেই যেতে হবে। মানুষ এই জমিতে কিভাবে ফসল উৎপাদন করবে সে সম্বন্ধে আল্লাহর শরীয়াতের কোন বক্তব্য নেই। তবে তার দাবী কেবল এতটুকুন যে, তাকে জমিতেই যেতে হবে এবং সেখান থেকে ফসল উৎপাদন করার লক্ষ্যেই যেতে হবে।

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য রয়েছে চার মাসের অবকাশ।[২৪৫] যদি তারা রুজু করে (ফিরে আসে) তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[২৪৬] আর যদি তারা তালাক দেবার সংকল্প করে[২৪৭] তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।[২৪৮]

২৪২. এখানে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর দু'টি অর্থ হয়। দু'টিরই গুরুত্ব সমান। এর একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের বংশধারা রক্ষা করার চেষ্টা করো। তোমাদের দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগেই যেন তোমাদের স্থান গ্রহণকারী তৈরি হয়ে যায়। দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যে পরবর্তী বংশধরকে তোমরা নিজেদের স্থলাভিষিক্ত করে যাচ্ছো, তাকে দীন, ঈমান, চরিত্র, নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলীতে ভূষিত করার চেষ্টা করো। পরবর্তী বাক্যে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, এই দু'টি দায়িত্ব পালনে তোমরা যদি স্বেচ্ছায় গাফলতি বা ত্রুটি করো তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

২৪৩. সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খাওয়ার পর যখন কসম ভেঙে ফেলাই তার জন্য কল্যাণকর বলে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে তখন তার কসম ভেঙে ফেলা এবং তার কাফ্ফারা আদায় করা উচিত। কসম ভাঙার কাফ্ফারা হচ্ছে, দশজন মিসকিনকে আহার করানো অথবা তাদের বস্ত্রদান করা বা একটি দাস মুক্ত করে দেয়া অথবা তিন দিন রোযা রাখা। (সূরা মা–য়েদাহর ৮৯ আয়াত দেখুন)।

২৪৪. অর্থাৎ কথার কথা হিসেবে অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব শপথ বাক্য তোমাদের মুখ থেকে বের হয়ে যায়, সেগুলোর জন্য কোন কাফ্ফারা দিতে এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

২৪৫. ফিকাহর পরিভাষায় একে বলা হয় 'ঈলা'। স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে সবসময় মধুর সম্পর্ক থাকা তো সম্ভব নয়। বিভিন্ন সময় সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার বহুবিধ কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর শরীয়াত এমন ধরনের সম্পর্ক ভাঙা পছন্দ করে না যার ফলে উভয়ে আইনগতভাবে দাম্পত্য বাঁধনে আটকে থাকে কিন্তু কার্যত পরস্পর এমনভাবে আলাদা থাকে যেন তারা স্বামী–স্ত্রী নয়। এই ধরনের সম্পর্ক বিকৃতির জন্য আল্লাহ চার মাস সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই চার মাসের মধ্যে উভয়ের মধ্যে স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করতে হবে। অন্যথায় এই সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে হবে। তারপর উভয়ে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামতো বিয়ে করতে পারবে।

আয়াতে যেহেতু 'কসম খেয়ে বসা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাই হানাফী ও শাফেঈ ফকীহগণ এই আয়াতের যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে এই যে, যেখানে স্বামী তার

স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক না রাখার কসম খায় একমাত্র সেখানেই এই বিধানটি কার্যকর হবে। আর কসম না খেয়ে দাম্পত্য সম্পর্ক যত দীর্ঘকালের জন্য ছিন্ন করুক না কেন এই আয়াতের নির্দেশ সেখানে প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু মালেকী ফকীহদের মত হচ্ছে, কসম খাক বা না খাক উভয় অবস্থায় এই চার মাসের অবকাশ পাবে। ইমাম আহমাদের (র) একটি বক্তব্যও এর সমর্থনে পাওয়া যায়।

হযরত আলী (রা), ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান বসরীর (র) মতে এই নির্দেশটি শুধুমাত্র বিকৃতির কারণে যে সম্পর্কচ্ছেদ হয় তার জন্য প্রযোজ্য। তবে কোন অসুবিধার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক থাকা অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্কচ্ছেদ করে তবে তার ওপর এই নির্দেশটি প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু অন্যান্য ফকীহদের মতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দৈহিক সম্পর্ক ছিন্নকারী প্রত্যেকটি শপথই 'ঈলা'র অন্তরভুক্ত এবং সন্তুষ্টির সাথে হোক বা অসন্তুষ্টির সাথে হোক চার মাসের বেশী সময় পর্যন্ত এই ধরনের অবস্থা অব্যাহত থাকা উচিত নয়।

২৪৬. কোন কোন ফকীহ এ বাক্যের অর্থ এভাবে গ্রহণ করেছেন যে, এই নির্দিষ্ট সময়-কালের মধ্যে যদি তারা নিজেদের কসম ভেঙে ফেলে এবং তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন করে নেয়, তাহলে তাদের কসম ভাঙার কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। আল্লাহ তাদেরকে এমনিতেই মাফ করে দেবেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহর মত হচ্ছে এই যে, কসম ভাঙার জন্য কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু বলার মানে এই নয় যে, কাফ্ফারা মাফ করে দেয়া হয়েছে। বরং এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদের কাফ্ফারা কবুল করে নেবেন এবং সম্পর্কচ্ছেদের সময়ে তোমরা পরস্পরের ওপর যেসব বাড়াবাড়ি করেছিলে সেগুলো মাফ করে দেবেন।

২৪৭. হযরত উসমান (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) প্রমুখ সাহাবীগণের মতে 'রুজূ' করার অর্থাৎ শপথ ভাঙার ও পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ চার মাস সময়-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সময়টি অতিবাহিত হয়ে যাওয়া এই অর্থ বহন করে যে, স্বামী তালাক দেয়ার সংকল্প করেছে। তাই এ অবস্থায় এই নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথেই আপনা আপনি তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। সেটি হবে এক 'তালাকে বায়েন'। অর্থাৎ ইদ্দত পালনকালে স্বামীর আর স্ত্রীকে গ্রহণ করার অধিকার থাকবে না। তবে তারা উভয়ে চাইলে আবার নতুন করে বিয়ে করতে পারবে। হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত ইবনে উমর (রা) থেকেও এই ধরনের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। হানাফী ফকীহগণ এই মতটিই গ্রহণ করেছেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, মাকহূল, যুহরী প্রমুখ ফকীহগণ এই মতটির এই অংশটুকুর সাথে একমত হয়েছেন যে, চার মাস সময় অতিবাহিত হবার পর স্বতস্ফূর্তভাবে তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে, কিন্তু তাঁদের মতে সেটা হবে এক 'তালাকে রজঈ'। অর্থাৎ ইদ্দত পালন কালে স্বামী আবার স্ত্রীকে রুজূ করার তথা দাম্পত্য সম্পর্কে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হবে। আর যদি 'রুজূ' না করে তাহলে ইদ্দত অতিবাহিত হবার পর দু'জন আবার চাইলে বিয়ে করতে পারবে।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ۭ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ۭ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

তালাক প্রাপ্তাগণ তিনবার মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকে গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয়। তাদের কখনো এমনটি করা উচিত নয়, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়, তাদের স্বামীরা পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে প্রস্তুত হয়, তাহলে তারা এই অবকাশ কালের মধ্যে তাদেরকে নিজের স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নেবার অধিকারী হবে।[২৪৯]

নারীদের জন্যও ঠিক তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন পুরুষদের অধিকার আছে তাদের ওপর। তবে পুরুষদের তাদের ওপর একটি মর্যাদা আছে। আর সবার ওপরে আছেন আল্লাহ সর্বাধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী।

২৪৮. অর্থাৎ যদি তুমি অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে নিশঙ্ক থেকো না। তিনি তোমার বাড়াবাড়ি ও অন্যায় সম্পর্কে অনবহিত নন।

২৪৯. এই আয়াতে প্রদত্ত বিধানটির ব্যাপারে ফকীহগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের একটি দলের মতে, স্ত্রীর তৃতীয় ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাবার পর যতক্ষণ সে গোসল করে পাক–সাফ না হয়ে যাবে ততক্ষণ তালাকে বায়েন অনুষ্ঠিত হবে না। এবং ততক্ষণ স্বামীর রুজু করার অধিকার থাকবে। হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এবং অন্যান্য বড় বড় সাহাবীগণ এই মত পোষণ করেন। হানাফী ফকীহগণও এই মত গ্রহণ করে নিয়েছেন। বিপরীত পক্ষে অন্য দলটি স্ত্রীর তৃতীয় ঋতুস্রাব শুরু হবার সাথে সাথেই স্বামীর 'রুজু' করার অধিকার খতম হয়ে যাবে। এই মত পোষণ করেন, হযরত আয়েশা (রা), হযরত ইবনে উমর (রা), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), শাফেঈ ও মালেকী ফকীহগণ এই মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ اَنۡ تَاۡخُذُوۡا مِمَّآ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ شَيۡـئًا اِلَّآ اَنۡ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيۡمَا افۡتَدَتۡ بِهٖ ؕ تِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ فَلَا تَعۡتَدُوۡهَا ۚ وَمَنۡ يَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۲۲۹﴾

২৯ রুকূ'

তালাক দু'বার। তারপর সোজাসুজি স্ত্রীকে রেখে দিবে অথবা ভালোভাবে বিদায় করে দেবে।[২৫০]

আর তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো বিদায় করার সময় তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়।[২৫১] *তবে এটা স্বতন্ত্র, স্বামী-স্ত্রী যদি আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না বলে আশংকা করে, তাহলে এহেন অবস্থায় যদি তোমরা আশংকা করো, তারা উভয়ে আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রীর কিছু বিনিময় দিয়ে তার স্বামী থেকে বিচ্ছেদ লাভ করায় কোন ক্ষতি নেই।*[২৫২] *এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা, এগুলো অতিক্রম করো না। মূলত যারাই আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে তারাই জালেম।*

নির্দেশটি কেবলমাত্র যখন স্বামী তার স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দেয় তখনকার অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। স্বামী তিন তালাক দেয়ার পর আর তার রুজূ করার অধিকার থাকবে না।

২৫০. এই ছোট্ট আয়াতটিতে জাহেলী যুগে আরবে প্রচলিত একটি বড় রকমের সামাজিক ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। তদানীন্তন আরবে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অসংখ্য তালাক দিতে পারতো। স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিরূপ হয়ে গেলে তাকে বারবার তালাক দিতো এবং আবার ফিরিয়ে নিতো। এভাবে বেচারী স্ত্রী না স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে পারতো আর না স্বাধীনভাবে আর কাউকে বিয়ে করতে পারতো। কুরআন মজীদের এই আয়াতটি এই জুলুমের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। এই আয়াতের দৃষ্টিতে স্বামী একটি বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে নিজের স্ত্রীকে বড় জোর দু'বার 'রজঈ তালাক' দিতে পারে। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দু'বার তালাক দেয়ার পর আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়েছে সে তার

জীবনকালে যখন তাকে তৃতীয়বার তালাক দেবে তখন সেই স্ত্রী তার থেকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

কুরআন ও হাদীস থেকে তালাকের যে সঠিক পদ্ধতি জানা যায় তা হচ্ছে এই ঃ স্ত্রীকে 'তুহর' (ঋতুকালীন রক্ত প্রবাহ থেকে পবিত্র)–এর অবস্থায় তালাক দিতে হবে। যদি এমন সময় স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয় যখন তার মাসিক ঋতুস্রাব চলছে, তাহলে তখনই তালাক দেয়া সংগত নয়। বরং ঋতুস্রাব বন্ধ হবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তারপর এক তালাক দেয়ার পর চাইলে দ্বিতীয় 'তুহরে' আর এক তালাক দিতে পারে। অন্যথায় প্রথম তালাকটি দিয়ে ক্ষান্ত হওয়াই ভালো। এ অবস্থায় ইদ্দত অতিক্রান্ত হবার আগে স্বামীর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে যাবার পরও উভয়ের জন্য পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে পুনর্বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগও থাকে। কিন্তু তৃতীয় 'তুহরে' তৃতীয়বার তালাক দেয়ার পর স্বামী আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার বা পুনর্বার উভয়ের এক সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার কোন অধিকার থাকে না। তবে একই সময় তিন তালাক দেয়ার ব্যাপারটি যেমন অজ্ঞ লোকেরা আজকাল সাধারণভাবে করে থাকে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে কঠিন গোনাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোরভাবে এর নিন্দা করেছেন। এমনকি হযরত উমর (রা) থেকে এতদূর প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একই সময় স্ত্রীকে তিন তালাক দিতো তিনি তাকে বেত্রাঘাত করতেন।

(তবুও একই সময় তিন তালাক দিলে চার ইমামের মতে তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে কিন্তু তালাকদাতা কঠিন গোনাহের অধিকারী হবে। আর শরীয়াতের দৃষ্টিতে এটি মুগাল্লাযা বা গর্হিত তালাক হিসেবে গণ্য হবে।)

২৫১. অর্থাৎ মোহরানা, গহনাপত্র ও কাপড়–চোপড় ইত্যাদি, যেগুলো স্বামী ইতিপূর্বে স্ত্রীকে দিয়েছিল। সেগুলোর কোন একটি ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তার নেই। এমনিতে কোন ব্যক্তিকে দান বা উপহার হিসেবে কোন জিনিস দিয়ে দেয়ার পর তার কাছ থেকে আবার তা ফিরিয়ে নিতে চাওয়া ইসলামী নৈতিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই ঘৃণ্য কাজকে হাদীসে এমন কুকুরের কাজের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে নিজে বমি করে আবার তা খেয়ে ফেলে। কিন্তু বিশেষ করে একজন স্বামীর জন্য নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাকে বিদায় করার সময় সে নিজে তাকে এক সময় যা কিছু দিয়েছিল সব তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নেয়া অত্যন্ত লজ্জাকর। বিপরীতপক্ষে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করার নৈতিক আচরণ ইসলাম শিখিয়েছে। (৩১ রুকূ'র শেষ আয়াতটি দেখুন)

২৫২. শরীয়াতের পরিভাষায় একে বলা হয় 'খুলা' তালাক। অর্থাৎ স্বামীকে কিছু দিয়ে স্ত্রী তার কাছ থেকে তালাক আদায় করে নেয়া। এ ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঘরোয়াভাবেই যদি কিছু স্থিরীকৃত হয়ে যায় তাহলে তাই কার্যকর হবে। কিন্তু ব্যাপারটি যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায়, তাহলে আদালত কেবল এতটুকু অনুসন্ধান করবে যে, এই ভদ্রমহিলা তার স্বামীর প্রতি যথার্থই এত বেশী বিরূপ হয়ে পড়েছে কিনা যার ফলে

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

অতপর যদি (দু'বার তালাক দেবার পর স্বামী তার স্ত্রীকে তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তাহলে ঐ স্ত্রী তার জন্য আর হালাল হবে না। তবে যদি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হয় এবং সে তাকে তালাক দেয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে প্রথম স্বামী এবং এই মহিলা যদি আল্লাহর সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে বলে মনে করে তাহলে তাদের উভয়ের জন্য পরস্পরের দিকে ফিরে আসায় কোন ক্ষতি নেই।[২৫৩] এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। (এগুলো ভংগ করার পরিণতি) যারা জানে তাদের হিদায়াতের জন্য এগুলো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছেন।

তাদের দু'জনের এক সাথে ঘর সংসার করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সঠিক অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিত হবার পর আদালত অবস্থার প্রেক্ষিতে যে কোন বিনিময় নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। এই বিনিময় গ্রহণ করে স্বামীর অবশ্যি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। স্বামী ইতিপূর্বে যে পরিমাণ সম্পদ তার ঐ স্ত্রীকে দিয়েছিল তার চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ–সম্পদ বিনিময় হিসেবে তাকে ফেরত দেয়া সাধারণত ফকীহগণ পছন্দ করেননি।

'খুলা' তালাক 'রজঈ' নয়। বরং এটি 'বায়েনা' তালাক। যেহেতু স্ত্রীলোকটি মূল্য দিয়ে এক অর্থে তালাকটি যেন কিনে নিয়েছে, তাই এই তালাকের পর আবার রুজু করার তথা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর থাকে না। তবে আবার যদি তারা পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তাহলে এমনটি করা তাদের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ।

অধিকাংশ ফিকাহ শাস্ত্রবিদের মতে 'খুলা' তালাকের ইদ্দতও সাধারণ তালাকের সমান। কিন্তু আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে এমন বহুতর হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যা থেকে জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ঋতুকালকে এর ইদ্দত গণ্য করেছিলেন। হযরত উসমান (রা) এই অনুযায়ী একটি মামলারও ফায়সালা দিয়েছিলেন। (ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা)।

২৫৩. সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কোন ব্যক্তি নিজের তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিছক নিজের জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে চক্রান্তমূলকভাবে কারোর সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং প্রথম থেকে তার সাথে এই চুক্তি করে নেয় যে, বিয়ে করার পর সে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, তাহলে এটা হবে একটি সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। এই ধরনের

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن
يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ
هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم
مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তাদের ইদ্দত পূর্ণ হবার পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন হয় সোজাসুজি তাদেরকে রেখে দাও আর নয়তো ভালোভাবে বিদায় করে দাও। নিছক কষ্ট দেবার জন্য তাদেরকে আটকে রেখো না। কারণ এটা হবে বাড়াবাড়ি। আর যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে আসলে নিজের ওপর জুলুম করবে।[২৫৪] আল্লাহর আয়াতকে খেলা–তামাসায় পরিণত করো না। ভুলে যেয়ো না আল্লাহ তোমাদের কত বড় নিয়ামত দান করেছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দান করছেন, যে কিতাব ও হিকমাত তিনি তোমাদের ওপর নাযিল করেছেন তাকে মর্যাদা দান করো।[২৫৫] আল্লাহকে ভয় করো এবং ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ সব কথা জানেন।

বিয়ে মোটেই বিয়ে বলে গণ্য হবে না। বরং এটি হবে নিছক একটি ব্যভিচার। আর এই ধরনের বিয়ে ও তালাকের মাধ্যমে কোন ক্রমেই কোন মহিলা তার সাবেক স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে না। হযরত আলী (রা), ইবনে মাসউদ (রা), আবু হুরাইরা (রা) ও উকবা ইবনে আমের (রা) প্রমুখ সহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একযোগে রেওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি এভাবে তালাক দেয়া স্ত্রীদের যারা হালাল করে এবং যাদের মাধ্যমে হালাল করা হয় তাদের উভয়ের ওপর লানত বর্ষণ করেছেন।

২৫৪. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তারপর ইদ্দত শেষ হবার আগে আবার তাকে ফিরিয়ে নেয় শুধুমাত্র কষ্ট ও জ্বালা–যন্ত্রণা দেয়ার সুযোগ লাভ করার উদ্দেশ্যে, তাহলে এটা কোনক্রমেই সঠিক কাজ বলে গণ্য হবে না। আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, ফিরিয়ে নিতে চাইলে এই উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে নাও যে, এবার থেকে তার সাথে সদাচরণ করবে। অন্যথায় ভদ্রভাবে তাকে বিদায় দাও। (আরো জানার জন্য ২৫০নং টীকা দেখুন)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

৩০ রুকূ'

তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার পর যখন তারা ইদ্দত পূর্ণ করে নেয় তখন তাদের নিজেদের প্রস্তাবিত স্বামীদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে তোমরা বাধা দিয়ো না, যখন তারা প্রচলিত পদ্ধতিতে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত হয়।[২৫৬] এ ধরনের পদক্ষেপ কখনো গ্রহণ না করার জন্য তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাকো। এ থেকে বিরত থাকাই তোমাদের জন্য সবচেয়ে পরিমার্জিত ও সর্বাধিক পবিত্র পদ্ধতি। আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না।

২৫৫. অর্থাৎ এ সত্যটি ভুলে যেয়ো না যে, মহান আল্লাহ তোমাদের কিতাব ও হিকমত তথা জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে সারা দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাতের (উম্মাতে ওয়াসাত) মর্যাদা দান করা হয়েছে। তোমাদেরকে সত্যতা, সৎবৃত্তি, সৎকর্মশীলতা ও ন্যায়নিষ্ঠার মূর্তিমান প্রতীক হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। বাহানাবাজী করে আল্লাহর আয়াতকে খেল–তামাশায় পরিণত করা তোমাদের সাজে না। আইনের শব্দের আড়ালে আইনের মূল প্রাণসত্তার বিরুদ্ধে অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করো না। বিশ্বাসীকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার পরিবর্তে তোমরা নিজের গৃহে জালেম ও পথভ্রষ্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ো না।

২৫৬. অর্থাৎ কোন স্ত্রীলোককে তার স্বামী তালাক দিয়ে দেয়ার পর ইদ্দতকালের মধ্যে যদি তাকে ফিরিয়ে না নেয় এবং ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হবার পর তারা দু'জন পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আবার বিয়ে করতে চায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটির আত্মীয়–স্বজনদের তাদের এই পদক্ষেপে বাধা দেয়া উচিত নয়। এ ছাড়া এ আয়াতটির এ অর্থও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতকাল অতিক্রম করার পর তার থেকে মুক্ত হয়ে গিয়ে নিজের পছন্দমতো অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায়। এ ক্ষেত্রে তার পূর্ববর্তী স্বামী কোন হীন মানসিকতার বশবর্তী হয়ে যেন তার এ বিয়েতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। যে মহিলাকে সে ত্যাগ করেছে তাকে যাতে আর কেউ গ্রহণ করতে এগিয়ে না আসে এ জন্য যেন সে প্রচেষ্টা চালাতে না থাকে।

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

যে পিতা তার সন্তানের দুধ পানের সময়-কাল পূর্ণ করতে চায়; সে ক্ষেত্রে মায়েরা পুরো দু'বছর নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করাবে।[২৫৭] এ অবস্থায় সন্তানদের পিতাকে প্রচলিত পদ্ধতিতে মায়েদের খোরাক পোশাক দিতে হবে। কিন্তু কারোর ওপর তার সামর্থের বেশী বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। কোন মা'কে এ জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না যে, সন্তানটি তার। আবার কোন বাপকেও এ জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না যে, এটি তারই সন্তান। দুধ দানকারিণীর এ অধিকার যেমন সন্তানের পিতার ওপর আছে তেমনি আছে তার ওয়ারিশের ওপরও।[২৫৮] কিন্তু যদি উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে এমনটি করায় কোন ক্ষতি নেই। আর যদি তোমার সন্তানদের অন্য কোন মহিলার দুধ পান করাবার কথা তুমি চিন্তা করে থাকো, তাহলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, এ জন্য যা কিছু বিনিময় নির্ধারণ করবে তা প্রচলিত পদ্ধতিতে আদায় করবে। আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করো না কেন সবই আল্লাহর নজরে আছে।

২৫৭ এ নির্দেশটি এমন এক অবস্থার জন্য যখন স্বামী-স্ত্রী পরস্পর থেকে তালাক বা খুলা' তালাকের মাধ্যমে অথবা আদালত কর্তৃক বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং স্ত্রীর কোলে রয়েছে দুগ্ধপোষ্য শিশু।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ
بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿২৩৪﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ
اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ
وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ؕ
وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿২৩৫﴾

তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যায়, তাদের পরে যদি তাদের স্ত্রীরা জীবিত থাকে, তাহলে তাদের চার মাস দশ দিন নিজেদেরকে (বিবাহ থেকে) বিরত রাখতে হবে।[২৫৯] তারপর তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেলে তারা ইচ্ছামতো নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত পদ্ধতিতে যা চায় করতে পারে, তোমাদের ওপর এর কোন দায়িত্ব নেই। আল্লাহ তোমাদের সবার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত। ইদ্দতকালে তোমরা এই বিধবাদেরকে বিয়ে করার ইচ্ছা ইশরা ইংগিতে প্রকাশ করলে অথবা মনের গোপন কোণে লুকিয়ে রাখলে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ জানেন, তাদের চিন্তা তোমাদের মনে জাগবেই। কিন্তু দেখো, তাদের সাথে কোন গোপন চুক্তি করো না। যদি কোন কথা বলতে হয়, প্রচলিত ও পরিচিত পদ্ধতিতে বলো। তবে বিবাহ বন্ধনের সিদ্ধান্ত ততক্ষণ করবে না যতক্ষণ না ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। খুব ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের মনের অবস্থাও জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় করো। এবং একথাও জেনে রাখো, আল্লাহ ধৈর্যশীল এবং ছোট খাটো ত্রুটিগুলো এমনিতেই ক্ষমা করে দেন।

২৫৮. অর্থাৎ বাপ যদি মারা গিয়ে থাকে, তাহলে তার অভিভাবককে এ অধিকার আদায় করতে হবে।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

৩১ রুকূ'

নিজেদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার বা মোহরানা নির্ধারণ করার আগেই যদি তোমরা তালাক দিয়ে দাও তাহলে এতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। এ অবস্থায় তাদেরকে অবশ্যি কিছু না কিছু দিতে হবে।[২৬০] সচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং দরিদ্র তার সংস্থান অনুযায়ী প্রচলিত পদ্ধতিতে দেবে। সৎলোকদের ওপর এটি একটি অধিকার। আর যদি তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তোমরা তালাক দিয়ে দাও কিন্তু মোহরানা নির্ধারিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এ অবস্থায় মোহরানার অর্ধেক তাদেরকে দিতে হবে। স্ত্রী যদি নরম নীতি অবলম্বন করে (এবং মোহরানা না নেয়) অথবা সেই ব্যক্তি নরমনীতি অবলম্বন করে, যার হাতে বিবাহ বন্ধন নিবদ্ধ (এবং সম্পূর্ণ মোহরানা দিয়ে দেয়) তাহলে সেটা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা (অর্থাৎ পুরুষরা) নরম নীতি অবলম্বন করো। এ অবস্থায় এটি তাকওয়ার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। পারস্পরিক ব্যাপারে তোমরা উদারতা ও সহৃদয়তার নীতি ভুলে যেয়ো না।[২৬১] তোমাদের কার্যাবলী আল্লাহ দেখছেন।

তোমাদের নামাযগুলো[২৬২] সংরক্ষণ করো, বিশেষ করে এমন নামায যাতে নামাযের সমস্ত গুণের সমন্বয় ঘটেছে।[২৬৩] আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াও যেমন অনুগত সেবকরা দাঁড়ায়।

২৫৯. স্বামী মারা যাবার পর স্ত্রীর ইদ্দত পালনের যে সময়–কাল এখানে বর্ণিত হয়েছে এটি এমন বিধবাদেরও পালন করতে হবে যাদের সাথে তাদের স্বামীদের বিয়ের পর একান্তে বসবাস হয়নি। তবে গর্ভবতী বিধবাদের এই ইদ্দত পালন করতে হবে না। গর্ভস্থ সন্তান প্রসব হবার সাথে সাথেই তাদের উদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর পরই অথবা তার কয়েক মাস পরে সন্তান প্রসব হোক না কেন সমান কথা।

"নিজেদেরকে বিরত রাখতে হবে"—এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, এই সময় বিয়ে করতে পারবে না বরং এই সংগে সংগে নিজেকে কোন প্রকার সাজ–সজ্জা ও অলংকারেও ভূষিত করতে পারবে না। হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, স্বামী মৃত্যুকালীন ইদ্দত পালনের সময় নারীরা রঙীন কাপড় ও অলংকার পরতে পারবে না, মেহেদী, সুর্মা, খুশ্‌বু ও খেজাব লাগাতে পারবে না, এমনকি কেশ বিন্যাস করতেও পারবে না। তবে এই সময় নারীরা ঘর থেকে বাইরে যেতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত ইবনে উমর (রা), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা), হযরত উম্মে সালমা (রা), সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, ইবরাহীম নাখঈ, মুহাম্মাদ ইবনে শীরীন এবং চার ইমামের মতে স্বামী যে ঘরে মারা গেছে ইদ্দত পালনকালে বিধবা স্ত্রীকে সেই ঘরেই থাকতে হবে। দিনের বেলা কোন প্রয়োজনে সে বাইরে যেতে পারে। কিন্তু ঐ ঘরের মধ্যেই তার অবস্থান হতে হবে। বিপরীত পক্ষে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা), আতা, তাউস, হাসান বসরী, উমর ইবনে আবদুল আযীয এবং সকল আহলুয যাহেরের মতে বিধবা স্ত্রী তার ইদ্দতকাল যেখানে ইচ্ছা পালন করতে পারে এবং এ সময় সে সফরও করতে পারে।

২৬০. সম্পর্ক স্থাপন করার পর এভাবে ভেঙে দেয়ার কারণে স্ত্রীলোকের অবশ্যি কিছু না কিছু ক্ষতি তো হয়ই। সাধ্যমতো এই ক্ষতি পূরণ করার জন্যই আল্লাহ এ নির্দেশ দিয়েছেন।

২৬১. অর্থাৎ মানবিক সম্পর্ককে মধুর ও প্রীতিপূর্ণ করার জন্য মানুষের পরস্পরের সাথে উদার ও সহৃদয় আচরণ অপরিহার্য। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র তার আইনগত অধিকারটুকুই আদায় করার ওপর জোর দিতে থাকে তাহলে কখনোই সুখী সুন্দর সমাজ জীবন গড়ে উঠতে পারে না।

২৬২. সামাজিক ও তামাদ্দুনিক বিধান বর্ণনা করার পর নামাযের তাগিদ দিয়ে আল্লাহ এই ভাষণটির সমাপ্তি টানছেন। কারণ নামায এমন একটি জিনিস, যা মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয়, সততা, সৎকর্মশীলতা ও পবিত্রতার আবেগ এবং আল্লাহর বিধানের আনুগত্যের ভাবধারা সৃষ্টি করে। আর এই সংগে তাকে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। মানুষের মধ্যে এ বস্তুগুলো না থাকলে সে কখনো আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারতো না। সে ক্ষেত্রে সে ইহুদি জাতির মতো নাফরমানির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতো।

২৬৩. মূলে 'সালাতুল উস্‌তা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন মুফাস্‌সির এর অর্থ করেছেন ফজরের নামায। কেউ যোহরের, কেউ মাগরিবের। আবার কেউ এশার

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۚ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

অশান্তি বা গোলযোগের সময় হলে পায়ে হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে যেভাবেই সম্ভব নামায পড়ো। আর যখন শান্তি স্থাপিত হয়ে যায় তখন আল্লাহকে সেই পদ্ধতিতে স্মরণ করো, যা তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে তোমরা অনবহিত ছিলে।

তোমাদের[২৬৪] মধ্য থেকে যারা মারা যায় এবং তাদের পরে তাদের স্ত্রীরা বেঁচে থাকে, তাদের স্ত্রীদের যাতে এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ করা হয় এবং ঘর থেকে বের করে না দেয়া হয় সে জন্য স্ত্রীদের পক্ষে মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে যাওয়া উচিত। তবে যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায় তাহলে তাদের নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত পদ্ধতিতে তারা যাই কিছু করুক না কেন তার কোন দায়–দায়িত্ব তোমাদের ওপর নেই। আল্লাহ সবার ওপর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাশালী এবং তিনি অতি বিজ্ঞ। অনুরূপভাবে যেসব স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়েছে তাদেরকেও সংগতভাবে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা উচিত। এটা মুত্তাকীদের ওপর আরোপিত অধিকার।

এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান পরিষ্কার ভাষায় তোমাদের জানিয়ে দেন। আশা করা যায়, তোমরা ভেবেচিন্তে কাজ করবে।

নামাযও মনে করেছেন। কিন্তু এর কোন একটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য নয়। এগুলো কেবলমাত্র ব্যাখ্যা তাদের স্বকীয় উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছুই নয়। সব চাইতে বেশী মত ব্যক্ত হয়েছে আসরের নামাযের পক্ষে। বলা হয়ে থাকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নামাযটিকে 'সালাতুল উস্‌তা' ঘোষণা করেছেন। কিন্তু যে

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

৩২ রুকূ'

তুমি[২৬৫] কি তাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু চিন্তা করেছো, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের বাড়ি–ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিল এবং তারা সংখ্যায়ও ছিল হাজার হাজার? আল্লাহ তাদের বলেছিলেন ঃ মরে যাও, তারপর তিনি তাদের পুনর্বার জীবন দান করেছিলেন।[২৬৬] আসলে আল্লাহ মানুষের ওপর বড়ই অনুগ্রহকারী কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

ঘটনাটি থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে তাতে কেবলমাত্র এতটুকু কথা বলা হয়েছে ঃ আহযাব যুদ্ধের সময় মুশরিকদের আক্রমণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতদূর ব্যস্ত রেখেছিল যার ফলে বেলা গড়িয়ে একেবারে সূর্য ডুবু ডুবু হয়েছিল। অথচ তখনো তিনি আসরের নামায পড়তে পারেননি। তখন তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ তাদের কবর ও তাদের ঘর আগুনে ভরে দিন। তারা আমাদের 'সালাতুল উস্‌তা' পড়তে দেয়নি।" এ বক্তব্য থেকেই একথা মনে করা হয়েছে যে, রসূল (সা) আসরের নামাযকে সালাতুল উস্‌তা বলেছেন। অথচ এই বক্তব্যের সবচেয়ে বেশী নির্ভুল অর্থ আমাদের কাছে এটাই মনে হচ্ছে যে, এই ব্যস্ততার কারণে উন্নত পর্যায়ের নামায থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। এখন অসময়ে এটি পড়তে হবে। তাড়াতাড়ি পড়তে হবে। খুশু–খুযু তথা নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে ধীরে–স্থিরে এ নামাযটি পড়া যাবে না।

'উস্‌তা' অর্থ মধ্যবর্তী জিনিসও হয়। আবার এ শব্দটি এমন জিনিস সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয় যা উন্নত ও উৎকৃষ্ট। 'সালাতুল উস্‌তা' অর্থ মধ্যবর্তী নামাযও হতে পারে আবার এমন নামাযও হতে পারে, যা সঠিক সময়ে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে মন সংযোগ সহকারে পড়া হয় এবং যার মধ্যে নামাযের যাবতীয় গুণেরও সমাবেশ ঘটে। আল্লাহর সামনে অনুগত বান্দার মতো দাঁড়াও—এই পরবর্তী বাক্যটি নিজেই 'সালাতুল উস্‌তা' শব্দটির ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে।

২৬৪. ভাষণের ধারাবাহিকতা ওপরেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। উপসংহার বা পরিশিষ্ট হিসেবে এখানে এ বক্তব্যটি উপস্থাপিত হয়েছে।

২৬৫. এখান থেকে আর একটি ধারাবাহিক ভাষণ শুরু হচ্ছে। এই ভাষণে মুসলমানদের আল্লাহর পথে জিহাদ ও অর্থ–সম্পদ দান করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেসব দুর্বলতার কারণে বনী ইসরাঈলরা অবশেষে অবনতি ও পতনের শিকার হয় সেগুলো থেকে মুসলমানদের দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে আলোচিত বিষয়টি অনুধাবন

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۭ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۠ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾

হে মুসলমানরা! আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো এবং ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ। তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দিতে প্রস্তুত,[২৬৭] যাতে আল্লাহ তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে তাকে ফেরত দেবেন? কমাবার ক্ষমতা আল্লাহর আছে, বাড়াবারও এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

করার জন্য এ বিষয়টি সামনে রাখতে হবে যে, মুসলমানরা সে সময় মক্কা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল, এক দেড় বছর থেকে তারা মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিল। এবং কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেরাই বারবার যুদ্ধ করার অনুমতি চাইছিল। কিন্তু যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার পর এখন তাদের মধ্যে কিছু লোক ইতস্তত করছিল, যেমন ২৬ রুকূ'র শেষ অংশে বলা হয়েছে। তাই এখানে বনী ইসরাঈলদের ইতিহাসের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

২৬৬. এখানে বনী ইসরাঈলদের মিসর ত্যাগের ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সূরা মা-য়েদাহর চতুর্থ রুকূ'তে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। বিপুল সংখ্যক বনী ইসরাঈল মিসর থেকে বের হয়ে গৃহ ও সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় বিস্তীর্ণ ধূঁ ধূঁ প্রান্তরে ঘুরে ফিরছিল। তারা একটি নির্দিষ্ট আবাস লাভের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল কিন্তু যখন আল্লাহর ইংগিতে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাদের জালেম কেনানীদেরকে ফিলিস্তিন থেকে উৎখাত করে ঐ এলাকাটি জয় করে নেয়ার নির্দেশ দিলেন তখন তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিল এবং সামনে এগিয়ে যেতে অস্বীকার করলো। অবশেষে আল্লাহ তাদের চল্লিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে হয়রান-পেরেশান-বিপন্ন অবস্থার মধ্যে দিন কাটাবার জন্য ছেড়ে দিলেন। এভাবে তাদের এক পুরুষ শেষ হয়ে গেলো। নতুন বংশধররা মরুভূমির কোলে লালীত হয়ে বড় হলো। এবার আল্লাহ কেনানীদের ওপর তাদের বিজয় দান করলেন। মনে হচ্ছে, এই ব্যাপারটিকেই এখানে 'মরে যাওয়া ও পুনর্বার জীবন দান করা' বলা হয়েছে।

২৬৭. 'করযে হাসানা' এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে "ভালো ঋণ"। এর অর্থ হচ্ছে ঃ এমন ঋণ, যা কেবলমাত্র সৎকর্ম অনুষ্ঠানের প্রেরণায় চালিত হয়ে নিস্বার্থভাবে কাউকে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করলে আল্লাহ তাকে নিজের জন্য ঋণ বলে গণ্য করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কেবল আসলটি নয় বরং তার ওপর কয়েকগুণ বেশী দেয়ার ওয়াদা করেন। তবে এ জন্য শর্ত আরোপ করে বলেন যে, সেটি 'করযে হাসানা' অর্থাৎ এমন ঋণ হতে হবে যা দেয়ার পেছনে কোন হীন স্বার্থ বুদ্ধি থাকবে না বরং নিছক

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

আবার তোমরা কি এ ব্যাপারেও চিন্তা করেছো, যা মূসার পরে বনী ইসরাঈলের সরদারদের সাথে ঘটেছিল? তারা নিজেদের নবীকে বলেছিল : আমাদের জন্য একজন বাদশাহ ঠিক করে দাও, যাতে আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি।[২৬৮] নবী জিজ্ঞেস করলো : তোমাদের লড়াই করার হুকুম দেয়ার পর তোমরা লড়তে যাবে না, এমনটি হবে না তো? তারা বলতে লাগলো : এটা কেমন করে হতে পারে, আমরা আল্লাহর পথে লড়বো না, অথচ আমাদের বাড়ি-ঘর থেকে আমাদের বের করে দেয়া হয়েছে, আমাদের সন্তানদের আমাদের থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে? কিন্তু যখন তাদের লড়াই করার হুকুম দেয়া হলো, তাদের স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া বাদবাকি সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলো। আল্লাহ তাদের প্রত্যেকটি জালেমকে জানেন।

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ ঋণ দিতে হবে এবং তা এমন কাজে ব্যয় করতে হবে যা আল্লাহ পছন্দ করেন।

২৬৮. এটি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগের ঘটনা। সে সময় আমালিকারা বনী ইসরাঈলদের ওপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছিল। ইসরাঈলীদের কাছ থেকে তারা ফিলিস্তিনের অধিকাংশ এলাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল সামুয়েল নবী তখন ছিলেন বনী ইসরাঈলদের শাসক। কিন্তু তিনি বার্ধক্যে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই ইসরাঈলী সরদাররা অন্য কোন ব্যক্তিকে নিজেদের নেতা বানিয়ে তার অধীনে যুদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভব করছিল। কিন্তু তখন বনী ইসরাঈলদের মধ্যে অজ্ঞতা এত বেশী বিস্তার লাভ করেছিল এবং তারা অমুসলিম জাতিদের নিয়ম, আচার-আচরণে এত বেশী

প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল যে, খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যকার পার্থক্যবোধ তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা একজন খলীফা নির্বাচনের নয় বরং বাদশাহ নিযুক্তির আবেদন করেছিল। এ প্রসংগে বাইবেলের প্রথম সামুয়েল গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে ঃ

"সামুয়েল সারা জীবন ইসরাঈলীদের মধ্যে সুবিচার করতে থাকেন।............তখন সব ইসরাঈলী নেতা একত্র হয়ে রামা'তে সামুয়েলের কাছে আসে। তারা তাঁকে বলতে থাকে ঃ দেখো, তুমি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছো এবং তোমার ছেলে তোমার পথে চলছে না। এখন তুমি কাউকে আমাদের বাদশাহ নিযুক্ত করে দাও, যে অন্য জাতিদের মতো আমাদের প্রতি সুবিচার করবে।.........একথা সামুয়েলের খারাপ লাগে। তিনি সদাপ্রভূর কাছে দোয়া করেন। সদাপ্রভূ সামুয়েলকে বলেন ঃ এই লোকেরা তোমাকে যা কিছু বলছে, তুমি তা মেনে নাও কেননা তারা তোমার নয়, আমার অবমাননা করেছে এই বলে যে, আমি তাদের বাদশাহ থাকবো না।...........সামুয়েল তাদেরকে—যারা তার কাছে বাদশাহ নিযুক্তির দাবী নিয়ে এসেছিল—সদাপ্রভূর সমস্ত কথা শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ যে বাদশাহ তোমাদের ওপর রাজত্ব করবে তার নীতি এই হবে যে, সে তোমাদের পুত্রদের নিয়ে যাবে, তার রথ ও বাহিনীতে চাকর নিযুক্ত করবে এবং তারা তার রথের আগে আগে দৌড়াতে থাকবে। সে তাদেরকে সহস্রজনের ওপর সরদার ও পঞ্চাশজনের ওপর জমাদার নিযুক্ত করবে এবং কাউকে কাউকে হালের সাথে জুতে দেবে, কাউকে দিয়ে ফসল কাটাবে এবং নিজের জন্য যুদ্ধাস্ত্র ও রথের সরঞ্জাম তৈরি করাবে। আর তোমাদের কন্যাদেরকে পাচিকা বানাবে। তোমাদের ভালো ভালো শস্যক্ষেত, আংগুর ক্ষেত ও জিতবৃক্ষের বাগান নিয়ে নিজের সেবকদের দান করবে এবং তোমাদের শস্যক্ষেত ও আংগুর ক্ষেতের এক দশমাংশ নিয়ে নিজের সেনাদল ও সেবকদের দান করে দেবে। তোমাদের চাকর-বাকর, ক্রীতদাসী, সুশ্রী যুবকবৃন্দ ও গাধাগুলোকে নিজের কাজে লাগাবে এবং তোমাদের ছাগল-ভেড়াগুলোরও এক দশমাংশ নেবে। সুতরাং তোমরা তার দাসে পরিণত হবে। সেদিন তোমাদের এই বাদশাহ, যাকে তোমরা নিজেদের জন্য নির্বাচিত করবে তার কারণে তোমরা ফরিয়াদ করবে কিন্তু সেদিন সদাপ্রভূ তোমাদের কোন জবাব দেবেন না। তবুও লোকেরা সামুয়েলের কথা শোনেনি। তারা বলতে থাকে, না, আমরা বাদশাহ চাই, যে আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে। তাহলে আমরাও অন্য জাতিদের মতো হবো। আমাদের বাদশাহ আমাদের মধ্যে সুবিচার করবে, আমাদের আগে আগে চলবে এবং আমাদের জন্য যুদ্ধ করবে।..........সদাপ্রভূ সামুয়েলকে বললেন ঃ তুমি ওদের কথা মেনে নাও এবং ওদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দাও।" (৭ অধ্যায়, ১৫ শ্লোক থেকে ৮ অধ্যায় ২২ শ্লোক পর্যন্ত)।

"আবার সামুয়েল লোকদের বলতে থাকেন.............যখন তোমরা দেখলে আম্মুন সন্তানদের বাদশাহ নাহাশ তোমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে তখন তোমরা আমাকে বললে, আমাদের ওপর কোন বাদশাহ রাজত্ব করুক অথচ তোমাদের সদাপ্রভূ খোদা ছিলেন তোমাদের বাদশাহ। সুতরাং এখন সেই বাদশাহকে দেখো, যাকে তোমরা নির্বাচিত করেছো এবং যার জন্য তোমরা আবেদন করেছিলে। দেখো, সদাপ্রভূ তোমাদের ওপর বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। যদি তোমরা সদাপ্রভূকে ভয় করো, তাঁর উপাসনা করো, তাঁর

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

তাদের নবী তাদেরকে বললো ঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে[২৬৯] বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন। একথা শুনে তারা বললো ঃ "সে কেমন করে আমাদের ওপর বাদশাহ হবার অধিকার লাভ করলো? তার তুলনায় বাদশাহী লাভের অধিকার আমাদের অনেক বেশী। সে তো কোন বড় সম্পদশালী লোকও নয়।" নবী জবাব দিল ঃ "আল্লাহ তোমাদের মোকাবিলায় তাকেই নবী মনোনীত করেছেন। এবং তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক উভয় ধরনের যোগ্যতা ব্যাপকহারে দান করেছেন। আর আল্লাহ তাঁর রাজ্য যাকে ইচ্ছা দান করার ইখতিয়ার রাখেন। আল্লাহ অত্যন্ত ব্যাপকতার অধিকারী এবং সবকিছুই তাঁর জ্ঞান–সীমার মধ্যে রয়েছে।"

আদেশ মেনে চলো এবং সদাপ্রভূর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ না করো আর যদি তোমরা ও তোমাদের বাদশাহ, যে তোমাদের ওপর রাজত্ব করে, সবাই সদাপ্রভূ খোদার অনুগত হয়ে থাকো তাহলে তো ভালো। তবে যদি তোমরা সদাপ্রভূর কথা না মানো বরং সদাপ্রভূর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করো, তাহলে সদাপ্রভূর হাত তোমাদের বিরুদ্ধে উঠবে, যেমন তা উঠতো তোমাদের বাপ–দাদাদের বিরুদ্ধে।.....আর তোমরা জানতে পারবে এবং দেখতেও পারবে যে, তোমরা সদাপ্রভূর সমীপে নিজেদের জন্য বাদশাহ নিযুক্তির আবেদন জানিয়ে কত বড় অনিষ্ট করেছো।....এখন রইলো আমার ব্যাপার, আর খোদা না করুন, তোমাদের জন্য দোয়া না করে আমি সদাপ্রভূর কাছে পাপী না হয়ে যাই। বরং আমি সেই পথটি, যা ভালো ও সোজা, তোমাদের জানিয়ে দেবো।" (১২ অধ্যায়, ১২ থেকে ২৩ শ্লোক পর্যন্ত)।

বাইবেলে সামুয়েল গ্রন্থের এই বিস্তারিত বিবরণ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বাদশাহী তথা ব্যক্তি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার এই দাবী আল্লাহ ও তাঁর নবী পছন্দ করেননি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কুরআন মজীদে এ প্রসংগে বনী ইসরাঈলের সরদারদের এই দাবীর নিন্দা করা হয়নি কেন? এর জবাবে বলা যায়, এখানে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন তার সাথে এই দাবীটির ঠিক বেঠিক হবার বিষয়টির কোন সম্পর্ক নেই। এখানে আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা যে, বনী ইসরাঈলরা কতদূর কাপুরুষ হয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে স্বার্থান্ধতা কতখানি বিস্তার

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

এই সংগে তাদের নবী তাদের একথাও জানিয়ে দিল ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বাদশাহ নিযুক্ত করার আলামত হচ্ছে এই যে, তার আমলে সেই সিন্ধুকটি তোমরা ফিরিয়ে পাবে, যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মানসিক প্রশান্তির সামগ্রী, যার মধ্যে রয়েছে মূসার পরিবারের ও হারুনের পরিবারের পরিত্যক্ত বরকতপূর্ণ জিনিসপত্র এবং যাকে এখন ফেরেশতারা বহন করে ফিরছে।[২৭০] যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো তাহলে এটি তোমাদের জন্য অনেক বড়নিশানী।

লাভ করেছিল এবং নৈতিক সংযমের কেমন অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল যার ফলে অবশেষে তাদের পতন সূচিত হলো। মুসলমানরা যাতে এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং নিজেদের মধ্যে এই দুর্বলতাগুলোর প্রশ্রয় না দেয় সে জন্যই এর উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬৯. বাইবেলে তাকে 'শৌল' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন বনী ইয়ামীন গোত্রের একজন ত্রিশ বছরের যুবক। বনী ইসরাঈলদের মধ্যে তার চেয়ে সুন্দর ও সুশ্রী পুরুষ দ্বিতীয়জন ছিল না। তিনি এমনি সুঠাম ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী ছিলেন যে, লোকদের মাথা বড়জোর তার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছিতো। নিজের বাপের হারানো গাধা খুঁজতে বের হয়েছিলেন। পথে সামুয়েল নবীর অবস্থান স্থলের কাছে পৌঁছলে আল্লাহ তাঁর নবীকে ইংগিত করে জানালেন, এই ব্যক্তিকে আমি বনী ইসরাঈলদের বাদশাহ হিসেবে মনোনীত করেছি। কাজেই সামুয়েল নবী তাকে নিজের গৃহে ডেকে আনলেন। তেলের কুপি নিয়ে তার মাথায় ঢেলে দিলেন এবং তাকে চুমো খেয়ে বললেন ঃ "খোদা তোমাকে 'মসহ' করেছেন, যাতে তুমি তার উত্তরাধিকারের অগ্রনায়ক হতে পারো।" অতপর তিনি বনী ইসরাঈলদের সাধারণ সভা ডেকে তার বাদশাহ হবার কথা ঘোষণা করে দিলেন।" (১–সামুয়েল ৯ ও ১০ অধ্যায়)।

বনী ইসরাঈলদের মধ্যে আল্লাহর নির্দেশক্রমে 'মসহ' করে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি। এর আগে হযরত হারুনকে পুরোহিত শ্রেষ্ঠ (Chief priest) হিসেবে 'মসহ' করা হয়েছিল। এরপর মসহকৃত তৃতীয় ব্যক্তি হলেন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং চতুর্থ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম। কিন্তু তালুতকে নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছিল বলে কুরআনে বা হাদীসে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। নিছক বাদশাহী করার জন্য মনোনীত করা একথা মেনে নেয়ার জন্য যথেষ্ট নয় যে, তিনি নবীও ছিলেন।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

৩৩ রুকূ'

তারপর তালূত যখন সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললো, সে বললো ঃ "আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নদীতে তোমাদের পরীক্ষা হবে। যে তার পানি পান করবে সে আমার সহযোগী নয়। একমাত্র সে-ই আমার সহযোগী যে তার পানি থেকে নিজের পিপাসা নিবৃত্ত করবে না। তবে এক আধ আঁজলা কেউ পান করতে চাইলে করতে পারে। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ছাড়া বাকি সবাই সেই নদীর পানি আকণ্ঠ পান করলো।[২৭১]

অতপর তালূত ও তার সাথী মুসলমানরা যখন নদী পেরিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো তখন তারা তালূতকে বলে দিল, আজ জালূত ও তার সেনাদলের মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই।[২৭২] *কিন্তু যারা একথা মনে করছিল যে, তাদের একদিন আল্লাহর সাথে মোলাকাত করতে হবে, তারা বললো ঃ "অনেক বারই দেখা গেছে, স্বল্প সংখ্যক লোকের একটি দল আল্লাহর হুকুমে একটি বিরাট দলের ওপর বিজয় লাভ করেছে। আল্লাহ সবরকারীদের সাথি।"*

২৭০. এ প্রসংগে বাইবেলের বর্ণনা কুরআন থেকে বেশ কিছুটা বিভিন্ন। তবুও এ থেকে আসল ঘটনার যথেষ্ট বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এ থেকে জানা যায়, এ সিন্দুকটির জন্য বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি বিশেষ পরিভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। সেটি হচ্ছে 'অংগীকার সিন্দুক।' এক যুদ্ধে ফিলিস্তিনী মুশরিকরা বনী ইসরাঈলদের থেকে এটি ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু মুশরিকদের যে শহর ও যে জনপদে এটি রাখা হতো সেখানেই

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥٢﴾

আর যখন তারা জালূত ও তার সেনাদলের মোকাবিলায় বের হলো, তারা দোয়া করলো ঃ "হে আমাদের রব! আমাদের সবর দান করো, আমাদের অবিচলিত রাখ এবং এই কাফের দলের ওপর আমাদের বিজয় দান করো।" অবশেষে আল্লাহর হুকুমে তারা কাফেরদের পরাজিত করলো। আর দাউদ[২৭৩] জালূতকে হত্যা করলো এবং আল্লাহ তাকে রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করলেন আর এই সাথে যা যা তিনি চাইলেন তাকে শিখিয়ে দিলেন। এভাবে আল্লাহ যদি মানুষদের একটি দলের সাহায্যে আর একটি দলকে দমন না করতে থাকতেন, তাহলে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হতো।[২৭৪] কিন্তু দুনিয়াবাসীদের ওপর আল্লাহর অপার করুণা (যে, তিনি এভাবে বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করতেন)।

এগুলো আল্লাহর আয়াত। আমি ঠিকমতো এগুলো তোমাকে শুনিয়ে যাচ্ছি। আর তুমি নিশ্চিতভাবে প্রেরিত পুরুষদের (রসূলদের) অন্তরভূক্ত।

মহামারীর প্রাদুর্ভাব হতে থাকতো ব্যাপকভাবে। অবশেষে তারা সিন্দুকটি একটি গরুর গাড়ির ওপর রেখে হাঁকিয়ে দিয়েছিল। সম্ভবত এ বিষয়টিকে কুরআন এভাবে বর্ণনা করেছে যে, সেটি তখন ফেরেশতাদের রক্ষণাধীনে ছিল। কারণ সেই গাড়িটিতে কোন চালক না বসিয়ে তাকে হাঁকিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর আল্লাহর হুকুমে তাকে হাঁকিয়ে বনী ইসরাঈলদের দিকে নিয়ে আসা ছিল ফেরেশতাদের কাজ। আর এই সিন্দুকের "মধ্যে রয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মানসিক প্রশান্তির সামগ্রী"—একথার অর্থ বাইবেলের বর্ণনা থেকে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, বনী ইসরাঈল এই সিন্দুকটিকে অত্যন্ত বরকতপূর্ণ এবং নিজেদের বিজয় ও সাফল্যের প্রতীক মনে করতো। এটি তাদের হাতছাড়া হবার পর সমগ্র জাতির মনোবল ভেঙে পড়ে। প্রত্যেক ইসরাঈলী মনে করতে থাকে, আমাদের ওপর থেকে আল্লাহর রহমত উঠে গেছে এবং আমাদের

দুর্ভাগ্যের দিন শুরু হয়ে গেছে। কাজেই সিন্দুকটি ফিরে আসায় সমগ্র জাতির মনোবল ব্যাপকহারে বেড়ে যায়। তাদের ভাঙা মনোবল আবার জোড়া লেগে যায়। এভাবে এটি তাদের মানসিক প্রশান্তির কারণে পরিণত হয়।

"মূসা ও হারুনের পরিবারের পরিত্যক্ত বরকতপূর্ণ জিনিসপত্র" এই সিন্দুকে রক্ষিত ছিল। এর অর্থ হচ্ছে, 'তূর–ই–সিনাই'–এ (সিনাই পাহাড়) মহান আল্লাহ হযরত মূসাকে পাথরের যে তখতিগুলো দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও হযরত মূসা নিজে লিখিয়ে তাওরাতের যে কপিটি বনী লাভীকে দিয়েছিলেন সেই মূল পাণ্ডুলিপিটিও এর মধ্যে ছিল। একটি বোতলে কিছুটা 'মান্না'ও এর মধ্যে রক্ষিত ছিল, যাতে পরবর্তী বংশধররা আল্লাহর সেই মহা অনুগ্রহের কথা স্মরণ করতে পারে, যা মহান আল্লাহ ঊষর মরুর বুকে তাদের বাপ–দাদাদের ওপর বর্ষণ করেছিলেন। আর 'সম্ভবত অসাধারণ মু'জিযা তথা মহা অলৌকিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হযরত মূসার সেই বিখ্যাত 'আসা'ও এর মধ্যে ছিল।

২৭১. সম্ভবত এটি জর্দান নদী অথবা অন্য কোন নদী, উপনদী বা শাখা নদী হতে পারে। তালূত বনী ইসরাঈলের সেনাবাহিনী নিয়ে এই নদীর তীরে অবস্থান করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি জানতেন, এই জাতির নৈতিক সংযমের মাত্রা অনেক কম, তাই তিনি কর্মঠ ও অকর্মণ্য লোকদের আলাদা করার জন্য এই প্রস্তাবটি পেশ করেন। বলা বাহুল্য যারা মাত্র সামান্য ক্ষণের জন্য নিজেদের পিপাসা সংযত করতে পারে না, তাদের থেকে কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, তারা দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে এমন একদল শত্রুর মোকাবিলা করবে, যাদের কাছে তারা ইতিপূর্বে হেরে গিয়েছিল?

২৭২. সম্ভবত এ বাক্যটি তারাই উচ্চারণ করেছিল, যারা নদীর তীরে ইতিপূর্বেই নিজেদের ধৈর্যহীনতার প্রকাশ ঘটিয়েছিল।

২৭৩. দাউদ আলাইহিস সালাম এ সময় ছিলেন একজন কম বয়েসী যুবক। ঘটনাক্রমে তালূতের সেনাবাহিনীতে তিনি এমন এক সময় পৌঁছেছিলেন যখন ফিলিস্তিনী সেনাদলের জবরদস্ত পাহলোয়ান জালূত (জুলিয়েট) বনী ইসরাঈলী সেনাদলকে প্রত্যক্ষ মুকাবিলায় আসার জন্য আহবান জানাচ্ছিল এবং ইসরাঈলীদের মধ্য থেকে একজনও তার সাথে মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল না। এ অবস্থা দেখে হযরত দাউদ (আ) নির্ভয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং জালূতকে হত্যা করলেন। এ ঘটনায় তিনি হয়ে উঠলেন ইসরাঈলীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তালূত নিজের মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে দিলেন। অবশেষে তিনিই হলেন ইসরাঈলীদের শাসক। (বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন ১ম সামুয়েল ১৭ ও ১৮ অধ্যায়)।

২৭৪. পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে এই যে, তিনি বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী ও দলকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত দুনিয়ায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের সুযোগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখনই কোন দল সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে তখনই তিনি অন্য একটি দলের সাহায্যে তার শক্তির দর্প চূর্ণ করে দেন। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যদি চিরন্তনভাবে একটি জাতি ও একটি দলের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে রাখা হতো এবং তার ক্ষমতার দাপট ও জুলুম–নির্যাতন হতো সীমাহীন ও অশেষ, তাহলে নিসন্দেহে আল্লাহর এই রাজ্যে মহা বিপর্যয় নেমে আসতো।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ
بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ
مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم
مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

এই রসূলদের (যারা আমার পক্ষ থেকে মানবতার হিদায়াতের জন্য নিযুক্ত) একজনকে আর একজনের ওপর আমি অধিক মর্যাদাশালী করেছি। তাদের কারোর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, কাউকে তিনি অন্য দিক দিয়ে উন্নত মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, অবশেষে ঈসা ইবনে মারয়ামকে উজ্জ্বল নিশানীসমূহ দান করেছেন এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করেছেন। যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে এই রসূলদের পর যারা উজ্জ্বল নিশানীসমূহ দেখেছিল তারা কখনো পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হতো না। কিন্তু (লোকদেরকে বলপূর্বক মতবিরোধ থেকে বিরত রাখা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না, তাই) তারা পরস্পর মতবিরোধ করলো, তারপর তাদের মধ্য থেকে কেউ ঈমান আনলো আর কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করলো। হাঁ, আল্লাহ চাইলে তারা কখখনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ যা চান, তাই করেন।[২৭৫]

২৭৫. অর্থাৎ রসূলদের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করার পর মানুষের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং মতবিরোধ থেকে আরো এগিয়ে গিয়ে ব্যাপক যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়েছে, এর কারণ এ ছিল না যে, নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ অক্ষম ছিলেন এবং এই মতবিরোধ ও যুদ্ধ থেকে মানুষকে বিরত রাখার শক্তি তাঁর ছিল না। তিনি চাইলে নবীদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সাধ্য কারো ছিল না। কেউ কুফরী ও বিদ্রোহের পথে চলতে পারতো না। আল্লাহর দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করার ক্ষমতা কারো থাকতো না। কিন্তু মানুষের কাছ থেকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ও সংকল্প ছিনিয়ে নিয়ে তাকে একটি বিশেষ কর্মনীতি অবলম্বন করতে বাধ্য করা তাঁর ইচ্ছাই ছিল না। তিনি পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মানুষকে এ পৃথিবীতে পয়দা করেছেন। তাই তাকে বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে নির্বাচন ও বাছাই করার স্বাধীনতা দান করেছেন। নবীদেরকে তিনি মানুষের ওপর দারোগা বানিয়ে পাঠাননি। কাজেই জোর জবরদস্তি করে তাদেরকে ঈমান ও আনুগত্যের পথে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা তাঁরা করেননি। বরং নবীদেরকে তিনি পাঠান যুক্তি–প্রমাণের সাহায্যে মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহবান জানাবার জন্য। কাজেই যতো মতবিরোধ ও যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে তার

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ
لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾ اَللّٰهُ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ
عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ
حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

৩৪ রুকূ’

হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের যা কিছু ধন-সম্পদ দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো,[২৭৬] সেই দিনটি আসার আগে, যেদিন কেনাবেচা চলবে না, বন্ধুত্ব কাজে লাগবে না এবং কারো কোন সুপারিশও কাজে আসবে না। আর জালেম আসলে সেই ব্যক্তি যে কুফরী নীতি অবলম্বন করে।[২৭৭]

আল্লাহ এমন এক চিরঞ্জীব ও চিরন্তন সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের দায়িত্বভার বহন করছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।[২৭৮] তিনি ঘুমান না এবং তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না।[২৭৯] পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সবই তাঁর।[২৮০] কে আছে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?[২৮১] যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের অগোচরে আছে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত। তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান সেটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না।[২৮২] তাঁর কর্তৃত্ব[২৮৩] আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করে না। মূলত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তা।[২৮৪]

পেছনে এই একটি মাত্র কাজ করেছে যে, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন আর তাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। এই মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহগুলোর কারণ এই ছিল না যে, আল্লাহ তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চালাতে চাইছিলেন কিন্তু নাউযুবিল্লাহ এ ব্যাপারে তিনি সফলকাম হতে পারেননি।

২৭৬. অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। বলা হচ্ছে, যারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে, যে উদ্দেশ্যে তারা এই পথে পাড়ি দিয়েছে সেই উদ্দেশ্য সম্পাদনের লক্ষে তাদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

২৭৭. এখানে কুফরী নীতি অবলম্বনকারী বলতে এমন সব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের তুলনায় নিজের ধন–সম্পদকে অধিক প্রিয় মনে করে অথবা যারা সেই দিনটির ওপর আস্থা রাখে না যে দিনটির আগমনের ভয় দেখানো হয়েছে। যারা এই ভিত্তিহীন ধারণা পোষণ করে যে, আখেরাতে তারা কোন না কোনভাবে নাজাত ও সাফল্য কিনে নিতে সক্ষম হবে এবং বন্ধুত্ব ও সুপরিবেশের সাহায্যে নিজেদের কার্যোদ্ধার করতে সক্ষম হবে, এখানে তাদেরকেও বুঝানো হতে পারে।

২৭৮. অর্থাৎ মূর্খতা নিজেদের কল্পনা ও ভাববাদিতার জগতে বসে যত অসংখ্য উপাস্য, ইলাহ ও মাবুদ তৈরি করুক না কেন আসলে কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও শাসন কর্তৃত্ব নিরংকুশভাবে একমাত্র সেই অবিনশ্বর সত্তার অংশীভূত, যাঁর জীবন কারো দান নয় বরং নিজস্ব জীবনী শক্তিতে যিনি স্বয়ং জীবিত এবং যাঁর শক্তির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে এই বিশ্ব–জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা। নিজের এই বিশাল সীমাহীন রাজ্যের যাবতীয় শাসন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক তিনি একাই। তাঁর গুণাবলীতে দ্বিতীয় কোন সত্তার অংশীদারীত্ব নেই। তাঁর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও অধিকারেও নেই দ্বিতীয় কোন শরীক। কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে বা তার সাথে শরীক করে পৃথিবীতে বা আকাশে কোথাও আর কাউকে মাবুদ ইলাহ ও প্রভু বানানো হলে তা একটি নিরেট মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই হয় না। এভাবে আসলে সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

২৭৯. মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সত্তাকে যারা নিজেদের দুর্বল অস্তিত্বের সদৃশ মনে করে এবং যাবতীয় মানবিক দুর্বলতাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে, এখানে তাদের চিন্তা ও ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। যেমন বাইবেলের বিবৃতি মতে, আল্লাহ ছয় দিনে পৃথিবী ও আকাশ তৈরি করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন।

২৮০. অর্থাৎ তিনি পৃথিবী ও আকাশের এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। তাঁর মালিকানা, কর্তৃত্ব ও শাসন পরিচালনায় কারো এক বিন্দু পরিমাণও অংশ নেই। তাঁর পরে এই বিশ্ব–জাহানের অন্য যে কোন সত্তার কথাই চিন্তা করা হবে সে অবশ্যই হবে এই বিশ্ব–জগতের একটি সৃষ্টি। আর বিশ্ব–জগতের সৃষ্টি অবশ্যি হবে আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তাঁর দাস। তাঁর অংশীদার ও সমকক্ষ হবার কোন প্রশ্নই এখানে ওঠে না।

২৮১. এখানে এক শ্রেণীর মুশরিকদের চিন্তার প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা বুযর্গ ব্যক্তিবর্গ, ফেরেশতা বা অন্যান্য সত্তা সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহর ওখানে তাদের বিরাট প্রতিপত্তি। তারা যে কথার ওপর অটল থাকে, তা তারা আদায় করেই ছাড়ে। আর আল্লাহর কাছ থেকে তারা যে কোন কার্যোদ্ধার করতে সক্ষম। এখানে তাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহর ওখানে প্রতিপত্তির তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, এমনকি

কোন শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর এবং কোন নিকটতম ফেরেশতাও এই পৃথিবী ও আকাশের মালিকের দরবারে বিনা অনুমতিতে একটি শব্দও উচ্চারণ করার সাহস রাখে না।

২৮২. এই সত্যটি প্রকাশের পর শিরকের ভিত্তির ওপর আর একটি আঘাত পড়লো। ওপরের বাক্যগুলোয় আল্লাহর অসীম কর্তৃত্ব ও তার সাথে সম্পর্কিত ক্ষমতাবলী সম্পর্কে একটা ধারণা পেশ করে বলা হয়েছিল, তাঁর কর্তৃত্বে স্বতন্ত্রভাবে কেউ শরীক নেই এবং কেউ নিজের সুপারিশের জোরে তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতাও রাখে না। অতপর এখানে অন্যভাবে বলা হচ্ছে, অন্য কেউ তাঁর কাজে কিভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে যখন তার কাছে এই বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা এবং এর অন্তর্নিহিত কার্যকারণ ও ফলাফল বুঝার মতো কোন জ্ঞানই নেই? মানুষ, জিন, ফেরেশতা বা অন্য কোন সৃষ্টিই হোক না কেন সবার জ্ঞান অপূর্ণ ও সীমিত। বিশ্ব-জাহানের সমগ্র সত্য ও রহস্য কারো দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই. তারপর কোন একটি ক্ষুদ্রতর অংশেও যদি কোন মানুষের স্বাধীন হস্তক্ষেপ অথবা অনড় সুপারিশ কার্যকর হয় তাহলে তো বিশ্ব-জগতের সমগ্র ব্যবস্থাপনাই ওলট-পালট হয়ে যবে। বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপনা তো দূরের কথা মানুষ নিজের ব্যক্তিগত ভালোমন্দ বুঝারও ক্ষমতা রাখে না। বিশ্ব-জাহানের প্রভু ও পরিচালক মহান আল্লাহই এই ভালোমন্দের পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে জ্ঞানের মূল উৎস মহান আল্লাহর হিদায়াত ও পথনির্দেশনার ওপর আস্থা স্থাপন করা ছাড়া মানুষের জন্য দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই।

২৮৩. কুরআনে উল্লেখিত মূল শব্দ হচ্ছে 'কুরসী'। সাধারণত এ শব্দটি কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও রাষ্ট্রশক্তি অর্থে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (বাংলা ভাষায় এরি সমজাতীয় শব্দ হচ্ছে 'গদি'। গদির লড়াই বললে ক্ষমতা কর্তৃত্বের লড়াই বুঝায়)।

২৮৪. এই আয়াতটি আয়াতুল কুরসী নামে খ্যাত। এখানে মহান আল্লাহর এমন পূর্ণাংগ পরিচিতি পেশ করা হয়েছে, যার নজীর আর কোথাও নেই। তাই হাদীসে একে কুরআনের শ্রেষ্ঠ আয়াত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এখানে কোন্ প্রসংগে বিশ্ব-জাহানের মালিক মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী আলোচনা করা হয়েছে? এ বিষয়টি বুঝতে হলে ৩২ রুকূ' থেকে যে আলোচনাটি চলছে তার ওপর আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে হবে। প্রথমে মুসলমানদের ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ধন-প্রাণ উৎসর্গ করে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বনী ইসরাঈলরা যেসব দুর্বলতার শিকার হয়েছিল তা থেকে দূরে থাকার জন্য তাদের জোর তাগিদ দেয়া হয়। তারপর তাদেরকে এ সত্যটি বুঝানো হয় যে, বিজয় ও সাফল্য সংখ্যা ও যুদ্ধাস্ত্রের আধিক্যের ওপর নির্ভর করে না বরং ঈমান, সবর, সংযম, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও সংকল্পের দৃঢ়তার ওপর নির্ভর করে। অতপর যুদ্ধের সাথে আল্লাহর যে কর্মনীতি সম্পর্কিত রয়েছে সেদিকে ইংগিত করা হয়। অর্থাৎ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তিনি সবসময় মানুষদের একটি দলের সাহায্যে আর একটি দলকে দমন করে থাকেন। নয়তো যদি শুধুমাত্র একটি দল স্থায়ীভাবে বিজয় লাভ করে কর্তৃত্ব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতো তাহলে দুনিয়ায় অন্যদের জীবন ধারা কঠিন হয়ে পড়তো।

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۵۶﴾ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۵۷﴾

দীনের ব্যাপারে কোন জোর–জবরদস্তি নেই।[২৮৫] ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাঁটাই করে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে[২৮৬] অস্বীকার করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহ (যাকে সে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে) সবকিছু শোনেন ও জানেন। যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ও সহায়। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন।[২৮৭] আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাদের সাহায্যকারী ও সহায় হচ্ছে তাগুত।[২৮৮] সে তাদেরকে আলোক থেকে অন্ধকারের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। এরা আগুনের অধিবাসী। সেখানে থাকবে এরা চিরকালের জন্য।

আবার এ প্রসংগে অজ্ঞ লোকদের মনে আরো যে একটি প্রশ্ন প্রায়ই জাগে তারও জবাব দেয়া হয়েছে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে, আল্লাহ যদি তাঁর নবীদেরকে মতবিরোধ খতম করার ও ঝগড়া–বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য পাঠিয়ে থাকেন এবং তাদের আগমনের পরও মতবিরোধ ও ঝগড়া–বিবাদ খতম না হয়ে থাকে তাহলে কি আল্লাহ এতই দুর্বল যে, এই গলদগুলো দূর করতে চাইলেও তিনি দূর করতে পারেননি? এর জবাবে বলা হয়েছে, বলপূর্বক মতবিরোধ বন্ধ করা এবং মানব জাতিকে জোর করে একটি বিশেষ পথে পরিচালনা করা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না। যদি এটা আল্লাহর ইচ্ছা হতো তাহলে তার বিরুদ্ধাচরণ করার কোন ক্ষমতাই মানুষের থাকতো না। আবার যে মূল বিষয়বস্তুর মাধ্যমে আলোচনার সূচনা করা হয়েছিল একটি বাক্যের মধ্যে সেদিকেও ইংগিত করা হয়েছে। এর পর এখন বলা হচ্ছে, মানুষের আকীদা–বিশ্বাস, আদর্শ–মতবাদ ও ধর্ম যতই বিভিন্ন হোক না কেন আসল ও প্রকৃত সত্য যার ওপর আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত, এই আয়াতেই বিবৃত হয়েছে। মানুষ এ সম্পর্কে ভুল ধারণা করলেই বা কি, এ জন্য মূল

সত্যের তো কোন চেহারা বদল হবে না। কিন্তু লোকদেরকে এটা মানতে বাধ্য করানো আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়।..... যে ব্যক্তি এটা মেনে নেবে সে নিজেই লাভবান হবে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৮৫. এখানে দীন বলতে ওপরের আয়াতে বর্ণিত আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ সম্পর্কিত আকীদা ও সেই আকীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'ইসলাম' এর এই আকীদাগত এবং নৈতিক ও কর্মগত ব্যবস্থা কারো ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না। যেমন কাউকে ধরে তার মাথায় জোর করে একটা বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়, এটা তেমন নয়।

২৮৬. আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে 'তাগুত' বলা হবে, যে নিজের বৈধ অধিকারের সীমানা লংঘন করেছে। কুরআনের পরিভাষায় তাগুত এমন এক বান্দাকে বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভু ও খোদা হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে। আল্লাহর মোকাবিলায় বান্দার প্রভুত্বের দাবীদার সাজার এবং বিদ্রোহ করার তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায় বান্দা নীতিগতভাবে তাঁর শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয় কিন্তু কার্যত তার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। একে বলা হয় ফাসেকী। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে আল্লাহর শাসন কর্তৃত্বকে নীতিগতভাবে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতে থাকে। একে বলা হয় কুফরী। তৃতীয় পর্যায়ে সে মালিক ও প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার রাজ্যে এবং তার প্রজাদের মধ্যে নিজের হুকুম চালাতে থাকে। এই শেষ পর্যায়ে যে বান্দা পৌঁছে যায় তাকেই বলা হয় "তাগুত"। কোন ব্যক্তি এই তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কোন দিন সঠিক অর্থে আল্লাহর মু'মিন বান্দা হতে পারে না।

২৮৭. অন্ধকার মানে মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার। যে অন্ধকারে পথ হারিয়ে মানুষ নিজের কল্যাণ ও সাফল্যের পথ থেকে দূরে সরে যায় এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের সমস্ত শক্তি ও প্রচেষ্টাকে ভুল পথে পরিচালিত করে, সেই অন্ধকারের কথা এখানে বলা হয়েছে।

২৮৮. "তাগুত" শব্দটি এখানে বহুবচন (তাওয়াগীত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ একটি তাগুতের শৃংখলে আবদ্ধ হয় না বরং বহু তাগুত তার ওপর জেঁকে বসে। শয়তান একটি তাগুত। শয়তান তার সামনে প্রতিদিন নতুন নতুন আকাশ কুসুম রচনা করে তাকে মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে রাখে। দ্বিতীয় তাগুত হচ্ছে মানুষের নিজের নফস। এই নফস তাকে আবেগ ও লালসার দাস বানিয়ে জীবনের আঁকাবাঁকা পথে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। এ ছাড়া বাইরের জগতে অসংখ্য তাগুত ছড়িয়ে রয়েছে। স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার, বংশ, গোত্র, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজন, সমাজ, জাতি, নেতা, রাষ্ট্র, দেশ, শাসক ইত্যাকার সবকিছুই মানুষের জন্য মূর্তিমান তাগুত। এদের প্রত্যেকেই তাকে নিজের স্বার্থের দাস হিসেবে ব্যবহার করে। মানুষ তার এই অসংখ্য প্রভুর দাসত্ব করতে করতে এবং এদের মধ্য থেকে কাকে সন্তুষ্ট করবে আর কার অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবে এই ফিকিরের চক্করে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

৩৫ রুকূ'

তুমি[২৮৯] সেই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করোনি, যে ইবরাহীমের সাথে তর্ক করেছিল?[২৯০] তর্ক করেছিল এই কথা নিয়ে যে, ইবরাহীমের রব কে? এবং তর্ক এ জন্য করেছিল যে, আল্লাহ তাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছিলেন।[২৯১] যখন ইবরাহীম বললো ঃ যার হাতে জীবন ও মৃত্যু তিনিই আমার রব। জবাবে সে বললো ঃ জীবন ও মৃত্যু আমার হাতে। ইবরাহীম বললো ঃ তাই যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে, আল্লাহ পূর্ব দিক থেকে সূর্য উঠান, দেখি তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাও। একথা শুনে সেই সত্য অস্বীকারকারী হতবুদ্ধি হয়ে গেলো[২৯২] কিন্তু আল্লাহ জালেমদের সঠিক পথ দেখান না।

২৮৯. ওপরে দাবী করা হয়েছিল, মু'মিনের সহায় ও সাহায্যকারী হচ্ছেন আল্লাহ তিনি মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে যান আর কাফেরের সাহায্যকারী হচ্ছে তাগুত, সে তাকে আলোকের বুক থেকে টেনে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যায়। এখানে এ বিষয়টির ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্তটি এমন এক ব্যক্তির যার সামনে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ সহকারে সত্যকে পেশ করা হয় এবং সে তার সামনে নিরুত্তর হয়ে পড়ে। কিন্তু যেহেতু সে আগে থেকেই নিজের লাগাম তাগুতের হাতে সঁপে দিয়েছিল তাই সত্যের উলংগ প্রকাশের পরও সে আলোর রাজ্যে পা দিতে পারেনি। অন্ধকারের অথৈ সমুদ্রে আগের মতোই সে হাবুডুবু খেতে থাকে। পরবর্তী দৃষ্টান্ত দু'টি এমন দুই ব্যক্তির যারা আল্লাহর সাহায্যের দিকে হাত বাড়ান। ফলে আল্লাহ তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে এমনভাবে টেনে আনেন যে, অদৃশ্য গোপন সত্যের সাথে তাদের চাক্ষুষ সাক্ষাত ঘটেও যায়।

২৯০. সেই ব্যক্তিটি হচ্ছে নমরুদ। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্বদেশভূমি ইরাকের বাদশাহ ছিল এই নমরুদ। এখানে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে বাইবেলে তার প্রতি কোন ইংগিত নেই। তবে তালমূদে এই সমগ্র ঘটনাটিই বিবৃত হয়েছে। কুরআনের

সাথে তার ব্যাপক মিলও রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ হযরত ইবরাহীমের (আ) পিতা নমরুদের দরবারে প্রধান রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর (Chief officer of the state) পদে অধিষ্ঠিত ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন প্রকাশ্যে শিরকের বিরোধিতা ও তাওহীদের প্রচার শুরু করেন এবং দেব–মন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমাগুলো ভেঙে দেন তখন তাঁর পিতা নিজেই বাদশাহর দরবারে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা পেশ করে তারপর বাদশাহর সাথে তাঁর যে বিতর্কালাপ হয় তাই এখানে উল্লেখিত হয়েছে।

২৯১. অর্থাৎ যে বিষয়টি নিয়ে এ বিতর্ক চলছিল সেটি ছিল এই যে ইবরাহীম (আ) কাকে নিজের রব বলে মানেন? আর এ বিতর্কটি সৃষ্টি হবার কারণ ছিল এই যে, বিতর্ককারী ব্যক্তি অর্থাৎ নমরুদকে আল্লাহ রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছিলেন। এই দু'টি বাক্যের মধ্যে বিতর্কের ধরনের প্রতি যে ইংগিত করা হয়েছে তা বুঝবার জন্য নিম্নলিখিত বাস্তব বিষয়গুলো সামনে রাখা প্রয়োজন।

এক ঃ প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মুশরিক সমাজগুলোর এই সম্মিলিত বৈশিষ্ট দেখা গেছে যে, তারা আল্লাহকে সকল খোদার প্রধান খোদা, প্রধান উপাস্য ও পরমেশ্বর হিসেবে মেনে নেয় কিন্তু একমাত্র তাঁকেই আরাধ্য, উপাস্য, মাবুদ ও খোদা হিসেবে মানতে প্রস্তুত হয় না।

দুই ঃ আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে মুশরিকরা চিরকাল দু'ভাগে বিভক্ত করে এসেছে। একটি হচ্ছে, অতি প্রাকৃতিক (Supernatural) খোদায়ী ক্ষমতা। কার্যকারণ পরম্পরার ওপর এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং মুশরিকরা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার ও সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এর দোহাই দেয়। এই খোদায়ীর ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সাথে অতীতের পুন্যবান লোকদের আত্মা, ফেরেশতা (দেবতা), জিন, নক্ষত্র এবং আরো অসংখ্য সত্তাকে শরীক করে। তাদের কাছে প্রার্থনা করে। পূজা ও উপাসনার অনুষ্ঠানাদি তাদের সামনে সম্পাদন করে। তাদের আস্তানায় ভেট ও নজরানা দেয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের খোদায়ী (অর্থাৎ শাসন কর্তৃত্ব) ক্ষমতা। জীবন বিধান নির্ধারণ করার ও নির্দেশের আনুগত্য লাভ করার অধিকার তার আয়ত্বাধীন থাকে। পার্থিব বিষয়াবলীর ওপর শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্ণ ক্ষমতা তার থাকে। দুনিয়ার সকল মুশরিক সম্প্রদায় প্রায় প্রতি যুগে এই দ্বিতীয় প্রকারের খোদায়ী কর্তৃত্বকে আল্লাহর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অথবা তার সাথে রাজপরিবার, ধর্মীয় পুরোহিত ও সমাজের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের মনীষীদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। বেশীর ভাগ রাজপরিবার এই দ্বিতীয় অর্থে খোদায়ীর দাবীদার হয়েছে। তাদের এই দাবীকে শক্তিশালী করার জন্য আবার তারা সাধারণভাবে প্রথম অর্থের খোদাদের সন্তান হবার দাবী করেছে। এ ব্যাপারে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো তাদের ষড়যন্ত্রে অংশীদার হয়েছে।

তিন ঃ নমরুদের খোদায়ী দাবীও এই দ্বিতীয় ধরনের ছিল। সে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না। নিজেকে পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা ও পরিচালক বলে সে দাবী করতো না। সে একথা বলতো না যে, বিশ্ব–জগতের সমস্ত কার্যকারণ পরম্পরার ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বরং তার দাবী ছিল, আমি এই ইরাক দেশ এবং এর অধিবাসীদের একচ্ছত্র অধিপতি। আমার মুখের কথাই এ দেশের আইন। আমার ওপর আর কারো কর্তৃত্ব নেই। কারো সামনে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। ইরাকের যে কোন

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই ব্যক্তিকে দেখো যে এমন একটি লোকালয় অতিক্রম করেছিল, যার গৃহের ছাদগুলো উপুড় হয়ে পড়েছিল।[২৯৩] সে বললো : এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জনবসতি, একে আল্লাহ আবার কিভাবে জীবিত করবেন?[২৯৪] একথায় আল্লাহ তার প্রাণ হরণ করলেন এবং সে একশো বছর পর্যন্ত মৃত পড়ে রইলো। তারপর আল্লাহ পুনর্বার তাকে জীবন দান করলেন, এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন : বলো, তুমি কত বছর পড়েছিলে? জবাব দিল : এই, এক দিন বা কয়েক ঘন্টা পড়েছিলাম। আল্লাহ বললেন : "বরং একশোটি বছর এই অবস্থায় তোমার ওপর দিয়ে চলে গেছে। এবার নিজের খাবার ও পানীয়ের ওপর একবার নজর বুলাও, দেখো তার মধ্যে কোন সামান্য পরিবর্তনও আসেনি। অন্যদিকে তোমার গাধাটিকে দেখো (তাঁর পাঁজরগুলোও পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে)। আর এটা আমি এ জন্য করেছি যে, মানুষের জন্য তোমাকে আমি একটি নিদর্শন হিসেবে দাঁড় করাতে চাই।[২৯৫] তারপর দেখো, এই অস্থিপাঁজরটি, কিভাবে একে উঠিয়ে এর গায়ে গোশত ও চামড়া লাগিয়ে দিই।" এভাবে সত্য যখন তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো তখন সে বলে উঠলো : "আমি জানি, আল্লাহ সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।"

ব্যক্তি এসব দিক দিয়ে আমাকে রব বলে মেনে নেবে না অথবা আমাকে বাদ দিয়ে আর কাউকে রব বলে মেনে নেবে, সে বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক।

চার : ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন বললেন, আমি একমাত্র রব্বুল আলামীনকে খোদা, মাবুদ ও রব বলে মানি, তাঁর ছাড়া আর সবার খোদায়ী, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করি, তখন কেবল এতটুকু প্রশ্ন সেখানে দেখা দেয়নি যে, জাতীয় ধর্ম ও ধর্মীয় মাবুদদের ব্যাপারে তাঁর এই নতুন আকীদা ও বিশ্বাস কতটুকু সহনীয়, বরং এই প্রশ্নও দেখা দিয়েছে যে, জাতীয় রাষ্ট্র ও তার কেন্দ্রীয় ক্ষমতা–কর্তৃত্বের ওপর এই বিশ্বাস যে আঘাত

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۶۰﴾

আর সেই ঘটনাটিও সামনে রাখো, যখন ইবরাহীম বলেছিল ঃ "আমার প্রভু! আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতদের পুনর্জীবিত করো।" বললেন ঃ তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম জবাব দিল ঃ বিশ্বাস তো করি, তবে মানসিক নিশ্চিন্ততা লাভ করতে চাই।[২৯৬] বললেন ঃ ঠিক আছে, তুমি চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। তারপর তাদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের ওপর রাখো। এরপর তাদেরকে ডাকো। তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে। ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।[২৯৭]

হানছে তাকে উপেক্ষা করা যায় কেমন করে? এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) বিদ্রোহের অপরাধে নমরুদের সামনে আনীত হন।

২৯২. যদিও হযরত ইবরাহীমের (আ) প্রথম বাক্যে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ রব হতে পারে না তবুও নমরুদ হঠধর্মিতার পরিচয় দিয়ে নির্লজ্জের মতো তার জবাব দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যের পর তার জন্য আবার হঠধর্মী হবার আর কোন সুযোগই ছিল না। সে নিজেও জানতো, চন্দ্র–সূর্য সেই আল্লাহরই হুকুমের অধীন যাকে ইবরাহীম রব বলে মেনে নিয়েছে। এরপর তার কাছে আর কি জবাব থাকতে পারে? কিন্তু এভাবে তার সামনে যে দ্ব্যর্থহীন সত্য আত্মপ্রকাশ করেছিল তাকে মেনে নেয়ার মানেই ছিল নিজের স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রভুত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব পরিহার করা। আর এই কর্তৃত্ব পরিহার করতে তার নফসের তাগুত মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কাজেই তার পক্ষে নিরুত্তর ও হতবুদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। আত্মপূজার অন্ধকার ভেদ করে সত্য প্রিয়তার আলোকে প্রবেশ করা তার পক্ষে সম্ভবপর হলো না। যদি এই তাগুতের পরিবর্তে আল্লাহকে সে নিজের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মেনে নিতো, তাহলে হযরত ইবরাহীমের প্রচার ও নসিহত প্রদানের পর তার জন্য সঠিক পথের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যেতো।

তালমূদের বর্ননা মতে তারপর সেই বাদশাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীমকে বন্দী করা হয়। দশদিন তিনি কারাগারে অবস্থান করেন। অতপর বাদশাহর কাউন্সিল তাকে জীবন্ত

পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করার যে ঘটনা ঘটে তা সূরা আম্বিয়ার ৫ম রুকূ', আনকাবুতের ২য় ও ৩য় রুকূ' এবং আস সাফ্‌ফাতের ৪র্থ রুকূ'তে বর্ণিত হয়েছে।

২৯৩. এই ব্যক্তিটি কে ছিলেন, এবং লোকালয় কোনটি ছিল এ আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। এখানে আসল বক্তব্য কেবল এতটুকু যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে সাহায্যকারী ও অভিভাবক বানিয়েছিলেন আল্লাহ কিভাবে তাকে আলোর রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে নেই এবং এতে কোন লাভও নেই। তবে পরবর্তী বর্ণনা থেকে প্রকাশ হয় যে, এখানে যাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তিনি নিশ্চয়ই কোন নবীই হবেন।

২৯৪. এ প্রশ্নের অর্থ এ নয় যে, সংশ্লিষ্ট বুযর্গ মৃত্যুর পরের জীবন অস্বীকার করতেন অথবা এ ব্যাপারে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল। বরং আসলে তিনি সত্যকে চাক্ষুষ দেখতে চাচ্ছিলেন, যেমন নবীদের দেখানো হয়ে থাকে।

২৯৫. দুনিয়াবাসী যাকে মৃত বলে জেনেছিল, এমন এক ব্যক্তির জীবিত হয়ে ফিরে আসা তার নিজের সমকালীন জনসমাজে তাকে একটি জীবন্ত নিদর্শনে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

২৯৬. অর্থাৎ সেই নিশ্চিন্ততা, যা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে লাভ করা যায়।

২৯৭. এই ঘটনাটি ও পূর্বোক্ত ঘটনাটির অনেকে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের ব্যাপারে আল্লাহর যে নীতি রয়েছে, তা ভালোভাবে হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হলে এ ব্যাপারে কোন প্রকার গোঁজামিল দেয়ার প্রয়োজনই দেখা দিতে পারে না। সাধারণ ঈমানদারদের এ জীবনে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে সে জন্য নিছক ঈমান বিল গাইবই (না দেখে মেনে নেয়া) যথেষ্ট। কিন্তু নবীদের ওপর আল্লাহ যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন এবং যে নির্জলা সত্যগুলোর প্রতি দুনিয়াবাসীকে দাওয়াত দেয়ার জন্য তাঁরা আদিষ্ট হয়েছিলেন সেগুলোকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা তাঁদের জন্য অপরিহার্য ছিল। মানুষের সামনে সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদের একথা বলার প্রয়োজন ছিল যে, তোমরা তো নিছক আন্দাজ অনুমান করে বলছো কিন্তু আমরা নিজেদের চর্মচক্ষে দেখা বিষয় তোমাদের বলছি। তোমাদের কাছে আছে আন্দাজ, অনুমান, ধারণা, কল্পনা, কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাসের জ্ঞানভাণ্ডার। তোমরা অন্ধ আর আমরা চক্ষুষ্মান। তাই নবীদের সামনে ফেরেশতারা আসতেন প্রকাশ্যে। তাঁদেরকে পৃথিবী ও আকাশের ব্যবস্থাপনা দেখানো হয়েছে। জান্নাত ও জাহান্নাম তাদেরকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে। মৃত্যুর পরের জীবনের প্রদর্শনী করে তাঁদেরকে দেখানো হয়েছে। নবীগণ নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব লাভ করার অনেক আগেই ঈমান বিল গাইবের পর্যায় অতিক্রম করে থাকেন। নবী হবার পর তাঁদেরকে দান করা হয় ঈমান বিশ্ শাহাদাতের (চাক্ষুষ জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস) নিয়ামত। এ নিয়ামত একমাত্র নবীদের জন্য নির্দিষ্ট। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা হুদের ১৭, ১৮, ১৯ ও ৩৪ টীকা)।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ
لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ
يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾

৩৬ রুকূ'

যারা[২৯৮] নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে[২৯৯] তাদের ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ যেমন একটি শস্যবীজ বপন করা হয় এবং তা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, যার প্রত্যেকটি শীষে থাকে একশতটি করে শস্যকণা। এভাবে আল্লাহ যাকে চান, তার কাজে প্রাচুর্য দান করেন। তিনি মুক্তহস্ত ও সর্বজ্ঞ।[৩০০] যারা নিজেদের ধন–সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর নিজেদের অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ায় না আর কাউকে কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের কোন দুঃখ মর্মবেদনা ও ভয় নেই।[৩০১] একটি মিষ্টি কথা এবং কোন অপ্রীতিকর ব্যাপারে সামান্য উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শন এমনি দানের চেয়ে ভালো, যার পেছনে আসে দুঃখ ও মর্মজ্বালা। মূলত আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সহনশীলতাই তাঁর গুণ।[৩০২]

২৯৮. ইতিপূর্বে ৩২ রুকূ'তে যে বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা চলেছিল এখানে আবার সেই একই প্রসংগে ফিরে আসা হয়েছে। সেখানে সূচনাপর্বেই ঈমানদারদের প্রতি আহবান জানানো হয়েছিল, যে মহান উদ্দেশ্যের প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ, তার জন্য ধন–প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দলের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে নিজের দলগত বা জাতীয় স্বার্থের উর্ধে উঠে নিছক একটি উন্নত পর্যায়ের নৈতিক উদ্দেশ্য সম্পাদনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে না। বৈষয়িক ও ভোগবাদী লোকেরা, যারা কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য জীবন ধারণ করে, এক একটি পয়সার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং লাভ–লোকসানের খতিয়ানের প্রতি সবসময় শ্যেন দৃষ্টি রেখে চলে, তারা কখনো মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্য কিছু করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে

মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্য তারা কিছু অর্থ ব্যয় করে ঠিকই কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তারা নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বংশীয় বা জাতীয় বৈষয়িক লাভের হিসেব-নিকেশটা আগেই সেরে নেয়। এই মানসিকতা নিয়ে এমন একটি দীনের পথে মানুষ এক পাও অগ্রসর হতে পারবে না, যার দাবী হচ্ছে, পার্থিব লাভ-ক্ষতির পরোয়া না করে নিছক আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে নিজের সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করতে হবে। এই ধরনের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ভিন্নতর নৈতিক বৃত্তির প্রয়োজন। এ জন্য প্রসারিত দৃষ্টি, বিপুল মনোবল ও উদার মানসিকতা বিশেষ করে আল্লাহর নির্ভেজাল সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। আর এই সংগে সমাজ জীবনে এমন ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, যার ফলে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ভোগবাদী ও বস্তুবাদী নৈতিকতার পরিবর্তে উপরোল্লিখিত নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হবে। তাই এখান থেকে নিয়ে পরবর্তী তিন রুকূ' পর্যন্ত এই মানসিকতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বিধান দেয়া হয়েছে।

২৯৯. ধন-সম্পদ যদি নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ব্যয় করা হয় অথবা পরিবার-পরিজন ও সন্তান সন্ততির ভরণ-পোষণের বা আত্মীয়-স্বজনের দেখাশুনা করার জন্য অথবা অভাবীদের সাহায্যার্থে বা জনকল্যাণমূলক কাজে এবং জিহাদের উদ্দেশ্যে, যে কোনভাবেই ব্যয় করা হোক না কেন, তা যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে ব্যয় করা হয় তাহলে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করার মধ্যে গণ্য হবে।

৩০০. অর্থাৎ যে পরিমাণ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও গভীর আবেগ-উদ্দীপনা সহকারে মানুষ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতিদানও তত বেশী ধার্য হবে। যে আল্লাহ একটি শস্যকণায় এত বিপুল পরিমাণ বরকত দান করেন যে, তা থেকে সাতশোটি শস্যকণা উৎপন্ন হতে পারে, তাঁর পক্ষে মানুষের দান-খয়রাতের মধ্যে এমনভাবে বৃদ্ধি ও ক্রমবৃদ্ধি দান করা যার ফলে এক টাকা ব্যয় করলে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিদানে সাতশো গুণ হয়ে ফিরে আসবে, মোটেই কোন অভাবনীয় ও কঠিন ব্যাপার নয়। এই বাস্তব সত্যটি বর্ণনা করার পর আল্লাহর দু'টি গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। একটি গুণ হচ্ছে, তিনি মুক্তহস্ত। তাঁর হাত সংকীর্ণ নয়। মানুষের কাজ প্রকৃতপক্ষে যতটুকু উন্নতি, বৃদ্ধি ও প্রতিদান লাভের যোগ্য, তা তিনি দিতে অক্ষম, এমনটি হতে পারে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তিনি সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ তিনি কোন বিষয়ে বেখবর নন। যা কিছু মানুষ ব্যয় করে এবং যে মনোভাব, আবেগ ও প্রেরণাসহকারে ব্যয় করে, সে সম্পর্কে তিনি অনবহিত থাকবেন, ফলে মানুষ যথার্থ প্রতিদান লাভে বঞ্চিত হবে, এমনটিও হতে পারে না।

৩০১. অর্থাৎ যাদের প্রতিদান নষ্ট হবার কোন ভয় নেই এবং তারা নিজেদের এই অর্থ ব্যয়ের কারণে লজ্জিত হবে, এমন ধরনের কোন অবস্থারও সৃষ্টি হবে না।

৩০২. এই একটি বাক্যের মধ্যে দু'টি কথা বলা হয়েছে। এক, আল্লাহ তোমাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী নন। দুই, আল্লাহ নিজেই যেহেতু সহনশীল, তাই তিনি এমন লোকদের পছন্দ করেন যারা নীচ ও সংকীর্ণমনা নন বরং বিপুল সাহস ও হিম্মতের অধিকারী এবং সহিষ্ণু। যে আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন জীবনের অগণিত উপায়-উপকরণ এবং বহুবিধ ভুল-ত্রুটি করার পরও তোমাদের বারবার মাফ করে

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَٰتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা বলে বেড়িয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাতকে সেই ব্যক্তির মতো নষ্ট করে দিয়ো না যে নিছক লোক দেখাবার জন্য নিজের ধন–সম্পদ ব্যয় করে, অথচ সে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে না এবং পরকালেও বিশ্বাস করে না।[৩০৩] তার ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ একটি মসৃণ পাথরখণ্ডের ওপর মাটির আস্তর জমেছিল। প্রবল বর্ষণের ফলে সমস্ত মাটি ধুয়ে গেলো। এখন সেখানে রয়ে গেলো শুধু পরিষ্কার পাথর খণ্ডটি।[৩০৪] এই ধরনের লোকেরা দান–খয়রাত করে যে নেকী অর্জন করে বলে মনে করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর কাফেরদের সোজা পথ দেখানো আল্লাহর নিয়ম নয়।[৩০৫]

দিচ্ছেন, তিনি কেমন করে এমন লোকদের পছন্দ করতে পারেন, যারা কোন গরীবকে এক মুঠো ভাত খাওয়াবার পর বারবার নিজের অনুগ্রহের কথা সাড়ম্বরে তার সামনে প্রকাশ করে তার আত্মমর্যাদাকে ধূলায় লুটিয়ে দেয়? এ জন্যই হাদীসে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না এবং তার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, যে মানুষকে কিছু দান করে তাকে অনুগৃহীত করা হয়েছে বলে তার কাছে প্রকাশ করে এবং একথা উল্লেখ করে মনে খোঁচা দেয়।

৩০৩. আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি তার যে বিশ্বাস নেই, তার রিয়াকারিতাই এর প্রমাণ। নিছক লোক দেখাবার জন্য সে যেসব কাজ করে সেগুলো সুস্পষ্টভাবে একথাই প্রকাশ করে যে, সৃষ্টিকেই সে আল্লাহ মনে করে এবং তার কাছ থেকেই নিজের কাজের প্রতিদান চায়। আল্লাহর কাছ থেকে সে প্রতিদানের আশা করে না। একদিন সমস্ত কাজের হিসেব–নিকেশ করা হবে এবং প্রতিদান দেয়া হবে, একথাও সে বিশ্বাস করে না।

৩০৪. এই উপমায় প্রবল বর্ষণ বলতে দান খয়রাতকে এবং পাথরখণ্ড বলতে যে নিয়ত ও প্রেরণার গলদসহ দান–খয়রাত করা হয়েছে, তাকে বুঝানো হয়েছে। মাটির আস্তর বলতে নেকী ও সৎকর্মের বাইরের কাঠামোটি বুঝানো হয়েছে, যার নীচে লুকিয়ে আছে নিয়তের গলদ। এই বিশ্লেষণের পর দৃষ্টান্তটি সহজেই বোধগম্য হতে পারে। বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি স্বাভাবিকভাবেই সরস ও সতেজ হয় এবং তাতে চারা জন্মায়। কিন্তু যে

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

বিপরীত পক্ষে যারা পূর্ণ মানসিক একাগ্রতা ও অবিচলতা সহকারে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে তাদের ধন–সম্পদ ব্যয় করে, তাদের এই ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছেঃ কোন উচ্চ ভূমিতে একটি বাগান, প্রবল বৃষ্টিপাত হলে সেখানে দ্বিগুণ ফলন হয়। আর প্রবল বৃষ্টিপাত না হলে সামান্য হালকা বৃষ্টিপাতই তার জন্য যথেষ্ট।[৩০৬] *আর তোমরা যা কিছু করো সবই আল্লাহর দৃষ্টি সীমার মধ্যে রয়েছে।*

তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে, তার একটি সবুজ শ্যামল বাগান থাকবে, সেখানে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, খেজুর, আংগুর ও সব রকম ফলে পরিপূর্ণ থাকবে এবং বাগানটি ঠিক এমন এক সময় প্রবল উষ্ণ বায়ু প্রবাহে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে যখন সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে গেছে এবং তার সন্তানরাও তখনো যোগ্য হয়ে উঠেনি?[৩০৭] *এভাবেই আল্লাহ তাঁর কথা তোমাদের সামনে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা–ভাবনা করতে পারো।*

মাটিতে সরসতা সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ যদি হয় নামমাত্র এবং তা কেবল ওপরিভাগেই লেপটে থাকে আর তার তলায় থাকে মসৃণ পাথর, তাহলে বৃষ্টির পানি এ ক্ষেত্রে তার জন্য লাভজনক হবার পরিবর্তে বরং ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে দান–খয়রাত যদিও নেকী ও সৎকর্মকে বিকশিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু তা লাভজনক হবার জন্য সদুদ্দেশ্য, সৎসংকল্প ও সৎনিয়তের শর্ত আরোপিত হয়েছে। নিয়ত সৎ না হলে করুণার বারিধারা নিছক অর্থ ও সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩০৫. এখানে 'কাফের' শব্দটি অকৃতজ্ঞ ও অনুগ্রহ অস্বীকারকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া নেয়ামতকে তাঁর পথে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যয় করার পরিবর্তে-মানুষের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যয় করে অথবা আল্লাহর পথে কিছু অর্থ ব্যয় করলেও ব্যয় করার সাথে কষ্টও দিয়ে থাকে, সে আসলে অকৃতজ্ঞ এবং আল্লাহর অনুগ্রহ–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم
مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ
أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ
ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ
وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾ يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ
فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٦٩﴾

৩৭ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! যে অর্থ তোমরা উপার্জন করেছো এবং যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করে দিয়েছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। তাঁর পথে ব্যয় করার জন্য তোমরা যেন সবচেয়ে খারাপ জিনিস বাছাই করার চেষ্টা করো না অথচ ঐ জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয়, তাহলে তোমরা কখনো তা নিতে রাযী হও না, যদি না তা নেবার ব্যাপারে তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকো। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত।[৩০৮] শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কর্মনীতি অবলম্বন করতে প্রলুব্ধ করে কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশ্বাস দেন। আল্লাহ বড়ই উদারহস্ত ও মহাজ্ঞানী। তিনি যাকে চান, হিকমত দান করেন। আর যে ব্যক্তি হিকমত লাভ করে সে আসলে বিরাট সম্পদ লাভ করেছে।[৩০৯]

এসব কথা থেকে কেবলমাত্র তারাই শিক্ষা লাভ করে যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী।

বিস্মৃত বান্দা। আর সে নিজেই যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় না তখন তাকে অযথা নিজের সন্তুষ্টির পথ দেখাবার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

৩০৬. প্রবল বৃষ্টিপাত বলতে এমন দান–খয়রাতকে বুঝানো হয়েছে যার পেছনে থাকে চরম কল্যাণাকাংখা ও পূর্ণ সদিচ্ছা। আর হাল্কা বৃষ্টিপাত বলতে কল্যাণাকাংখার তীব্রতা বিহীন দান–খয়রাতকে বুঝানো হয়েছে।

৩০৭. অর্থাৎ তোমাদের সারা জীবনের উপার্জনের এমন এক সংকটকালে ধ্বংস হয়ে যাওয়া তোমরা পছন্দ করো না যখন তা থেকে লাভবান হবার তোমাদের সবচেয়ে বেশী

প্রয়োজন হয় এবং নতুন করে অর্থোপার্জনের সুযোগই তোমাদের থাকে না। ঠিক তেমনি দুনিয়ায় জীবনভর কাজ করার পর আখেরাতের জীবনে প্রবেশ করে তোমরা অকস্মাৎ যদি জানতে পারো তোমাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড এখানে মূল্যহীন হয়ে গেছে, যা কিছু তোমরা দুনিয়ায় উপার্জন করেছিলে তা দুনিয়ায় রয়ে গেছে, আখেরাতের জন্য তোমরা এমন কিছু উপার্জন করে আনতে পরোনি যার ফল এখানে ভোগ করতে পারো, তাহলে তা তোমরা কেমন করে পছন্দ করতে পারবে? সেখানে তোমরা নতুন করে আখেরাতের জন্য উপার্জন করার সুযোগ পাবে না। এই দুনিয়াতেই আখেরাতের জন্য কাজ করার সবটুকু সুযোগ রয়েছে। এখানে যদি তোমরা আখেরাতের চিন্তা না করে সারা জীবন দুনিয়ার ধ্যানে মগ্ন থাকো এবং বৈষয়িক স্বার্থ লাভের পেছনে নিজের সমস্ত শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করো, তাহলে জীবনসূর্য অস্তমিত হবার পর তোমাদের অবস্থা হবে ঠিক সেই বৃদ্ধের মতো করুণ, যার সারা জীবনের উপার্জন এবং জীবনের সহায় সম্বল ছিল একটি মাত্র বাগান। বৃদ্ধ বয়সে তার এই বাগানটি ঠিক এমন এক সময় পুড়ে ছাই হয়ে গেলো যখন তার নতুন করে বাগান তৈরি করার সামর্থ ছিল না। এবং তার সন্তানদের একজনও তাকে সাহায্য করার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি।

৩০৮. যিনি নিজে উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অধিকারী তিনি কখনো নিকৃষ্ট গুণের অধিকারীদের পছন্দ করতে পারেন না, একথা সবাই জানে। মহান আল্লাহ নিজেই পরম দাতা এবং সর্বক্ষণ নিজের সৃষ্টির ওপর দান–দাক্ষিণ্যের ধারা প্রবাহিত করছেন। কাজেই তাঁর পক্ষে কেমন করে সংকীর্ণ দৃষ্টি, স্বল্প সাহস ও নিম্নমানের নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী লোকদেরকে ভালোবাসা সম্ভব?

৩০৯. হিকমত অর্থ হচ্ছে, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি। এখানে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, হিকমতের সম্পদ যে ব্যক্তির কাছে থাকবে সে কখনো শয়তানের দেখানো পথে চলতে পারবে না। বরং সে আল্লাহর দেখানো প্রশস্ত পথ অবলম্বন করবে। শয়তানের সংকীর্ণমনা অনুসারীদের দৃষ্টিতে নিজের ধন–সম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখা এবং সবসময় সম্পদ আহরণের নতুন নতুন ফন্দি–ফিকির করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কিন্তু যারা আল্লাহর কাছ থেকে অন্তরদৃষ্টি লাভ করেছে, তাদের মতে এটা নেহাত নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের মতে, মানুষ যা কিছু উপার্জন করবে, নিজের মাঝারী পর্যায়ের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর সেগুলো প্রাণ খুলে সৎকাজে ব্যয় করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। দুনিয়ার এই হাতে গোণা কয়েকদিনের জীবনে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় জনের তুলনায় হয়তো অনেক বেশী প্রাচুর্যের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু মানুষের জন্য এই দুনিয়ার জীবনটিই সম্পূর্ণ জীবন নয়। বরং এটি আসল জীবনের একটি সামান্যতম অংশ মাত্র। এই সামান্য ও ক্ষুদ্রতম অংশের সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতার বিনিময়ে যে ব্যক্তি বৃহত্তম ও সীমাহীন জীবনের অসচ্ছলতা, দারিদ্র ও দৈন্যদশা কিনে নেয় সে আসলে নিরেট বোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ব্যক্তি এই সংক্ষিপ্ত জীবনকালের সুযোগ গ্রহণ করে মাত্র সামান্য পুঁজির সহায়তায় নিজের ঐ চিরন্তন জীবনের সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে সে–ই আসলে বুদ্ধিমান।

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ
مِنْ أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا
وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن
يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ
وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

তোমরা যা কিছু ব্যয় করেছো এবং যা মানতও করেছো আল্লাহ তা সবই জানেন। আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।[৩১০] যদি তোমাদের দান-সাদ্‌কাগুলো প্রকাশ্যে করো, তাহলে তাও ভালো, তবে যদি গোপনে অভাবীদের দাও, তাহলে তোমাদের জন্য এটিই বেশী ভালো।[৩১১] এভাবে তোমাদের অনেক গোনাহ নির্মূল হয়ে যায়।[৩১২] আর তোমরা যা কিছু করে থাকো আল্লাহ অবশ্যি তা জানেন।

মানুষকে হিদায়াত দান করার দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পিত হয়নি। আল্লাহ যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন। তোমরা যে ধন-সম্পদ দান-খয়রাত করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্য ভালো। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যই তো অর্থ ব্যয় করে থাকো। কাজেই দান-খয়রাত করে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং এ ক্ষেত্রে কোন ক্রমেই তোমাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে না।[৩১৩]

৩১০. আল্লাহর পথে ব্যয় করা হোক বা শয়তানের পথে, আল্লাহর জন্য মানত করা হোক বা গায়রুল্লাহর জন্য, উভয় অবস্থায়ই মানুষের নিয়ত ও তার কাজ সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। যারা আল্লাহর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং তাঁর জন্যই মানত করে তারা তাদের প্রতিদান পাবে। আর যেসব জালেম শয়তানের পথে ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের জন্য মানত করে, তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার সাধ্য কারো নেই।

মানত বলা হয় নজরানাকে। কোন একটি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে মানুষ যখন নিজের ওপর এমন কোন ব্যয়ভার বা সেবাকে ফরয করে নেয়, যা তার ওপর ফরয নয় তখন তাকে মানত বলে। এই মনোবাঞ্ছা যদি কোন হালাল জিনিস সম্পর্কিত হয় এবং তা আল্লাহর

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢٧٣﴾

বিশেষ করে এমন সব গরীব লোক সাহায্য লাভের অধিকারী, যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে না এবং তাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সচ্ছল বলে মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের ভেতরের অবস্থা জানতে পারো। মানুষের পেছনে লেগে থেকে কিছু চাইবে, এমন লোক তারা নয়। তাদের সাহায্যার্থে তোমরা যা কিছু অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে থাকবে না।[৩১৪]

কাছে চাওয়া হয়ে থাকে আর তা পূর্ণ হবার পর যে কাজ করার অংগীকার করা হয় তা আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে, তাহলে এই ধরনের নজরানা ও মানত হবে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন। এই মানত পূর্ণ করলে সওয়াব ও প্রতিদান লাভ করা যাবে। যদি এই ধরনের মানত না হয়, তাহলে তা নিজেই নিজের ওপর আরোপিত গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং তা পূর্ণ করলে অবশ্যি আযাবের অংশীদার হতে হবে।

৩১১. যে দান–খয়রাতটি করা ফরয সেটি প্রকাশ্যে করাই উত্তম। অন্যদিকে ফরয নয় এমন দান–খয়রাত গোপনে করাই ভালো। সমস্ত কাজের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। ফরযগুলো প্রকাশ্যে এবং নফলগুলো গোপনে করাই উত্তম হিসেবে বিবেচিত।

৩১২. অর্থাৎ লুকিয়ে সৎকাজ করলে মানুষের আত্মা ও নৈতিক বৃত্তির অনবরত সংশোধন হয়ে থাকে। তার সৎগুণাবলী বিকাশ লাভ করতে থাকে। তার দোষ, ত্রুটি ও অসৎবৃত্তিগুলো ধীরে ধীরে নির্মূল হতে থাকে। এই জিনিসটি তাকে আল্লাহর এমন প্রিয়ভাজন করে তোলে, যার ফলে তার আমলনামায় যে সামান্য কিছু গোনাহ লেখা থাকে, তার এই সৎগুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে মহান আল্লাহ সেগুলো মাফ করে দেন।

৩১৩. প্রথমদিকে মুসলমানরা নিজেদের অমুসলিম আত্মীয়–স্বজন ও সাধারণ অমুসলিম দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করার ব্যাপারে ইতস্তত করতো। তারা মনে করছিল কেবলমাত্র মুসলিম অভাবী ও দরিদ্রদের সাহায্য করলেই তা আল্লাহর পথে সাহায্য হিসেবে গণ্য হবে। এই আয়াতে তাদের এই ভুল ধারণার অপনোদন করা হয়েছে।

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

৩৮ রুকূ'

যারা নিজেদের ধন-সম্পদ দিনরাত গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের কোন ভয় ও দুঃখ নেই। কিন্তু যারা সুদ খায়[৩১৫] *তাদের অবস্থা হয় ঠিক সেই লোকটির মতো যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে।*[৩১৬] *তাদের এই অবস্থায় উপনীত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলে ঃ "ব্যবসা তো সুদেরই মতো।"*[৩১৭] *অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করে দিয়েছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।*[৩১৮] *কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে এই নসীহত পৌঁছে যায় এবং ভবিষ্যতে সুদখোরী থেকে সে বিরত হয়, সে ক্ষেত্রে যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই এবং এ ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ হয়ে গেছে।*[৩১৯] *আর এই নির্দেশের পরও যে ব্যক্তি আবার এই কাজ করে, সে জাহান্নামের অধিবাসী।*

এখানে আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, এসব লোকের মনে হিদায়াতের মর্মবাণী সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেয়া তোমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত নয়। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে কেবল এদের কাছে হককথা পৌঁছিয়ে দেয়া। হককথা পৌঁছিয়ে দিয়েই তুমি দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছো। এখন তাদের অন্তরদৃষ্টি দান করা বা না করা আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আর তোমরা নিছক তাদের হিদায়াত গ্রহণ না করার কারণে পার্থিব অর্থ-সম্পদ দিয়ে তাদের অভাব মোচনের ব্যাপারে ইতস্তত করো না কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে কোন অভাবী লোকের সাহায্য করো না কেন, আল্লাহ তার প্রতিদান অবশ্যি তোমাদের দেবেন।

৩১৪. এখানে যেসব লোকের কথা বলা হয়েছে, তারা হচ্ছে এমন একদল লোক যারা আল্লাহর দীনের খেদমতে নিজেদেরকে কায়মনোবাক্যে সার্বক্ষণিকভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছিল। তাদের সমস্ত সময় এই দীনী খেদমতে ব্যয় করার কারণে নিজেদের পেট পালার জন্য কিছু কাজকাম করার সুযোগ তাদের ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবীদের একটি স্বতন্ত্র দল ছিল। ইতিহাসে তাঁরা 'আসহাবে সুফ্ফা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এরা ছিলেন তিন চারশো লোকের একটি দল। নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়ে দিয়ে এরা মদীনায় চলে এসেছিলেন। সর্বক্ষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির থাকতেন। তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। তিনি যখন যাকে যেখানে কোন কাজে বা অভিযানে প্রয়োজন তাদের মধ্য থেকে নিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। মদীনার বাইরে কোন কাজ না থাকলে তারা মদীনায় অবস্থান করে দীনী ইল্‌ম হাসিল করতেন এবং অন্যদেরকে তার তালিম দিতেন। যেহেতু তাঁরা ছিলেন সার্বক্ষণিক কর্মী এবং নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার মতো ব্যক্তিগত উপকরণও তাঁদের ছিল না, তাই মহান আল্লাহ সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে বিশেষ করে তাদেরকে সাহায্য করাকে আল্লাহর পথে ব্যয়ের সর্বোত্তম খাত বলে উল্লেখ করেছেন।

৩১৫. মূল শব্দটি হচ্ছে 'রিবা'। আরবী ভাষায় এর অর্থ বৃদ্ধি। পারিভাষিক অর্থে আরবরা এ শব্দটি ব্যবহার করে এমন এক বর্ধিত অংকের অর্থের জন্য, যা ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে একটি স্থিরীকৃত হার অনুযায়ী মূল অর্থের বাইরে আদায় করে থাকে। আমাদের ভাষায় একেই বলা হয় সুদ। কুরআন নাযিলের সময় যেসব ধরনের সূদী লেনদেনের প্রচলন ছিল সেগুলোকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়। যেমন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতে কোন জিনিস বিক্রি করতো এবং দাম আদায়ের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতো। সময়সীমা অতিক্রম করার পর যদি দাম আদায় না হতো, তাহলে তাকে আবার বাড়তি সময় দিতো এবং দাম বাড়িয়ে দিতো। অথবা যেমন, একজন অন্য একজনকে ঋণ দিতো। ঋণদাতার সাথে চুক্তি হতো, উমুক সময়ের মধ্যে আসল থেকে এই পরিমাণ অর্থ বেশী দিতে হবে। অথবা যেমন, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি বিশেষ সময়সীমার জন্য একটি বিশেষ হার স্থিরিকৃত হয়ে যেতো। ঐ সময়সীমার মধ্যে বর্ধিত অর্থসহ আসল অর্থ আদায় না হলে আগের থেকে বর্ধিত হারে অতিরিক্ত সময় দেয়া হতো। এই ধরনের লেনদেনের ব্যাপার এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩১৬. আরবরা পাগল ও দেওয়ানাকে বলতো, 'মজনূন' (অর্থাৎ জিন বা প্রেতগ্রস্ত)। কোন ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে, একথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে দ্বারা বলতো, উমুককে জিনে ধরেছে। এই প্রবাদটি ব্যবহার করে কুরআন সুদখোরকে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছে যার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তি যেমন ভারসাম্যহীন কথা বলতে ও কাজ করতে শুরু করে, অনুরূপভাবে সুদখোরও টাকার পেছনে পাগলের মতো ছুটে ভারসাম্যহীন কথা ও কাজের মহড়া দেয়। নিজের স্বার্থপর মনোবৃত্তির চাপে পাগলের মতো সে কোন কিছুরই পরোয়া করে না। তার সুদখোরীর কারণে কোন্ কোন্ পর্যায় মানবিক প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির শিকড় কেটে গেলো, সামষ্টিক কল্যাণের ওপর কোন্ ধরনের ধ্বংসকর প্রভাব পড়লো এবং কতগুলো লোকের দুরবস্থার বিনিময়ে সে নিজের প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করলো—এসব বিষয়ে তার কোন মাথা ব্যথাই থাকে না।

দুনিয়াতে তার এই পাগলপারা অবস্থা। আর যেহেতু মানুষকে আখেরাতে সেই অবস্থায় ওঠানো হবে যে অবস্থায় সে এই দুনিয়ায় মারা গিয়েছিল, তাই কিয়ামতের দিন সুদখোর ব্যক্তি একজন পাগল ও বুদ্ধিভ্রষ্ট লোকের চেহারায় আত্মপ্রকাশ করবে।

৩১৭. অর্থাৎ তাদের মতবাদের গলদ হচ্ছে এই যে, ব্যবসায়ে যে মূলধন খাটানো হয়, তার ওপর যে মুনাফা আসে সেই মুনাফালব্ধ অর্থ ও সুদের মধ্যে তারা কোন পার্থক্য করে না। এই উভয় অর্থকে একই পর্যায়ভুক্ত মনে করে তারা যুক্তি পেশ করে থাকে যে, ব্যবসায়ে খাটানো অর্থের মুনাফা যখন বৈধ তখন এই ঋণবাবদ প্রদত্ত অর্থের মুনাফা অবৈধ হবে কেন? বর্তমান যুগের সুদখোররাও সুদের স্বপক্ষে এই একই যুক্তি পেশ করে থাকে। তারা বলে, এক ব্যক্তি যে অর্থ থেকে লাভবান হতে পারতো, তাকে সে ঋণ বাবদ দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে তুলে দিচ্ছে। আর ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি নিসন্দেহে তা থেকে লাভবানই হচ্ছে। তাহলে এ ক্ষেত্রে ঋণদাতার যে অর্থ থেকে ঋনগ্রহীতা লাভবান হচ্ছে তার একটি অংশ সে ঋণদাতাকে দেবে না কেন? কিন্তু তারা একথাটি চিন্তা করে না যে, দুনিয়ায় যত ধরনের কারবার আছে, ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী, কৃষি—যাই হোক না কেন, যেখানে মানুষ কেবলমাত্র শ্রম খাটায় অথবা শ্রম ও অর্থ উভয়টিই খাটায়, সেখানে কোন একটি কারবারও এমন নেই যাতে মানুষকে ক্ষতির ঝুঁকি (Risk) নিতে হয় না। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মুনাফা বাবদ অর্জিত হবার গ্যারান্টিও কোথাও থাকে না। তাহলে সারা দুনিয়ার সমস্ত ব্যবসায় সংগঠনের মধ্যে একমাত্র ঋণদাতা পুঁজিপতিইবা কেন ক্ষতির ঝুঁকিমুক্ত থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা লাভের হকদার হবে? অলাভজনক উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করার বিষয়টি কিছুক্ষণের জন্য না হয় দূরে সরিয়ে রাখুন এবং সুদের হারের কম বেশীর বিষয়টিও স্থগিত রাখুন। লাভজনক ও উৎপাদনশীল ঋণের ব্যাপারেই আসা যাক এবং হারও ধরা যাক কম। প্রশ্ন হচ্ছে, যারা রাতদিন নিজেদের কারবারে সময়, শ্রম, যোগ্যতা ও পুঁজি খাটিয়ে চলছে এবং যাদের প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপরই এই কারবার ফলপ্রসূ হওয়া নির্ভর করছে তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট মুনাফার নিশ্চয়তা নেই বরং ক্ষতির সমস্ত ঝুঁকিটাই থাকছে তাদের মাথার ওপর। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের টাকা তাকে ঋণ দিয়েছে সে নিশ্চিন্তে বসে বসে একটি নির্দিষ্ট অংকের মুনাফা হাসিল করতে থাকবে, এটা কোন্ ধরনের বুদ্ধিসম্মত ও যুক্তিসংগত কথা? ন্যায়, ইনসাফ ও অর্থনীতির কোন্ মানদণ্ডের বিচারে একে ন্যায়সংগত বলা যেতে পারে। আবার এক ব্যক্তি একজন কারখানাদারকে বিশ বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ ঋণ দিল এবং ঋণ দেয়ার সময়ই সেখানে স্থিরীকৃত হলো যে, আজ থেকেই সে বছরে শতকরা পাঁচ টাকা হিসেবে নিজের মুনাফা গ্রহণের অধিকারী হবে। অথচ কেউ জানে না, এই কারখানা যে পণ্য উৎপাদন করছে আগামী বিশ বছরে বাজারে তার দামের মধ্যে কি পরিমাণ ওঠানামা হবে? কাজেই এ পদ্ধতি কেমন করে সঠিক হতে পারে? একটি জাতির সকল শ্রেণী একটি যুদ্ধে বিপদ, ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করবে কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে একমাত্র ঋণদাতা পুঁজিপতি গোষ্ঠীই তাদের জাতিকে প্রদত্ত যুদ্ধঋণের সুদ উসূল করতে থাকবে শত শত বছর পরও, এটাকে কেমন করে সঠিক ও ন্যায়সংগত বলা যেতে পারে?

৩১৮. ব্যবসা ও সুদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণে উভয়ের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মর্যাদা একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। এই পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

(ক) ব্যবসায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মুনাফার সমান বিনিময় হয়। কারণ বিক্রেতার কাছ থেকে একটি পণ্য কিনে ক্রেতা তা থেকে মুনাফা অর্জন করে। অন্যদিকে ক্রেতার জন্য ঐ পণ্যটি যোগাড় করার ব্যাপারে বিক্রেতা নিজের যে বুদ্ধি শ্রম ও সময় ব্যয় করেছিল তার মূল্য গ্রহণ করে। বিপরীতপক্ষে সুদী লেনদেনের ব্যাপারে মুনাফার সমান বিনিময় হয় না। সুদ গ্রহণকারী অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করে। এটি তার জন্য নিশ্চিতভাবে লাভজনক। কিন্তু অন্যদিকে সুদ প্রদানকারী কেবলমাত্র 'সময়' লাভ করে, যার লাভজনক হওয়া নিশ্চিত নয়। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য যদি সে ঐ ঋণ বাবদ অর্থ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে নিসন্দেহে বলা যায়, ঐ 'সময়' তার জন্যে নিশ্চিতভাবে অলাভজনক ও অনুৎপাদনশীল। আর যদি সে ব্যবসায়, শিল্প প্রতিষ্ঠান, কারিগরী সংস্থা অথবা কৃষি কাজে লাগাবার জন্য ঐ অর্থ নিয়ে থাকে, তবুও 'সময়' তার জন্য যেমন লাভ আনবে তেমনি ক্ষতিও আনবে, দু'টোরই সম্ভাবনা সমান। কাজেই সুদের ব্যাপারটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় একটি দলের লাভ ও অন্য দলের লোকসানের ওপর অথবা একটি দলের নিশ্চিত ও নির্ধারিত লাভ ও অন্য দলের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত লাভের ওপর।

(খ) ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে যত বেশী লাভ গ্রহণ করুকনা কেন, সে মাত্র একবারই তা গ্রহণ করে। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানকারী নিজের অর্থের জন্য অনবরত মুনাফা নিতে থাকে। আবার সময়ের গতির সাথে সাথে তার মুনাফাও বেড়ে যেতে থাকে। ঋণগ্রহীতা তার অর্থ থেকে যতই লাভবান হোক না কেন তা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ঋণদাতা এই লাভ থেকে যে মুনাফা অর্জন করে তার কোন সীমা নেই। এমনও হতে পারে, সে ঋণগ্রহীতার সমস্ত উপার্জন, তার সমস্ত অর্থনৈতিক উপকরণ এমনকি তার পরনের কাপড়–চোপড় ও ঘরের বাসন–কোসনও উদরস্থ করে ফেলতে পারে এবং এরপরও তার দাবী অপূর্ণ থেকে যাবে।

(গ) ব্যবসায়ে পণ্যের সাথে তার মূল্যের বিনিময় হবার সাথে সাথেই লেনদেন শেষ হয়ে যায়। এরপর ক্রেতাকে আর কোন জিনিস বিক্রেতার হাতে ফেরত দিতে হয় না। গৃহ, জমি বা মালপত্রের ভাড়ার ব্যাপারে আসল যে বস্তুটি, যার ব্যবহারের জন্য মূল্য দিতে হয়, তা ব্যয়িত হয় না বরং অবিকৃত থাকে এবং অবিকৃত অবস্থায় তা ভাড়াদানকারীর কাছে ফেরত দেয়া হয়। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা আসল পুঁজি ব্যয় করে ফেলে তারপর ব্যয়িত অর্থ পুনর্বার উৎপাদন করে বৃদ্ধি সহকারে ফেরত দেয়।

(ঘ) ব্যবসা–বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী ও কৃষিতে মানুষ শ্রম, বুদ্ধি ও সময় ব্যয় করে তার সাহায্যে লাভবান হয়। কিন্তু সুদী কারবারে সে নিছক নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে কোন প্রকার শ্রম ও কষ্ট ছাড়াই অন্যের উপার্জনের সিংহভাগের অংশীদার হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকে "অংশীদার" বলা হয় লাভ–লোকসান উভয় ক্ষেত্রে যে অংশীদার থাকে এবং লাভের ক্ষেত্রে লাভের হার অনুযায়ী যার অংশীদারীত্ব হয়, তেমন অংশীদারের মর্যাদা সে লাভ করে না। বরং সে এমন অংশীদার হয়, যে লাভ–লোকসান ও লাভের হারের কোন পরোয়া না করেই নিজের নির্ধারিত মুনাফার দাবীদার হয়।

এসব কারণে ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক মর্যাদা ও সুদের অর্থনৈতিক অবস্থানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। এর ফলে ব্যবসায় মানবিক তামাদ্দুনের লালন ও পুনর্গঠনকারী

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٧﴾

সেখানে সে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত ও বিকশিত করেন।[৩২০] আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ দুষ্কৃতকারীকে পছন্দ করেন না।[৩২১] অবশ্যি যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের প্রতিদান নিসন্দেহে তাদের রবের কাছে আছে এবং তাদের কোন ভয় ও মর্মজ্বালাও নেই।[৩২২]

শক্তিতে পরিণত হয়। বিপরীত পক্ষে সুদ তার ধ্বংসের কারণ হয়। আবার নৈতিক দিক দিয়ে সুদের প্রকৃতিই হচ্ছে, তা ব্যক্তির মধ্যে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, কঠোরতা ও অর্থগৃধ্নুতা সৃষ্টি করে এবং সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্য–সহযোগিতার মনোভাব বিনষ্ট করে দেয়। তাই অর্থনৈতিক ও নৈতিক উভয় দিক দিয়েই সুদ মানবতার জন্য ধ্বংসই ডেকে আনে।

৩১৯. একথা বলা হয়নি যে, যা কিছু সে খেয়ে ফলেছে, আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। বরং বলা হচ্ছে তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে থাকছে। এই বাক্য থেকে জানা যায়, "যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই" বাক্যের অর্থ এ নয় যে, যাকিছু ইতিপূর্বে খেয়ে ফেলেছে তা মাফ করে দেয়া হয়েছে বরং এখানে শুধুমাত্র আইনগত সুবিধের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে সুদ সে খেয়ে ফেলেছে আইনগতভাবে তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হবে না। কারণ তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হলে মামলা–মোকদ্দমার এমন একটা ধারাবাহিকতা চক্র শুরু হয়ে যাবে যা আর শেষ হবে না। তবে সূদী কারবারের মাধ্যমে যে ব্যক্তি অর্থ–সম্পদ সংগ্রহ করেছে নৈতিক দিক দিয়ে তার অপবিত্রতা পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি তার মনে যথার্থই আল্লাহর ভীতি স্থান লাভ করে থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তার অর্থনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিভংগী যদি সত্যিই পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে নিজেই এই হারাম পথে উপার্জিত ধন–সম্পদ নিজের জন্য ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে এবং যাদের অর্থ–সম্পদ তার কাছে আছে তাদের সন্ধান লাভ করার জন্য নিজস্ব পর্যায়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে। হকদারদের সন্ধান পাবার পর তাদের হক ফিরিয়ে দেবে। আর যেসব হকদারের সন্ধান পাবে না তাদের সম্পদগুলো সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার ব্যবস্থা করবে। এই কার্যক্রম তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। তবে যে

ব্যক্তি তার পূর্বেকার সুদলব্ধ অর্থ যথারীতি ভোগ করতে থাকে, সে যদি তার এই হারাম খাওয়ার শাস্তি লাভ করেই যায়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

৩২০. এই আয়াতে এমন একটি অকাট্য সত্যের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যেমন সত্য তেমনি অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক দিক দিয়েও সত্য। যদিও আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, সুদের মাধ্যমে অর্থ বৃদ্ধি হচ্ছে এবং দান–খয়রাতের মাধ্যমে অর্থ–সম্পদ কমে যাচ্ছে তবুও আসল ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান হচ্ছে এই যে, সুদ নৈতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক উন্নতির কেবল প্রতিবন্ধকতাই নয় বরং অবনতির সহায়ক। বিপরীতপক্ষে দান–খয়রাতের (করযা–ই–হাসানা বা উত্তম ঋণ) মাধ্যমে নৈতিক ও অধ্যাত্মিক বৃত্তি এবং তামাদ্দুন ও অর্থনীতি সবকিছুই উন্নতি ও বিকাশ লাভ করে।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিচার করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সুদ আসলে স্বার্থপরতা, কৃপণতা, সংকীর্ণতা, নির্মমতা ইত্যাকার অসৎ গুণাবলীর ফল এবং এই গুণগুলোই সে মানুষের মধ্যে বিকশিত করে। অন্যদিকে দানশীলতা, সহানুভূতি, উদারতা ও মহানুভবতা ইত্যাকার গুণাবলীই দান–খয়রাতের জন্ম দেয় এবং দান–খয়রাতের মাধ্যমে আর নিয়মিত দান–খয়রাত করতে থাকলে এই গুণগুলো মানুষের মধ্যে লালিত ও বিকশিত হতেও থাকে। এমন কে আছে যে, এই উভয় ধরনের নৈতিক গুণাবলীর মধ্য থেকে প্রথমগুলোকে নিকৃষ্ট ও শেষেরগুলোকে উৎকৃষ্ট বলবে না?

তামাদ্দুনিক দিক দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিসন্দেহে একথা বুঝতে সক্ষম হবে যে, যে সমাজের লোকেরা পরস্পরের সাথে স্বার্থবাদী আচরণ করে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লাভ ছাড়া নিস্বার্থভাবে অন্যের কোন কাজ করে না, একজনের প্রয়োজন ও অভাবকে অন্যজন নিজের মুনাফা লুণ্ঠনের সুযোগ মনে করে তা থেকে পুরোপুরি লাভবান হয় এবং ধনীদের স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে, সে সমাজ কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। সে সমাজের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কের পরিবর্তে হিংসা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা ও অনাগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আর বিভিন্ন অংশ হামেশা বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। অন্যান্য কারণগুলো যদি এই অবস্থার সহায়ক হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এহেন সমাজের বিভিন্ন অংশের পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে যাওয়াটাও মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। অন্যদিকে যে সমাজের সামষ্টিক ব্যবস্থাপনা পরস্পরের প্রতি সাহায্য–সহানুভূতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যার সদস্যরা পরস্পরের সাথে ঔদার্যপূর্ণ আচরণ করে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের প্রয়োজন ও অভাবের সময় আন্তরিকতার সাথে ও প্রশস্তমনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং একজন সামর্থ ও সক্ষম ব্যক্তি তার একজন অক্ষম ও অসমর্থ ভাইকে সাহায্য অথবা কমপক্ষে ন্যায়সংগত সহায়তার নীতি অবলম্বন করে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই পারস্পরিক প্রীতি, কল্যাণাকাংখা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এ ধরনের সমাজের অংশগুলো একটি অন্যটির সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত থাকবে। সেখানে আভ্যন্তরীণ কোন্দল, বিরোধ ও সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কোন সুযোগই পাবে না। পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সাহায্য সহযোগিতার কারণে সেখানে উন্নতির গতিধারা প্রথম ধরনের সমাজের তুলনায় অনেক বেশী দ্রুত হবে।

এবার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করা যাক। অর্থনীতির বিচারে সুদী লেনদেন দুই ধরনের হয়। এক, অভাবীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যয়ভার বহন করার জন্য বাধ্য হয়ে যে ঋণ গ্রহণ করে। দুই, পেশাদার লোকেরা নিজেদের ব্যবসায়–বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী, কৃষি ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রথম ধরনের ঋণটি সম্পর্কে সবাই জানে, এর ওপর সুদ আদায় করার পদ্ধতি মারাত্মক ধ্বংসকর। দুনিয়ায় এমন কোন দেশ নেই যেখানে মহাজনরা ও মহাজনী সংস্থাগুলো এই পদ্ধতিতে গরীব শ্রমিক, মজুর, কৃষক ও স্বল্প আয়ের লোকদের রক্ত চুষে চলছে না। সুদের কারণে এই ধরনের ঋণ আদায় করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বরং অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারপর এক ঋণ আদায় করার জন্য দ্বিতীয় ঋণ এবং তারপর তৃতীয় ঋণ, এভাবে ঋণের পর ঋণ নিতে থাকে। ঋণের মূল অংকের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী সুদ আদায় করার পরও মূল অংক যেখানকার সেখানেই থেকে যায়। শ্রমিকদের আয়ের বৃহত্তম অংশ মহাজনের পেটে যায়। তার নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থ দিনান্তে তার নিজের ও সন্তান–পরিজনদের পেটের আহার যোগাতে সক্ষম হয় না। এ অবস্থায় কাজের প্রতি শ্রমিক ও কর্মচারীদের আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে এবং একদিন তা শূণ্যের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। কারণ তাদের মেহনতের ফল যদি অন্যেরা নিয়ে যেতে থাকে, তাহলে তারা কোনদিন মন দিয়ে ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে পারে না। তারপর সুদী ঋণের জালে আবদ্ধ লোকরা সর্বক্ষণ এমন দুর্ভাবনা ও পেরেশানির মধ্যে জীবন কাটায় এবং অভাবের কারণে তাদের জন্য সঠিক খাদ্য ও চিকিৎসা এমনই দুর্লভ হয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের স্বাস্থ্য কখনো ভালো থাকে না। প্রায়ই তারা রোগ–পীড়ায় জর্জরিত থাকে। এভাবে সুদী ঋণের নীট ফল এই দাঁড়ায় ঃ গুটিকয় লোক লাখো লোকের রক্ত চুষে মোটা হতে থাকে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতির অর্থ উৎপাদন সম্ভাব্য পরিমাণ থেকে অনেক কমে যায়। পরিণামে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ত চোষারাও নিষ্কৃতি পায় না। কারণ তাদের স্বার্থগৃধ্নুতায় সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ধনিক সমাজের বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্ষোভ, ঘৃণা ও ক্রোধ লালিত হতে থাকে। তারপর একদিন কোন বিপ্লবের তরংগাভিঘাতে ক্ষোভের আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে। তখন এই জালেম ধনিক সমাজকে তাদের অর্থ–সম্পদের সাথে সাথে প্রাণ সম্পদও বিসর্জন দিতে হয়।

আর দ্বিতীয় ধরনের সুদী ঋণ সম্পর্কে বলা যায়, ব্যবসায় খাটাবার জন্য একটি নির্দিষ্ট সুদের হারে এই ঋণ গ্রহণ করার ফলে যে অসংখ্য ক্ষতি হয় তার মধ্যে উল্লেখ্য কয়েকটি এখানে বিবৃত করছি।

এক ঃ যে কাজটি প্রচলিত সুদের হারের সমান লাভ উৎপাদনে সক্ষম নয়, তা দেশ ও জাতির জন্য যতই প্রয়োজনীয় ও উপকারী হোক না কেন, তাতে খাটাবার জন্য অর্থ পাওয়া যায় না। আবার দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক উপকরণ একযোগে এমন সব কাজের দিকে দৌড়ে আসে, যেগুলো বাজারে প্রচলিত সুদের হারের সমান বা তার চাইতে বেশী লাভ উৎপাদন করতে পারে, সামগ্রিক দিক দিয়ে তাদের প্রয়োজন বা উপকারী ক্ষমতা অনেক কম অথবা একেবারে শূন্যের কোঠায় থাকলেও।

দুই ঃ ব্যবসায়, শিল্প বা কৃষি সংক্রান্ত যেসব কাজের জন্য সুদে টাকা পাওয়া যায়, তাদের কোন একটিতেও এ ধরনের কোন গ্যারান্টি নেই যে, সবসময় সব অবস্থায় তার মুনাফা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যেমন শতকরা পাঁচ, ছয় বা দশ অথবা তার ওপরে থাকবে এবং এর নীচে কখনো নামবে না। মুনাফার এই হারের গ্যারান্টি তো দূরের কথা সেখানে অবশ্যি মুনাফা হবে, কখনো লোকসান হবে না, এর কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই যে ব্যবসায়ে এমন ধরনের পুঁজি খাটানো হয় যাতে পুঁজিপতিকে একটি নির্ধারিত হার অনুযায়ী মুনাফা দেয়ার নিশ্চয়তা দান করা হয়ে থাকে, তা কখনো ক্ষতি ও আশংকা মুক্ত হতে পারে না।

তিন ঃ যেহেতু মূল ঋণদাতা ব্যবসায়ের লাভ লোকসানে অংশীদার হয় না, কেবলমাত্র মুনাফার অংশীদার হয় এবং তাও আবার একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার নিশ্চয়তা দেয়ার ভিত্তিতে মূলধন দেয়, তাই ব্যবসায়ের ভালো-মন্দের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ থাকে না। সে চরম স্বার্থপরতা সহকারে কেবলমাত্র নিজের মুনাফার ওপর নজর রাখে। যখনই বাজারে সামান্য মন্দাভাব দেখা দেয়ার আশংকা হয় তখনই সে সবার আগে নিজের টাকাটা টেনে নেয়ার চিন্তা করে। এভাবে কখনো কখনো নিছক তার স্বার্থপরতা সুলভ আশংকার কারণে সত্যি সত্যিই বাজারে মন্দাভাব সৃষ্টি হয়। কখনো অন্য কোন কারণে বাজারে মন্দাভাব সৃষ্টি হয়ে গেলে পুঁজিপতির স্বার্থপরতা তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের সূচনা করে।

সুদের এ তিনটি ক্ষতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অর্থনীতির সাথে সামান্যতম সম্পর্ক রাখে এমন কোন ব্যক্তি এগুলো অস্বীকার করতে পারবেন না। এরপর একথা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, যথার্থই সুদ অর্থনৈতিক সম্পদ বাড়ায় না বরং কমায়।

এবার দান-খয়রাতের অর্থনৈতিক প্রভাব ও ফলাফলের কথায় আসা যাক। সমাজের সচ্ছল লোকেরা যদি নিজেদের অবস্থা ও মর্যাদা অনুসারে নিসংকোচে নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নেয় এরপর তাদের কাছে যে পরিমাণ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তা গরীবদের মধ্যে বিলি করে দেয়, যাতে তারাও নিজেদের প্রয়োজনের জিনিসপত্র কিনতে পারে, তারপরও যে টাকা বাড়তি থেকে যায় তা ব্যবসায়ীদের বিনা সুদে ঋণ দেয় অথবা অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে লাভ লোকসানে শরীক হয়ে যায় অথবা সমাজ ও সমষ্টির সেবায় বিনিয়োগ করার জন্য সরকারের হাতে সোপর্দ করে দেয়, তাহলে এহেন সমাজে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি চরম উন্নতি লাভ করবে, সমাজের সাধারন লোকদের সচ্ছলতা বেড়ে যেতে থাকবে এবং সুদী অর্থ ব্যবস্থা ভিত্তিক সমাজের তুলনায় সেখানে সামগ্রিকভাবে অর্থ উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে যাবে, একথা যে কেউ সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে সহজেই বুঝতে পারবে।

৩২১. অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তার মৌলিক প্রয়োজনের চাইতে বেশী অংশ পেয়েছে একমাত্র সেই ব্যক্তিই সুদে টাকা খাটাতে পারে। কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই যে অংশটা পায় কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয় আল্লাহর দান। আর আল্লাহর এই দানের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ যেভাবে তাঁর বান্দাকে দান করেছেন বান্দাও ঠিক সেভাবেই আল্লাহর অন্য বান্দাদেরকে তা দান করবে। যদি সে এমনটি না করে বরং এর বিপরীতপক্ষে আল্লাহর এই দানকে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ
تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ
كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং লোকদের কাছে তোমাদের যে সূদ বাকি রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি যথার্থই তোমরা ঈমান এনে থাকো। কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না করো তাহলে জেনে রাখো, এটা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।[৩২৩] এখনো তাওবা করে নাও (এবং সূদ ছেড়ে দাও) তাহলে তোমরা আসল মূলধনের অধিকারী হবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপর জুলুম করাও হবে না। তোমাদের ঋণগ্রহীতা অভাবী হলে সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি সাদ্‌কা করে দাও, তাহলে এটা তোমাদের জন্য বেশী ভালো হবে, যদি তোমরা জানতে।[৩২৪] যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে সেদিনের অপমান ও বিপদ থেকে বাঁচো। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত সৎকর্মের ও অপকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারো ওপর কোন জুলুম করা হবে না।

এমনভাবে ব্যবহার করে যার ফলে অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহর যেসব বান্দা প্রয়োজনের কম অংশ পেয়েছে তাদের এই কম অংশ থেকেও নিজের অর্থের জোরে এক একটি অংশ নিজের দিকে টেনে নিতে থাকে, তাহলে আসলে সে এক দিকে যেমন হবে অকৃতজ্ঞ তেমনি অন্য দিকে হবে জালেম, নিষ্ঠুর, শোষক ও দুশ্চরিত্র।

৩২২. এই রুকূ'তে মহান আল্লাহ বারবার দুই ধরনের লোকদের তুলনা করেছেন। এক ধরনের লোক হচ্ছে, স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু ও শাইলক প্রকৃতির, তারা আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের অধিকারের পরোয়া না করে টাকা গুণতে থাকে, প্রত্যেকটি টাকা গুণে গুণে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে থাকে এবং সপ্তাহ ও মাসের হিসেবে তা বাড়াবার ও এই বাড়তি টাকার হিসেব রাখার মধ্যে ডুবে থাকে। দ্বিতীয় ধরনের লোক হচ্ছে, আল্লাহর অনুগত, দানশীল ও মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা আল্লাহ ও তার বান্দার উভয়ের

অধিকার সংরক্ষণের প্রতি নজর রাখে, নিজেদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দিয়ে নিজেদের চাহিদাপূরণ করে এবং অন্যদের চাহিদা পূরণেরও ব্যবস্থা করে। আর এই সংগে নিজেদের অর্থ ব্যাপকভাবে সৎকাজে ব্যয় করে। প্রথম ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। এই ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকদের সাহায্যে দুনিয়ায় কোন সৎ ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। আখেরাতেও তারা দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ও বিপদ–মুসিবত ছাড়া আর কিছুই পাবে না। বিপরীতপক্ষে দ্বিতীয় ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন। তাদের সাহায্যেই দুনিয়ায় সৎ ও সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে এবং আখেরাতে তারাই কল্যাণ ও সাফল্যের অধিকারী হয়।

৩২৩. এ আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পর নাযিল হয়। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এটিকে এখানে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে সুদকে একটি অপছন্দনীয় বস্তু মনে করা হলেও আইনত তা রহিত করা হয়নি। এই আয়াতটি নাযিলের পর ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সুদী কারবার একটি ফৌজদারী অপরাধে পরিণত হয়। আরবের যেসব গোত্রে সুদের প্রচলন ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের গভর্ণরের মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, এখন থেকে যদি তারা সুদের কারবার বন্ধ না করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে নাজরানের খৃষ্টানদের স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দান করার সময় চুক্তিতে একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়, যদি তোমরা সুদী কারবার করো তাহলে এই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে। আয়াতের শেষের শব্দগুলোর কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বাসরী, ইবনে সীরীন ও রুবাঈ' ইবনে আনাস প্রমুখ ফকীহগণ এই মত প্রকাশ করেন যে, যে ব্যক্তি দারুল ইসলামে সুদ খাবে তাকে তাওবা করতে বাধ্য করা হবে। আর যদি সে তাতে বিরত না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। অন্য ফকীহদের মতে, এহেন ব্যক্তিকে বন্দী করে রাখাই যথেষ্ট। সুদ খাওয়া পরিত্যাগ করার অংগীকার না করা পর্যন্ত তাকে কারারুদ্ধ করে রাখতে হবে।

৩২৪. এই আয়াতটি থেকে শরীয়াতের এই বিধান গৃহীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে ইসলামী আদালত তার ঋণদাতাদের বাধ্য করবে, যাতে তারা তাকে 'সময়' দেয় এবং কোন কোন অবস্থায় আদালত তার সমস্ত দেনা বা তার আংশিক মাফ করে দেয়ারও ব্যবস্থা করবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ এক ব্যক্তির ব্যবসায়ে লোকসান হতে থাকে। তার ওপর দেনার বোঝা অনেক বেশী বেড়ে যায়। ব্যাপারটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত গড়ায়। তিনি লোকদের কাছে ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করার আবেদন জানান। অনেকে তাকে আর্থিক সাহায্য দান করে কিন্তু এরপরও তার দেনা পরিশোধ হয় না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঋণদাতাদের বলেন, যা কিছু তোমরা পেয়েছো তাই নিয়ে তাকে রেহাই দাও। এর বেশী তার কাছ থেকে তোমাদের জন্য আদায় করিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। ফকীহগণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এক ব্যক্তির থাকার ঘর, খাবার বাসনপত্র, পরার কাপড়–চোপড় এবং যেসব যন্ত্রপাতি দিয়ে সে রুজি–রোজগার করে, সেগুলো কোন অবস্থাতেই ক্রোক করা যেতে পারে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۭ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۠ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَـيْـــًٔا ۭ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ ھُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۭ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ

৩৯ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! যখন কোন নির্ধারিত সময়ের জন্য তোমরা পরস্পরের মধ্যে ঋণের লেনদেন করো[৩২৫] তখন লিখে রাখো[৩২৬] উভয় পক্ষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে এক ব্যক্তি দলীল লিখে দেবে। আল্লাহ যাকে লেখাপড়ার যোগ্যতা দিয়েছেন তার লিখতে অস্বীকার করা উচিত নয়। সে লিখবে এবং লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে সেই ব্যক্তি যার ওপর ঋণ চাপছে (অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা)। তার রব আল্লাহকে তার ভয় করা উচিত। যে বিষয় স্থিরীকৃত হয়েছে তার থেকে যেন কোন কিছুর কম বেশি না করা হয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি বুদ্ধিহীন বা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তাহলে তার অভিভাবক ইনসাফ সহকারে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে। তারপর নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে[৩২৭] দুই ব্যক্তিকে তার স্বাক্ষী রাখো।

৩২৫. এখান থেকে এ বিধান পাওয়া যায় যে, ঋণের ব্যাপারে সময়সীমা নির্ধারিত হওয়া উচিত।

৩২৬. সাধারণত বন্ধু–বান্ধব ও আত্মীয়–স্বজনদের মধ্যে ঋণের লেন–দেনের ব্যাপারে দলীল বা প্রমাণপত্র লেখাকে এবং সাক্ষী রাখাকে দূষণীয় ও আস্থাহীনতার প্রকাশ মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহর বাণী হচ্ছে এই যে, ঋণ ও ব্যবসায় সংক্রান্ত লেন–দেনের চুক্তি সাক্ষ্য প্রমাণাদিসহ লিখিত আকারে সম্পাদিত হওয়া উচিত। এর ফলে লোকদের মধ্যে লেনদেন পরিষ্কার থাকবে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তিন ধরনের লোক আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে কিন্তু তাদের ফরিয়াদ শোনা হয় না। এক, যার স্ত্রী অসচ্চরিত্র কিন্তু সে তাকে তালাক দেয় না। দুই, এতিমের বালেগ হবার আগে যে ব্যক্তি তার সম্পদ তার

فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

আর যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হবে, যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। এসব সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য থেকে হতে হবে যাদের সাক্ষ্য তোমাদের কাছে গ্রহণীয়।[৩২৮] সাক্ষীদেরকে সাক্ষ দেবার জন্য বললে তারা যেন অস্বীকার না করে। ব্যাপার ছোট হোক বা বড়, সময়সীমা নির্ধারণ সহকারে দলীল লেখাবার ব্যাপারে তোমরা গড়িমসি করো না। আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য এই পদ্ধতি অধিকতর ন্যায়সংগত, এর সাহায্যে সাক্ষ প্রতিষ্ঠা বেশী সহজ হয় এবং তোমাদের সন্দেহ–সংশয়ে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। তবে যেসব ব্যবসায়িক লেনদেন তোমরা পরস্পরের মধ্যে হাতে হাতে করে থাকো, সেগুলো না লিখলে কোন ক্ষতি নেই।[৩২৯] কিন্তু ব্যবসায়িক বিষয়গুলো স্থিরীকৃত করার সময় সাক্ষী রাখো। লেখক ও সাক্ষীকে কষ্ট দিয়ো না।[৩৩০] এমনটি করলে গোনাহের কাজ করবে। আল্লাহর গযব থেকে আত্মরক্ষা করো। তিনি তোমাদের সঠিক কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দান করেন এবং তিনি সবকিছু জানেন।

হাতে সোপর্দ করে দেয়। তিন, যে ব্যক্তি কাউকে নিজের অর্থ ঋণ দেয় এবং তাতে কাউকে সাক্ষী রাখে না।

وَإِنْ كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

যদি তোমরা সফরে থাকো এবং এ অবস্থায় দলীল লেখার জন্য কোন লেখক না পাও, তাহলে বন্ধক রেখে কাজ সম্পন্ন করো।[৩৩১] যদি তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি অন্যের ওপর ভরসা করে তার সাথে কোন কাজ কারবার করে, তাহলে যার ওপর ভরসা করা হয়েছে সে যেন তার আমানত যথাযথরূপে আদায় করে এবং নিজের রব আল্লাহকে ভয় করে। আর সাক্ষ কোনক্রমেই গোপন করো না।[৩৩২] যে ব্যক্তি সাক্ষ গোপন করে তার হৃদয় গোনাহর সংস্পর্শে কলুষিত। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বেখবর নন।

৩২৭. অর্থাৎ মুসলিম পুরুষদের মধ্য থেকে। এ থেকে জানা যায়, যেখানে সাক্ষী রাখা ইচ্ছাধীন সেখানে মুসলমানরা কেবলমাত্র মুসলমানদেরকে সাক্ষী বানাবে। তবে অমুসলিমদের সাক্ষী অমুসলিমরা হতে পারে।

৩২৮. এর অর্থ হচ্ছে, যে কোন ব্যক্তি সাক্ষী হবার যোগ্য নয়। বরং এমন সব লোককে সাক্ষী করতে হবে যারা নিজেদের নৈতিক চরিত্র ও বিশ্বস্ততার কারণে সাধারণভাবে লোকদের মধ্যে নির্ভরশীল বলে বিবেচিত।

৩২৯. এর অর্থ হচ্ছে, যদিও নিত্যদিনের কেনা-বেচার ক্ষেত্রে লেনদেনের বিষয়টি লিখিত থাকা ভালো, যেমন আজকাল ক্যাশমেমো লেখার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তবুও এমনটি করা অপরিহার্য নয়। অনুরূপভাবে প্রতিবেশী ব্যবসায়ীরা পরস্পরের মধ্যে রাত দিন যেসব লেনদেন করতে থাকে, সেগুলোও লিখিত আকারে না থাকলে কোন ক্ষতি নেই।

৩৩০. এর এক অর্থ এও হয় যে, কোন দলীল বা প্রমাণপত্র লেখার বা তাতে সাক্ষী থাকার জন্য কোন ব্যক্তির ওপর জোর খাটানো যাবে না এবং তাকে বাধ্য করা হবে না। আবার এ অর্থও হয় যে, কোন পক্ষ তার স্বার্থ বিরোধী সঠিক সাক্ষ্য দেয়ার কারণে যেন লেখক বা সাক্ষীকে কষ্ট না দেয়।

৩৩১. এর অর্থ এই নয় যে, বন্ধকের ব্যাপারটা কেবলমাত্র সফরেই হতে পারে। বরং এ অবস্থাটা যেহেতু বেশীর ভাগ সফরেই দেখা দেয়, তাই বিশেষ করে এর উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া বন্ধকের ব্যাপারে এ শর্তও এখানে লাগানো হয়নি যে, দলীল লেখা সম্ভব না হলে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই বন্ধকের আশ্রয় নেয়া যায়। এ ছাড়া এর আর একটি

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ
اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۭ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ
يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ
وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ وَقَالُوْا سَمِعْنَا
وَاَطَعْنَا ڭ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾

৪০ রুকূ'

আকাশসমূহে[৩৩৩] ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর।[৩৩৪] তোমরা নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করো বা লুকিয়ে রাখো, আল্লাহ অবশ্যি তোমাদের কাছ থেকে তার হিসেব নেবেন।[৩৩৫] তারপর তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, এটা তাঁর ইখতিয়ারাধীন। তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তি খাটাবার অধিকারী।[৩৩৬]

রসূল তার রবের পক্ষ থেকে তার ওপর যে হিদায়াত নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে। আর যেসব লোক ঐ রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও ঐ হিদায়াতকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে ও তাঁর রসূলদেরকে মানে এবং তাদের বক্তব্য হচ্ছে ঃ "আমরা আল্লাহর রসূলদের একজনকে আর একজন থেকে আলাদা করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি ও অনুগত হয়েছি। হে প্রভু ! আমরা তোমার কাছে গোনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করছি। আমাদের তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে।[৩৩৭]

পদ্ধতিও হতে পারে। নিছক দলীলের ওপর নির্ভর করে টাকা ধার দিতে কেউ রাজী না হলে ঋণগ্রহীতা নিজের কোন জিনিস বন্ধক রেখে টাকা ধার নেবে। কিন্তু কুরআন মজীদ তার অনুসারীদের দানশীলতা ও মহানুভবতার শিক্ষা দিতে চায়। আর এক ব্যক্তি ধন-সম্পদের অধিকারী হবার পর কাউকে কোন জিনিস বন্ধক না রেখে তার প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ তাকে ধার দিতে রাজী হবে না, এটা তার উন্নত নৈতিক চরিত্রের পরিপন্থী। তাই কুরআন উদ্দেশ্যমূলকভাবেই দ্বিতীয় পদ্ধতিটির উল্লেখ করেনি।

এ প্রসংগে একথাও জেনে রাখা উচিত যে, বন্ধক রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঋণদাতা তার ঋণ ফেরত পাবার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চায়। নিজের ঋণ বাবদ প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত বন্ধকী জিনিস থেকে কোন প্রকার লাভবান হবার অধিকার তার নেই। যদি কোন ব্যক্তি বন্ধকী গৃহে নিজে বাস করে বা তার ভাড়া খায়, তাহলে আসলে সে সুদ খায়। ঋণ বাবদ প্রদত্ত টাকার সরাসরি সুদ গ্রহণ করা ও বন্ধকী জিনিস থেকে লাভবান হবার মধ্যে নীতিগতভাবে কোন পার্থক্য নেই। তবে যদি কোন পশু বন্ধক রাখা হয় তাহলে তার দুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। এবং তাকে আরোহণ ও মাল পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ বন্ধক গ্রহণকারী পশুকে যে খাদ্য দেয়, এটা আসলে তার বিনিময়।

৩৩২. সাক্ষ দিতে না চাওয়া এবং সাক্ষে সত্য ঘটনা প্রকাশে বিরত থাকা উভয়টিই 'সাক্ষ গোপন' করার আওতায় পড়ে।

৩৩৩. এখানে ভাষণ সমাপ্ত করা হয়েছে। তাই দীনের মৌলিক শিক্ষাগুলোর বর্ণনার মাধ্যমে যেমন সূরার সূচনা করা হয়েছিল ঠিক তেমনি যে সমস্ত মৌলিক বিষয়ের ওপর দীনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত সূরার সমাপ্তি প্রসংগে সেগুলোও বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। তুলনামূলক পাঠের জন্য সূরার প্রথম রুকূ'টি সামনে রাখলে বিষয়বস্তু বুঝতে বেশী সাহায্য করবে বলে মনে করি।

৩৩৪. এটি হচ্ছে দীনের প্রথম বুনিয়াদ। আল্লাহ এই পৃথিবী ও আকাশসমূহের মালিক এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁর একক মালিকানাধীন, প্রকৃতপক্ষে এই মৌলিক সত্যের ভিত্তিতেই মানুষের জন্য আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন কর্মপদ্ধতি বৈধ ও সঠিক হতে পারে না।

৩৩৫. এই বাক্যটিতে আরো দু'টি কথা বলা হয়েছে। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহর কাছে দায়ি হবে এবং এককভাবে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। দুই, পৃথিবী ও আকাশের যে একচ্ছত্র অধিপতির কাছে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞান রাখেন। এমনকি লোকদের গোপন সংকল্প এবং তাদের মনের সংগোপনে যেসব চিন্তা জাগে সেগুলোও তাঁর কাছে অপ্রকাশ নেই।

৩৩৬. এটি আল্লাহর অবাধ ক্ষমতারই একটি বর্ণনা। তাঁর ওপর কোন আইনের বাঁধন নেই। কোন বিশেষ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি বাধ্য নন। বরং তিনি সর্বময় ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। শাস্তি দেয়ার ও মাফ করার পূর্ণ ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে।

৩৩৭. বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এই আয়াতে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতির সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে ও তার কিতাবসমূহকে মেনে নেয়া, তাঁর রসূলদের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য সূচিত না করে (অর্থাৎ কাউকে মেনে নেয়া আর কাউকে না মেনে নেয়া) তাঁদেরকে স্বীকার করে নেয়া এবং সবশেষে আমাদের তাঁর সামনে হাযির হতে হবে, এ বিষয়টি স্বীকার করে নেয়া। এ পাঁচটি বিষয় ইসলামের বুনিয়াদী আকীদার অন্তরভুক্ত। এই আকীদাগুলো মেনে নেয়ার পর একজন মুসলমানের জন্য নিম্নোক্ত কর্মপদ্ধতিই সঠিক

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ٝ وَاغْفِرْ لَنَا ٝ وَارْحَمْنَا ٝ اَنْتَ
مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

আল্লাহ কারোর ওপর তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপান না।[৩৩৮] প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী উপার্জন করেছে তার ফল তার নিজেরই জন্য এবং যে গোনাহ সে অর্জন করেছে, তার প্রতিফলও তারই ওপর বর্তাবে।[৩৩৯]

(হে ঈমানদারগণ, তোমরা এভাবে দোয়া চাও ঃ) হে আমাদের রব! ভুল-ভ্রান্তিতে আমরা যেসব গোনাহ করে বসি, তুমি সেগুলো পাকড়াও করো না। হে প্রভু! আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যা তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে।[৩৪০] হে আমাদের প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করার সামর্থ আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না।[৩৪১] আমাদের প্রতি কোমল হও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি করুণা করো। তুমি আমাদের অভিভাবক। কাফেরদের মোকাবিলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।[৩৪২]

হতে পারে ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশগুলো আসবে সেগুলোকে সে মাথা পেতে গ্রহণ করে নেবে, সেগুলোর আনুগত্য করবে এবং নিজের ভালো কাজের জন্য অহংকার করে বেড়াবে না বরং আল্লাহর কাছে অবনত হতে ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

৩৩৮. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মানুষের সামর্থ অনুযায়ী তার দায়িত্ব বিবেচিত হয়। মানুষ কোন কাজ করার ক্ষমতা রাখে না অথচ আল্লাহ তাকে সে কাজটি না করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, এমনটি কখনো হবে না। অথবা প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ বা জিনিস থেকে দূরে থাকার সামর্থই মানুষের ছিল না, সে ক্ষেত্রে তাতে জড়িত হয়ে পড়ার জন্য আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, নিজের শক্তি-সামর্থ আছে কিনা, এ সম্পর্কে মানুষ নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে মানুষের কিসের শক্তি-সামর্থ ছিল আর কিসের ছিল না—এ সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহ গ্রহণ করতে পারেন।

৩৩৯. এটি আল্লাহ প্রদত্ত মানবিক ইখতিয়ার বিধির দ্বিতীয় মূলনীতি। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যে কাজ করেছে তার পুরস্কার পাবে। একজনের কাজের পুরস্কার অন্যজন পাবে, এটা কখনো সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যে দোষ করেছে সে জন্য পাকড়াও হবে। একজন দোষ করবে আর অন্যজন পাকড়াও হবে, এটা কখনো সম্ভব নয়। তবে এটা সম্ভব, এক ব্যক্তি কোন সৎকাজের ভিত্তি রাখলো এবং দুনিয়ায় হাজার বছর পর্যন্ত তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকলো, এ ক্ষেত্রে এগুলো সব তার আমলনামায় লেখা হবে। আবার অন্য এক ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের ভিত্তি রাখলো এবং শত শত বছর পর্যন্ত দুনিয়ায় তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকলো। এ অবস্থায় এগুলোর গোনাহ ঐ প্রথম জালেমের আমলনামায় লেখা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে ভালো বা মন্দ যা কিছু ফল হবে, সবই হবে মানুষের প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলশ্রুতি। মোটকথা যে ভালো বা মন্দ কাজে মানুষের নিজের ইচ্ছা, সংকল্প, প্রচেষ্টা ও সাধনার কোন অংশই নেই, তার শাস্তি বা পুরস্কার সে পাবে, এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কর্মফল হস্তান্তর হওয়ার মতো জিনিস নয়।

৩৪০. অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তীরা তোমার পথে চলতে গিয়ে যেসব পরীক্ষা, ভয়াবহ বিপদ, দুঃখ-দুর্দশা ও সংকটের সম্মুখীন হয়, তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো। যদিও আল্লাহর রীতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণ করার সংকল্প করেছে, তাকেই তিনি কঠিন পরীক্ষা ও সংকটের সাগরে নিক্ষেপ করেছেন এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হলে মু'মিনের কাজই হচ্ছে, পূর্ণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবিলা করা, তবুও মু'মিনকে আল্লাহর কাছে এই দোয়াই করতে হবে যে, তিনি যেন তার জন্য সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা সহজ করে দেন।

৩৪১. অর্থাৎ সমস্যা ও সংকটের এমন বোঝা আমাদের ওপর চাপাও, যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের আছে। যে পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা আমাদের আয়ত্বাধীন তেমনি পরীক্ষায় আমাদের নিক্ষেপ করো। আমাদের সহ্য ক্ষমতার বেশী দুঃখ-কষ্ট-বিপদ আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। তাহলে আমরা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবো।

৩৪২. এই দোয়াটির পূর্ণ প্রাণসত্তা অনুধাবন করার জন্য এর নিম্নোক্ত প্রেক্ষাপটটি সামনে রাখতে হবে। হিজরাতের প্রায় এক বছর আগে মি'রাজের সময় এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। তখন মক্কায় ইসলাম ও কুফরের লড়াই চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। মুসলমানদের মাথায় বিপদ ও সংকটের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল। কেবল মক্কাতেই নয়, আরব ভূ-খণ্ডের কোথাও এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে কোন ব্যক্তি দীন ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তার জন্য আল্লাহর যমীনে, বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েনি। এ অবস্থায় মুসলমানদের আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করার নির্দেশ দেয়া হলো। দানকারী নিজেই যখন চাওয়ার পদ্ধতি বাতলে দেন তখন তা পাওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়। তাই এই দোয়া সেদিন মুসলমানদের জন্য অসাধারণ মানসিক নিশ্চিন্ততার কারণ হয়। এ ছাড়াও এই দোয়ায় পরোক্ষভাবে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়, নিজেদের আবেগ অনুভূতিকে কখনো অসংগত ও অনুপযোগী ধারায় প্রবাহিত করো না বরং সেগুলোকে এই দোয়ার ছাঁচে ঢালাই করো। একদিকে নিছক সত্যানুসারিতা ও সত্যের প্রতি সমর্থন দানের

কারণে লোকদের ওপর যেসব হৃদয় বিদারক জুলুম নির্যাতন চালানো হচ্ছিল সেগুলো দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়াগুলো দেখুন, যাতে শত্রুদের বিরুদ্ধে সামান্য তিক্ততার নামগন্ধও নেই। একদিকে এই সত্যানুসারীরা যেসব শারীরিক দুর্ভোগ ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল সেগুলো দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়াগুলো দেখুন, যাতে পার্থিব স্বার্থের সামান্য প্রত্যাশাও নেই, একদিকে সত্যানুসারীদের চরম দুরবস্থা দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়ায় উৎসারিত উন্নত ও পবিত্র আবেগ–উদ্দীপনা দেখুন। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সে সময় ঈমানদারদের কোন্ ধরনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন দেয়া হচ্ছিল, তা সঠিক ও নির্ভুলভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।